ISSN-2277-8780

আমি অরণি

(সাহিত্য ও গবেষণামূলক ষান্মাসিক পত্রিকা)

৬ষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৪২৪ / এপ্রিল ২০১৭

বৈশাখ সংখ্যা ১৪২৪

সম্পাদক

সঞ্জিত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ শর্মিলা দাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী

ডঃ কনক মৈত্র, ডঃ দেবীপ্রসাদ নাগ চৌধুরী, বিপুল রঞ্জন সরকার, গৌতম বসু, ডঃ জয়ন্ত মেটে, বাদল দত্ত, ডঃ চন্দ্রিমা বসু, ডঃ বিশ্বম্ভর মণ্ডল ও ডাঃ নিশীথ ভাস্কর পাল।

সম্পাদক মণ্ডলী

ডঃ বিভাস গুহ, ড. সুব্রত মণ্ডল, ড. অনসূয়া বাগচি, ডঃ সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শান্তনু সেন, জয়দেব হালদার, দেবজ্যোতি রায়, মিহির নাথ, গোপাল দে।

প্রকাশক

সুরজিত রায়

সম্পাদক

সঞ্জিত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ শর্মিলা দাস

প্রচ্ছদ ঃ বাদল দত্ত

ঃ যোগাযোগ ঃ

9635359025, 9434552238, 9434165623, 9635508115
e-mail : sanjitdhanicha@rediffmail.com
sarmiladas16@rediffmail.com
amiarani@rediffmail.com

ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ

সঞ্জিত দাস / ডঃ শর্মিলা দাস
গ্রাম ঃ ধনিচা নূতন পাড়া, পোঃ চাকদহ, জেলা - নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ঃ ৭৪১২২২

অদ্বৈত মত অনুসারে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় বিচার

মহঃ আছের আলি শেখ

অদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্যগণ জগৎকে মায়া বা মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য শঙ্কর ব্রহ্মের কে শক্তি স্বীকার করেছেন। অঘটন - ঘটনপটীয়সী যে শক্তি ব্রহ্মকে আবৃত করে তাঁর উপর জগতপ্রপঞ্চকে আরোপ করে অদ্বৈতবেদান্তে তাকে মায়া, অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলা হয়েছে। মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দকে শঙ্কর সমার্থকরূপে প্রয়োগ করেছেন।

অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সৎ পদার্থরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। সমস্ত জীবকে অদ্বৈত বেদান্তীরা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। জীব ব্রহ্মের চতুষ্পর্শে যে জড় জগৎকে অনুভব করে, সেই জড় জগৎকে অদ্বৈতবেদান্তীরা পারমার্থিক সৎপদার্থ বলেন না। জগৎকে অদ্বৈতবেদান্তীরা সৎ এবং অসৎ পদার্থ থেকে বিলক্ষণ তৃতীয় প্রকার মিথ্যা পদার্থরূপে গণ্য করে থাকেন। জগৎ যদি ব্রহ্ম থেকে অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোনো পারমার্থিক সৎপদার্থ হতো, তাহলে অদ্বৈতসিদ্ধিই সম্ভব হতো না।

অদ্বৈতসিদ্ধির নিমিত্ত জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি আবশ্যক। জগৎ যদি কোনো সৎ উপাদান থেকে বিবর্তিত হয়, তাহলে জগৎ ও সৎপদার্থই হবে। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তীর পক্ষে জগতের মিথ্যাত্বসিদ্ধি আবশ্যক বলে অদ্বৈতবেদান্তীরা অজ্ঞানরূপ জগতের একটি মিথ্যা উপাদান কারণ স্বীকার করেছেন। এইরূপ অজ্ঞান অদ্বৈত বেদান্তের 'পৃথকপ্রস্থান' বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয় ও বটে। অদ্বৈত বেদান্ত ভিন্ন অন্য কোনো দর্শনে অজ্ঞানরূপ জগতের মিথ্যা উপাদান কারণ স্বীকৃত হয়নি।

অজ্ঞান সিদ্ধ হলে জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি পূর্বক অজ্ঞানসিদ্ধি অদ্বৈত সিদ্ধির পক্ষে ব্যাপার বা দ্বার স্বরূপ। এই কারণে অদ্বৈতাচার্যগণ অজ্ঞানের লক্ষণ, অজ্ঞান সাধক প্রতীতি এবং অজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে থাকেন।

সকল অদ্বৈতচার্যই জগতের মিথ্যা উপাদান রূপে অজ্ঞান রূপ মিথ্যা ভাব পদার্থ স্বীকার করেছেন। কিন্তু অজ্ঞান কোথায় আশ্রিত এবং অজ্ঞানের বিষয় কি ? এই প্রশ্নে অদ্বৈতচার্যগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। অদ্বৈতবেদান্তের তিনটি প্রধান শাখার মধ্যে বিবরণ শাখায় ব্রহ্মকেই অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয় রূপে স্বীকার করা হয়। অপরপক্ষে, ভামতী সম্প্রদায় জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় এবং ব্রহ্মকে অজ্ঞানের বিষয় বলেন।

ভারতীয় দর্শনে লক্ষণ এবং প্রমাণের দ্বারাই যে কোনো পদার্থের সিদ্ধি হয়ে থাকে। অদ্বৈতচার্যগণ বলে থাকেন যে, ভাবরূপে বা াভাবরূপে, সৎরূপে বা অসৎরূপে ইত্যাদি কোন প্রকারেই অজ্ঞানের স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। এই কারণেই অজ্ঞানের লক্ষণ সম্ভব নয়।

এই প্রকার আপত্তির উত্তর প্রদানের জন্য অদ্বৈতচার্যগণ প্রতিপাদন করেছেন যে, অজ্ঞানের লক্ষণ নির্বাচন সম্ভব। অদ্বৈত দর্শনে অজ্ঞানের বিভিন্ন লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সদানন্দ তাঁর 'বেদান্তসার' গ্রন্থে অজ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন -

'সদাসদভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপং যৎকঞ্চিদিতি।'

অর্থাৎ, অজ্ঞান সৎও নয়, অসৎও নয়, অনির্বচনীয়। অজ্ঞান সৎ নয়, কারণ জ্ঞান হলে অজ্ঞানের নাশ হয়। যার নাশ হয় তা সৎ নয়। অজ্ঞান অসৎও নয়, কারণ অজ্ঞানের কার্যজগৎ প্রতিভাত হয়, কিন্তু অসৎ কখনোই প্রতিভাত হয় না। বন্ধ্যাপুত্র অসৎ, কারণ তা কখনোই প্রতিভাত হতে পারে না। অজ্ঞানকে সৎ বা অসৎ বলে উলে-খ করা যায় না বলে তা অনির্বচনীয়। অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই তিনটি গুণ। অজ্ঞানে এই তিনটি গুণ বর্তমান। অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন যে কোনো বস্তুতেই এদের পাওয়া যায়। অজ্ঞান জ্ঞান বিরোধী। অর্থাৎ জ্ঞান হলে অজ্ঞান থাকে না, অজ্ঞান ভাবরূপ।

ন্যায়মতে অজ্ঞান জ্ঞানাভাব। অদ্বৈতবেদান্তীরা এই মত মানেন না। তাঁরা প্রশ্ন করেন অজ্ঞান বলতে কোন জ্ঞানের অভাব বোঝায়? তা চৈতন্যরূপ জ্ঞানের অভাব হতে পারে না। কারণ চৈতন্য নিত্য, যা নিত্য তার অভাব অসিদ্ধ। তবে কি অজ্ঞান বৃত্তিজ্ঞানের অভাব ? তাও হতে পারে না, কারণ বৃত্তি স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান নয়। অজ্ঞান কি তবে বিশেষ বা সাধারণ জ্ঞানের অভাব? বিশেষ জ্ঞানের অভাব হতে পারে না, কারণ কোন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানের অভাবের ক্ষেত্রেও অন্য কোন না কোন বিষয়ের থাকেই।

বিবরণ, চিৎসুখী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অজ্ঞানের তিনটি লক্ষণ পাওয়া যায় —

১) অনাদি ভাবরূপ হয়েও যা জ্ঞান নির্বর্ত্ত্য তাই অজ্ঞান।

২) যা ভ্রমের উপাদান তা অজ্ঞান এবং

৩) যা জ্ঞান নির্বর্ত্ত্য তাই অজ্ঞান।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী প্রথমেই বলেছেন - মায়ার বা অবিদ্যার অধিষ্ঠান ব্রহ্মই বিশ্বভ্রমের উপাদান কারণ, তবে এই জগতের উপাদান কারণ বিষয়ে অদ্বৈতচার্যগণের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। কোন কোন অদ্বৈতচার্য মায়ার অধিষ্ঠান ব্রহ্মই বিশ্বভ্রমের উপাদান কারণ বলে থাকেন। কোন কোন অদ্বৈতচার্যের মতে - ব্রহ্মমাত্রকেই বিশ্বের উপাদান কারণ বলা হয়েছে। অন্য কোন অদ্বৈতচার্যগণ আবার ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যাকে জগতের উপাদান কারণ বলেছেন।

অজ্ঞানের আশ্রয় কি ? বিভিন্ন অদ্বৈতচার্য এইরূপ প্রশ্নে বিভিন্ন প্রকার উত্তর প্রদান করেছেন। বিবরণ মতে - শুদ্ধ চৈতন্যকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলা হয়েছে। শারীরিক ভাষ্যের টীকার রচয়িতা সর্ভজ্ঞাত মুনিও শুদ্ধ চিন্মাত্রকেই অজ্ঞানের আশ্রয় রূপে স্বীকার করেছেন। কোন কোন অদ্বৈতচার্য ঈশ্বর চৈতন্যকেও অবিদ্যার আশ্রয় বলেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, শুদ্ধচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য এবং জীব চৈতন্য ব্যতিরেকে অন্য কোনো পদার্থ কি অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে, অদ্বৈতচার্যগণ বলেছেন যে, শুদ্ধ চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য এবং জীব চৈতন্য এই ত্রিবিধ চৈতন্যই অনাদি হওয়ায় এরাই অনাদি অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে, অন্য কোন পদার্থ অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে না।

বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার 'ভামতী টীকা'য় অবিদ্যাকে জীবাশ্রিত বলেছেন। ভামতীকার সকল জীব সাধারণে একটি মাত্র অবিদ্যা স্বীকার করেনি। কিন্তু তাঁর মতে প্রতি জীবে অবিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিজীবে অবিদ্যা ভিন্ন হওয়াই প্রতি জীব ভিন্ন ভিন্ন প্রপঞ্চের অধিবাসী। এই কারণেই ভামতীকারের মতকে 'প্রতিপুরুষপ্রপঞ্চভেদবাদ' বলা হয়। চিৎসুখাচার্য্য বিরচিত 'প্রত্যকতত্ত্ব প্রদীপিকাতে' বাচস্পতি মত নিরাকৃত হলেও আচার্য মধুসূদন সরস্বতী ভামতীমত উপপাদন করেছেন।

যে জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা হয়েছে সেই জীব কি অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ? অথবা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য? অথবা অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত ঈশ্বর প্রতিযোগীক ভেদবিশিষ্ট চৈতন্যই জীব? জীব বিষয়ে এই তিনটি মতই অদ্বৈতচার্যগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ-

১. আচার্য মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত অদ্বৈসিদ্ধি
২. উদয়নাচার্য বিরচিত ন্যায়কুসুমাঞ্জলি
৩. চিৎসুখাচার্য বিরচিত প্রত্যকতত্ত্বপ্রদীপিকা
৪. ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র প্রণীত বেদান্ত পরিভাষা
৫. বাদরায়ণ বিরচিত ব্রহ্মসূত্র
৬. বাচস্পতি মিশ্র কৃত ভামতী টীকা
৭. স্বামী বিশ্বরূপ আনন্দ - বেদান্ত দর্শন
৮. বিপদ ভঞ্জন পাল - বেদান্ত পরিভাষা
৯. রমা চ্যাটার্জ্জী - বেদান্ত দর্শন
১০. নীরদ বরণ চক্রবর্ত্তী - ভারতীয় দর্শন
১১. দীপক কুমার বাগচী - ভারতীয় দর্শন
১২. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য - ভারতীয় দর্শন

রহস্যবাদী সাধক ফকির লালন শাহ

নীলেন্দু বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপকইতিহাস বিভাগ (আসাননগর এম, এম, টি কলেজ) আসাননগর, নদীয়া।

" সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কি রূপ
দেখলাম না এই নজরে ।।
কেউ মালায় কেউ তসবি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়।
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়,
জাতের চিহ্ন রয় কার রে ।।"

..... (লালন, আত্মতত্ত্ব)

চৈতন্য উত্তর বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ফকির লালন শাহ। ভক্তিবাদী সাধক শ্রীচৈতন্য সনাতন হিন্দু ধর্মের আদর্শ বৈষ্ণবধর্মের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। লালন ফকির তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সার্বিক ঐক্যের কথা প্রচার করেছিলেন। একাধারে সাধক, বাউল, সমাজ সংস্কারক ও দার্শনিক লালন তাঁর গীতির মাধ্যমে ধর্ম, বর্ণ, গোত্রসহ সকল প্রকার জাতিগত বিভেদ থেকে সরে এসে মানবতাকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। লালনের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বন্ধনের আবর্তে নিজেকে জড়াতে চাননি। তাঁর সৃষ্ট লালন গানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষের জয়গান করা হয়েছিল। সুফিবাদে ইসলাম ধর্মের কথা বিশেষ করে বলা হলেও লালন ফকির ইসলাম ছিলেন কিনা তা নিয়ে পন্ডিত মহল এক মত নয়। মুসলিম সম্প্রদায় লালনকে 'ফকির' আখ্যায় ভূষিত করে তাকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে দাবী করেছেন। একইভাবে বৈষ্ণব ধর্মের আলোচনা করতে দেখে তাকে হিন্দুরা 'বৈষ্ণব' বলে মনে করতো। অথচ লালনকে তাঁর জীবদ্দশায় কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে দেখা যায়নি।

কিন্তু লালন শাহ ফকিরের জীবন যে পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠবে, লালন কী সুফিবাদী সাধক ছিলেন ? কিম্বা সুফিবাদের প্রভাব লালনের উপর আদৌ পড়েছিল কি না? এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর নির্ণয়ের পূর্বে আমাদের বিশে-ষণ করে দেখতে হবে সুফিবাদ বলতে ঠিক কি বোঝায়? সুফিবাদের দর্শনে কি এমন আছে যা লালন ফকিরকে প্রভাবিত করেছিল? সুফিবাদ বা সুফি দর্শন একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক আত্মা সম্পর্কিত আলোচনার বিষয়। সাধারণ অর্থে সুফিবাদ বলতে বোঝায় আপন নফসের সঙ্গে, নিজ প্রাণের সঙ্গে, নিজের জীবাত্মার সাথে পরমাত্মা আল-াহ যে শয়তানটিকে আমাদের পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে জেহাদ করে তার

থেকে মুক্ত হয়ে এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়া। অন্যভাবে বলা যায় আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল-াহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এই দর্শনের মূল কথা। মানুষের চিরন্তন আকাঙ্খা লক্ষিত হয় পরম সত্ত্বা মহান আল-াহকে জানার এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে জানার প্রচেষ্টাকেই বলা হয় সুফি দর্শন বা সুফিবাদ। সুফিবাদ প্রসঙ্গে সুফিসাধক হযরত ইমাম গাজ্জালী বলেছেন, 'আল-াহ ব্যতীত অপর মন্দ সবকিছু থেকে আত্মাকে পবিত্র করে সর্বদা আল-াহর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল-াহতে নিমগ্ন হওয়ার নামই সুফিবাদ।' সুফি কথার আক্ষরিক অর্থ হিসাবে বলা হয় 'সাফা' বা 'পবিত্র'। সুফি সাধকেরা তাদের ধর্মাচারণের ক্ষেত্রে হৃদয়, চিন্তা ও আচরণের পবিত্রতার উপর জোর দিতেন। আর একটি মত হিসাবে 'সুফ' বা মোটা উলের বস্ত্র পরিধান করতেন বলে অতীন্দ্রীয়বাদী সাধকেরা সুফিবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছেন।

ইসলামের ভেতর থেকেই যে সুফিবাদের জন্ম হয়েছে সে বিষয়ে পন্ডিত মহলে কোন দ্বিমত নেই। সুফিসাধকের নিকট কোরাণ অত্যন্ত পবিত্র বিষয় এবং অবশ্য পালনীয়। অন্ধকারের দেশ 'দার-উল-হারাব'কে 'দার-উল-ইসলাম' বা বিশ্বাসীর দেশে পরিণত করাই তাদের জীবনের ব্রত। এ প্রসঙ্গে ইউসুফ হুসেন-এর কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইউসুফ হুসেন বলেছেন, 'সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের একটা অংশ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তফাৎ এই যে গোঁড়া মুসলমানরা ধর্মাচারণের উপর জোর দেন, কিন্তু সুফিরা গুরুত্ব দেন অন্তরের শুদ্ধতাকে। গোঁড়াপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের করুণালাভের জন্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠান নিখুঁতভাবে পালন করা উচিৎ। কিন্তু সুফিরা মনে করেন, একান্ত প্রেম ও ভালোবাসার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

সুফিসাধকেরা নিজেদের এবং সুফিবাদের প্রেম-ভ্রাতৃত্ব-সাম্যের মধুর বাণী প্রচার করে নির্বিশেষে এদেশের সাধারণ মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিংবদন্তী পুরুষেও পরিণত হয়েছেন। তাদের অনেকের মাজার বা মাকবারা আছে। এই মাজার বা মাকবারার প্রতি সাধারণ মানুষের তীব্র আকর্ষণ আছে। পার্থিব কামনা বাসনার জন্য অনেকে এখানে মানত করেন। বস্তুত সৃষ্টির প্রতি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রেমার্জন সুফিবাদের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম, লৌকিক মরমিবাদ, বাউল ধর্মমত ও অন্যান্য ধর্ম কম বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। সুফিবাদের প্রভাব এমনকি সাধারণ মানুষের লৌকিক জীবনের উপরেও প্রভাব ফেলেছিল। দেখা গেছে, নদী ও সমুদ্রপথের যাতায়াতের পথে মাঝিরা বদর পীঠের নাম স্মরণ করে। আবার নিরাপদে কোন গন্তব্যস্থলে গাজীর গান, মাদার পীর, সোনা পীর ইত্যাদি বিভিন্ন পীর দরবেশকে কেন্দ্র করে রচিত। সুতরাং বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক জীবনের নানা ক্ষেত্রে সুফিবাদের প্রভাব অক্ষুন্ন রয়েছে।

তো লালন সুফিবাদী সাধক ছিলেন কিনা সে আলোচনায় দেখা যায় লালনের জীবন সম্পর্কে বিশদ কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু তিনি নিজে যেসব গান রচনা করে গেছেন তা থেকেই তাঁর জীবনের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও সমস্যা রয়েছে, লালন তাঁর গানে নিজের জীবনের উপর কোন তথ্য রেখে যাননি। কয়েকটি গানে অবশ্য তিনি নিজেকে 'লালন ফকির' হিসাবে আখ্যায়িত করে গেছেন। লালনের

মৃত্যুর পর ১৫ দিন পরে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত 'হিতকরী' পত্রিকার নিবন্ধে লালন সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'ইহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছু বলিতেন না। শিষ্যরা তাহার নিষেধক্রমে বা অজ্ঞাতবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না।' বিতর্ক শুধুমাত্র লালনের পরিচয় নিয়েই নয়, তাঁর জন্মস্থান নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক আজও চলে আসছে। নিজের জন্মস্থানের কথা লালন নিজে কখনই প্রকাশ করেননি। কয়েকটি সূত্র থেকে জানা যায় ১৭৭৪ খ্রীঃ অবিভক্ত বঙ্গদেশের ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডার হারিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে লালন গবেষকরা মনে করেন, কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে জন্মেছিলেন। এই মতের বিপক্ষে বলা যায়, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত মাসিক মোহম্মদী পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লালনের জন্ম যশোর জেলার ফুলবাড়ী বলে উলে-খ করা হয়েছে।

জনমানসে অবশ্য লালনের জীবন সম্পর্কে সর্বাধিক প্রচলিত মত হল, লালন তরুণ বয়সে একবার তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পথমধ্যে গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তখন তার সঙ্গী সাথীরা তাকে মৃত ভেবে পরিত্যাগ করে চলে যায়। কালিগঙ্গা নদীতে ভেসে আসা মুমূর্ষ লালনকে জনৈক মলম শাহ ও তাঁর স্ত্রী মতিজান নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ করে তোলেন। তবে গুটিবসন্ত রোগে লালনের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। মলম শাহের নিকট লালন দীক্ষা নিয়ে সেখানেই ছেউরিয়া গ্রামে আশ্রম স্থাপন করে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তিনি দার্শনিক-গায়ক সিরাজ সাঁই (শাহ) এর সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'হিতকরী' পত্রিকায় এই প্রমাণ পাওয়া যায়।

লালনের ধর্মীয় পরিচয়ের প্রশ্নে তাই আমরা দেখতে পাই তিনি জাতিভেদ মানেন না। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর 'ভারতী' পত্রিকায় উলে-খ করেছেন, লালন হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখতেন এবং উভয় ধর্মের মধ্যেই তাঁর শিষ্য ছিল। লালনের নিজের নামেই হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের ছাপ রয়েছে। 'লালন' শব্দটি হিন্দু এবং 'শা' উপাধি মুসলমান জাতীয়। কিন্তু 'হিতকরী' বা 'ভারতী' পত্রিকার কোথাও লালনকে 'বাউল' বলা হয়নি। বরং লালনের ধর্মমতকে এক মিশ্র উদার মত বলে জানিয়েছেন। লালনের জীবনকালেই তাঁর সাধনার প্রকৃতি লক্ষ্য করে তাঁর ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও লালন সে প্রসঙ্গে কোন আগ্রহ দেখাননি। আসল কথা ধর্মীয় সাধনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁর নিকট পরিহাস বলে মনে হয়েছিল। মানবিক বোধের এমন এক উচ্চ আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যেখানে জাতিতত্ত্ব ছিল অসার। সমসাময়িক মীর মোশারেফ হোসেন, কাঙাল হরিনাথ, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের মত শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে লালনের ভাবের লেনদেন ঘটেছিল। এমনকি শিলাইদহের ঠাকুর এস্টেটে তিনি যেতেন। হাউসবোটের উপর বসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের স্কেচ অঙ্কন করেছিলেন।

অন্যদিকে দেখা যায় লালন জন্মগতভাবে যদি মুসলমান হতেন তাহলে তাঁর ধর্মীয় পরিচয় গোপন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা অবিভক্ত বাংলায় বহুদিন পর্যন্ত বেশ কিছু মুসলমান তাদের ইসলামী আচার ত্যাগ করে অনুভববাদী 'মারফতি' ফকির হয়ে অবস্থান করেছেন। তাদের ধর্ম নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করেননি। আর যদি প্রশ্ন তুলেও

থাকেন, তাহলে তার জন্য কি ভয় দায়ী ছিল? না ছিল না, বরং মৌলবাদীদের অত্যাচার সহ্য করেও তারা নিজেদের সাধনায় অটল ছিলেন। কুষ্টিয়া নিবাসী জনৈক ইমামউদ্দিন তাঁর 'বাউল মতবাদ ও ইসলাম' বইতে লালনের জাতিগত পরিচয় হিসাবে বলেছেন,

"ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে ...
তার কাছে জাতের বিচার নাই।।"

অর্থাৎ লালন যে জাতিতে বিশ্বাস করতেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমামউদ্দিন আরও দেখাতে চেয়েছেন, লালন কুষ্টিয়ায় যে পলি-তে বাস করতেন সেখানকার অধিকাংশ জনগণ ছিলেন মোমিন সম্প্রদায়। লালন এক মুসলমান কন্যাকে নিকাহ করেছিলেন। সুতরাং তিনি যদি মুসলমান হতেন তাহলে প্রকাশ করার কোন ভয় ছিল না। কিন্তু জাতিত্বের পরিচয় তিনি প্রকাশ করেননি। তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে একজন অন্তর্মগ্ন সাধক এবং তাঁর ভাব সাধনজাত উপলব্ধির গান বুঝতে তাঁর জীবন ঘটনার অনুপঙ্খ তত আবশ্যিক নয়। কিন্তু মরণোত্তর প্রজন্মের গবেষক ও লেখকরা লালনের মতো স্বভাব প্রচ্ছন্ন মানুষকে নিজের স্বার্থে এমনতর সব মিথ বা অতিকথনের সূত্রে জড়িয়ে দিচ্ছেন, টেনে আনছেন তাঁকে জাতি সংশয়ের পাঁকে। সাধারণ মানুষ লালনের গানের প্রকৃত মহিমা না বুঝে তাঁর জীবন পরিচয়ের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছেন। লালন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯ সালে এক ভাষনে বলেছিলেন, 'লালন ফকির কুষ্টিয়ার নিকটে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন..। লালন ফকির মুসলমান জৈন মত সকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিস তৈরী করিয়াছেন, যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় হইয়াছে।' এখানে লক্ষ্যনীয় যে রবীন্দ্রনাথ লালনকে হিন্দু পরিবারে জন্ম হয়েছিল বলেছেন। যদিও এর পশ্চাতে স্থানীয় জনশ্রুতির উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লালনকে 'বাউল' বলে কোথাও উলে-খ করেননি।

লালনের গানের মর্ম যদি অত্যুৎসাহী গবেষকরা যথার্থ অনুধাবন করতেন তবে তাঁর জাতিধর্ম সম্পর্কে নিরুৎসাহ থাকাই হত সবচেয়ে শ্রেয়। তাঁর জীবন সম্পর্কে বানিয়ে তোলা মিথ লালনের গানকে বুঝতে কতটুকু সাহায্য করবে? আঠারো শতকের প্রান্তিক অংশ ছুঁয়ে উনিশ শতকের শেষ দশকের লালন ছিলেন নিম্নবর্গের গ্রাম জীবনের গুহ্যসাধনের ভাবুক। সেই সাধনায় নাটকীয়তা খুব জরুরী নয়, কারণ লোকায়ত সাধনা অনেকটাই দেহবাদী সাধনার আচরণঘটিত এবং তার বিশেষ অনুভব থেকেই জেগে ওঠে গান। সাধক জীবনের বাহ্য ঘটনার চেয়ে ব্যক্তির একান্ত সাধনাই বড় হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে ভারতীয় সন্ত সাধকদের জীবন নিয়ে এমন নাটকীয়তা পরিলক্ষিত হয়নি। কবীর, নানক, সুরদাস, দাদু, একনাথদের জীবন সম্পর্কে জাতি বর্ণের প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠেনি। এমনকি তাদের পদবী জানার কৌতুহলও কার মনে উদয় হয়নি। তাহলে লালনকে নিয়ে এতটা দুশ্চিন্তা কেন?

লালন তাঁর গানের মাধ্যমে যে দর্শনের সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে মানুষ ও তার সমাজই ছিল মুখ্য। লালন বিশ্বাস করতেন সকল মানুষের মাঝে বাস করে এক মনের মানুষ। লালন গানে এই মনের মানুষের প্রসঙ্গ বারে বারে উলে-খিত হয়েছে। এই মনের মানুষের কোন জাত, বর্ণ, লিঙ্গ, কূল নেই। মানুষের দৃশ্যমান শরীর এবং অদৃশ্য মনের মানুষ

পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সকল মানুষের মনে ঈশ্বর বাস করেন। বলাবাহুল্য, লালনের এই দর্শনকে কোন ধর্মীয় আদর্শের অন্তর্গত করা যায় না। লালন মানব আত্মাকে বিবেচনা করেছেন রহস্যময়, অজানা এবং অস্পৃশ্য সত্ত্বা রূপে। 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি' গানে তিনি মনের অভ্যন্তরের সত্ত্বাকে তুলনা করেছে এমন এক পাখির সাথে , যা সহজেই খাঁচারূপী দেহের মাঝে আসা যাওয়া করে কিন্তু তবুও তাকে বন্দি করে রাখা যায় না। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় লালন প্রায় দুই হাজার গান রচনা করেছিলেন। সহজ সরল শব্দময় এই গানগুলিতে মানব জীবনের রহস্য, মানবতা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। লালন যে যুগে এবং যে সময়ের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, তখন যাবতীয় নিপীড়ণ, মানুষের প্রতিবাদহীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি কুসংস্কার, লোভ, আত্মকেন্দ্রিকতা সেদিনের সমাজ ও সামাজিক বিকাশের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কুসংস্কারকে লালন তাঁর গানের মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। ব্রিটিশ আমলে যখন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত বিভেদ সংঘাত বাড়ছিল তখন লালন ছিলেন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। হয়তো এই কারণেই সমসাময়িক ভূস্বামী, ঐতিহাসিক, সম্পাদক, বুদ্ধিজীবি, লেখক এমনকি গ্রামের অনেক নিরক্ষর মানুষও লালনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বর্তমান যুগের সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও বিদ্বেষের মুখে লালনের এই দর্শন যে ভীষণ বৈপ-বিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়অতে যেখানে লালনের আখড়া, তা একসময় বৃহত্তর নদীয়ার অংশ ছিল। আমরা জানি যে প্রাচীন নদীয়ায় বৈষ্ণব ও সুফিবাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, যার ছাপ আমরা বাউল সঙ্গীতে লক্ষ্য করি। তাই লালন নদীয়ার মানুষ হবার সুবাদে তাঁর চিন্তাধারাতেও বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ এবং সুফিবাদের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। সুফিসাধকদের মতো তিনিও ভাবতেন নিজেকে জানার মধ্যেই আছে জগতের রহস্যভেদের বাহক, তার বেশি কিছু নয়। দেহ নষ্ট হলেও দেহ থেকে দেহান্তরে চলতে থাকবে অচিন পাখির আনাগোনা। মন্দির মসজিদ লালনের নিকট না-পসন্দ ছিল। ধর্মাচারণের জন্য কোন তীর্থস্থানে যেতে হবে না। এই দেহ-ই সব মন্দির ও মসজিদের একমাত্র আশ্রয়। মক্কা, মদিনা, কাশী, বৃন্দাবন সবই এই দেহের মধ্যে বর্তমান। তাই লালনের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল -

" আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে
দেখল নারে মন ভেয়ে
দেশ দেশান্তরে দৌড়ে
এবার মরিস কেন হাঁপিয়ে।"

অস্বীকার করার উপায় নেই যে লালনের গানে, লালনের ভাবনায় মধ্যযুগীয় নববৈষ্ণব চিন্ত া ও সুফিবাদের প্রভাব আছে। অবিভক্ত নদীয়ায় লালনের আখড়া থাকায় সুফিবাদের প্রভাব এড়ানো সম্ভব ছিল মনে করলে ভুল হবে। সুফি ভাবধারার সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকায় লালনকে অনেকে সুফিসাধক বলেছেন। যদিও সাম্প্রতিক গবেষণায় লালনকে সুফি বলায় প্রবল আপত্তি রয়েছে। এর কারণ সুফিসন্তরা আল-াহকে পরম পূজনীয় বলে মনে করেন। তাদের নিকট আল-াহ ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। আল-াহর প্রতি অপার ভক্তির

মাধ্যমে সুফিসাধকেরা সেই পরমকে পেতে চান যা লালনের চিন্তাধারার বিপরীত। লালনের দর্শনে মনের মানুষকে ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস নেই। সেখানে নেই আল-াহ, নেই কৃষ্ণ। মনের মানুষ-ই তার কাছে আল-াহ বা কৃষ্ণ। অর্থাৎ লালন সেই অর্থে সুফিদের মত ধর্মযাজক ছিলেন না। লালনকে সুফি বলে ভুল করা যায়, কারণ তাঁর গানে প্রচুর আরবী শব্দ ও ইসলামিক ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন আছে। অথচ লালন অত্যন্ত সতর্কভাবে সুফিদের থেকে নিজেকে সরিয়ে এক স্বতন্ত্র দর্শনের উদ্ভাবন করেছিলেন, যা প্রথাগত ইসলাম থেকে ছিল অনেক দূরে। তাই লালন বৈষ্ণব নন, সুফি নন, হিন্দু নন, মুসলিম নন, তিনি লালন শাহ ফকির - জাত পাতের উর্দ্ধে এক দিব্যজ্ঞানী রহস্যবাদী সাধক। হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতিতে তিনি এমন একটি সমন্বয়বাদী ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে তাঁর চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'রহস্যময়'।

তথ্যসূত্র ঃ—

১) ব্রাত্য লোকায়ত লালন — সুধীর চক্রবর্ত্তী, পুস্তক বিপণী, কোলকাতা-০৯, ডিসেম্বর ২০১৪।

২) বাংলার বাউল ফকির — সুধীর চক্রবর্ত্তী, পুস্তক বিপণী, কোলকাতা-০৯, জানুয়ারী ২০০৯।

৩) মধ্যকালীন ভারত — গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী, শ্রীতারা প্রকাশনী, বিধান সরণী, কোলকাতা-০৬, ২০১৪।

৪) বাউল ও সুফিবাদের আলোয় লালন দর্শন (প্রবন্ধ) — প্রদোষ কান্তি সরকার।

৫) "A History of Sufism in Bengal" - Muhammed Enamul Haq.

নন্দিনীর ভালোবাসা - নন্দিত যক্ষপুরী

সোমাশ্রী সরকার

রবীন্দ্রসাহিত্যেরই শুধু নয়, বাংলা তথা বিশ্ব সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকটি। নাটকের মূল চরিত্র রবীন্দ্রনাথেরই মানসকন্যা নন্দিনী। 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনীর নাম খঞ্জনা, খঞ্জনী, সুনন্দা ব্যবহৃত হলেও অবশেষে জয়ী হল 'নন্দিনী'-ই। হ্যাঁ 'রক্তকরবী'-র নন্দিনী যে এক অসাধারণ জীবনীশক্তির পরিচায়ক,যে ভালোবাসার একটুকরো রাঙা রঙে নন্দিত করে যে যক্ষপুরীতেও আনতে পারে ভালোবাসার ঢেউ, করতে পারে প্রাণের সঞ্চার।

নন্দিনী তো সেই যে অন্যকে নন্দিত করে। ঈশানী পাড়ার সেই ছোট্ট মেয়েটিও রক্তকরবীর রাঙা রঙে সজ্জিত হয়ে দায়িত্ব নিয়েছে যক্ষপুরীকে নন্দিত করার। নন্দিনীই অমানবিকতার যক্ষপুরীতে মানবিকতার ছোঁয়ায় প্রাণের সঞ্চার করতে চেয়েছিল। তাই ঈশানীপাড়ার সেই সাধারণ মেয়েটি হঠাৎই হয়ে উঠেছিল অসাধারণ এক নারী, যে তার ভালোবাসার যাদু শক্তিতে বশ করেছিল রঞ্জন, কিশোর, অধ্যাপক, বিশু-র মতো সবাইকে — এমনকি যক্ষপুরীর রাজাকেও, এক কথায় বলা যায় যক্ষপুরীর সবাইকেই 'নন্দিনীতে পেয়েছে'। তাইতো নন্দিনীর মুখেই শোভা পায় —

"ভালোবাসি ভালোবাসি"

নন্দিনী রক্তমাংসের এক মানবী। তার প্রেমিক রঞ্জন ও সে একাত্মা। ভালোবাসাবিহীন যক্ষপুরীতে নন্দিনীর একমাত্র অমূল্য সম্পদ রঞ্জনের ভালোবাসা, যে ভালোবাসার রঙে নন্দিনী রঙিন হয়ে রাঙিয়েছে সবাইকে। 'রঞ্জন' - অর্থাৎ যে রঞ্জিত করে। নন্দিনীর প্রেমিক রঞ্জন, সে আদর করে নন্দিনীকে ডাকে রক্তকরবী বলে। রঞ্জন নন্দিনীকে রঞ্জিত করেছে, নন্দিনীকে প্রেমে ভরপুর করেছে। রঞ্জনের ভালোবাসা-ই নন্দিনীর অহংকার। সেই অহংকারে অহংকারী। ভালোবাসায় পূর্ণ নন্দিনী যক্ষপুরীতে তার সম্পদ ভালোবাসা উজার করে দিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে, মাতিয়েছে সকলকে। নন্দিনীর অকপট স্বীকারোক্তি —

"আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা - সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।"

নন্দিনী রঞ্জনের ভালোবাসার রাঙা রঙে নিজেকে সজ্জিত করেছে, সেই ভালোবাসার রাঙা রঙে যক্ষপুরীকে রাঙিয়েছে।

নাটকের অন্যতম চরিত্র কিশোর নন্দিনীর জন্য রোজ রক্তকরবী ফুল এন দিত। আর সেই রক্তকরবীতে নিজেকে সাজিয়েছে নন্দিনী। কিশোর নন্দিনীকে বলেছে - 'তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এই আমারই নিজের ফুল'। - যন্ত্রচালিত ভালোবাসাবিহীন যক্ষপুরীতে কিশোর নন্দিনীকে ফুল এনে দিয়েছে। ফুল সে তো ভালোবাসার প্রতীক। যক্ষপুরীর আইন না মানার পরিণাম কিশোর জানে, তবুও সে নন্দিনীর জন্য ফুল এনে দিতে পিছপা হয়নি।

সে নন্দিনীকে বলতে পারে —

"একটু সময় চুরি করে তোর জন্য ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।"

যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদাইকর কিশোরের চালিকাশক্তি নন্দিনীই - নন্দিনীই তার পথের দিশা। নন্দিনীবিহীন কিশোর ফুল অর্থাৎ ভালোবাসার ছোঁয়া পেত না। নন্দিনীই রক্তকরবীর রাঙা রঙে কিশোরের মনকে নাড়িয়ে দিয়েছে, কিশোরকে নন্দিনীতে মাতিয়েছে।

বিশুও নন্দিনীর ভালোবাসার ছোঁয়ায় নন্দিত হয়েছে। নন্দিনী বিশুকে পাগল ভাই নামে ডাকে, যক্ষপুরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন বিশুকে পাগলের মতোই আবৃত করে রেখেছিল। নন্দিনীর ছোঁয়াতেই তার জীবনেও আলোর প্রবেশ ঘটে। রঞ্জনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশু ব্যর্থ প্রেমিক হলেও সে নন্দিনীকে ভালোবাসে, নন্দিনীর জন্য সে অসার যক্ষপুরীতে গান গেয়েছে, নন্দিনীকে সে বলেছে —

"তোমায় গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ,
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া !"

- হ্যাঁ নন্দিনী সত্যিই 'ঘুম ভাঙানিয়া', শুধু বিশুর নয়, যক্ষপুরীর 'ঘুম ভাঙানিয়া' নন্দিনী। যক্ষপুরী যে ভালোবাসাবিহীন অন্ধকারে ঘুমিয়েছিল নন্দিনীর স্পর্শেই যক্ষপুরীর সেই ঘুম ভাঙে। যক্ষপুরী সেজে ওঠে ভালোবাসার রাঙা রঙে। যক্ষপুরীতে যে গান গাওয়া যায় তা হয়তো নন্দিনীর ভালোবাসার ছোঁয়ায়ই সম্ভব। তাই হয়তো চন্দ্রা বিশু সম্পর্কে বলেছে —

" ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে — সে ওর প্রাণ টেনেছে। গানও টেনেছে।"

শুধু কিশোর বা বিশুকেই নয় অধ্যাপককেও নন্দিনীতে পেয়েছেন। অধ্যাপকের কাছে নন্দিনী সন্ধ্যাতারা। অধ্যাপকের যক্ষপুরীর জীবনেও নন্দিনীর ভালোবাসার ছোঁয়া পড়েছিল। অধ্যাপক নিজেই স্বীকার করেছে যে - 'সত্যি কথা বলব ? আমি ওকে ভালোবাসি'। যক্ষপুরীর শ্রমিক, ফাগুলাল, চন্দ্রা সবাইকেই নন্দিনী তার ভালোবাসায় নন্দিত করেছিল।

নন্দিনীর এই গুরু দায়িত্ব যেন সার্থকতা পায় রাজার জাগরণে। রাজা, জালের আড়ালে যার বাস, নন্দিনী রাজাকে তার ভালোবাসার পরশে সেই জালের আড়াল থেকে বের করেছে। নন্দিনী পৌষের গান গেয়ে রাজাকে জালের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করেছে। নন্দিনী রাজাকে 'ভালোবাসি ভালোবাসি' গানও শুনিয়েছে। রাজা ভীত হয়ে নন্দিনীকে বলেছে —

"ওই ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয় ওই যেন আমারই রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। .... আবার ভাবছি নন্দিনী যদি কোনদিন নিজের হাতে ওই মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয়।"

রাজাকেও নন্দিনী তার ভালোবাসার পরশ দিয়েছে। কঠোর রাজাও নন্দিনীকে বলেছে যে নন্দিনী রঞ্জনের মতোই তাকে ভালোবাসে কিনা ? রঞ্জন সে তো নন্দিনীর প্রেমিক, নন্দিনীর ভালোবাসা, রাজাও আস্তে আস্তে নন্দিনীর ভালোবাসায় নন্দিত হতে চেয়েছে। নন্দিনীর রক্তকরবীর রাঙা ভালোবাসাও রাজার মনকে স্পর্শ করেছে, রাজার মনে ভালোবাসার সঞ্চার ঘটিয়েছে। রাজা নন্দিনীর পরশে তার আড়াল থেকে মুক্তি চেয়েছে।

"আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক —

তাতেই আমার মুক্তি।"

অবশেষে রাজাকেও নন্দিনীতে পেয়েছে।

নন্দিনী তো নন্দিনীই। নন্দিনী যেন অমানবিকতার যক্ষপুরীতে এক টুকরো ঝোড়ো হাওয়া, যে হাওয়া বয়ে যেতেই উত্তপ্ত যক্ষপুরীতে নেমে এসেছে নিবিড় স্বস্তি। সে যেন এক টুকরো প্রাণ, যাকে ভালো না বেসে পারা যায় না, থাকা যায় না। নন্দিনীর প্রাণপ্রাচুর্যতা, প্রেমিকা সত্ত্বা নন্দিনীকে লড়াই করার সাহস জুগিয়েছে। নন্দিনী রক্তকরবীতে নিজেকে সাজিয়েছে। রক্তের রঙ লাল, নন্দিনীর ভালোবাসার রঙও লাল, আর সেই লাল রঙেই সে ভালোবাসার তীব্র বিপ-ব এনেছে যক্ষপুরীতে। ফুল প্রেমের প্রতীক। নন্দিনী তার রক্তকরবীর লাল রঙেই যক্ষপুরীতে ভালোবাসায় মাতিয়ে দিয়েছে। আর সেই ছোঁয়ায় একে একে রাঙা রঙে নন্দিত হয়েছিল সবাই। ভালোবাসা সে তো ভালোবাসা দিতে চায়, ভালোবাসা পেতে চায়, তবেই তো তার পরিপূর্ণতা। নন্দিনীও রঞ্জনের ভালোবাসায় রঞ্জিত হয়ে, নিজেকে পরিপূর্ণ করে, সেই ভালোবাসা উজার করে দিয়েছে যক্ষপুরীতে, নন্দিনী নন্দিনীতে মাতিয়ে তুলেছে সকলকে, এখানেই নন্দিনীর রাঙা ভালোবাসার সার্থকতা।

বেআবরু সমাজ

সুভাষ ভট্টাচার্য

সেদিন চায়ের দোকানে বসে একটু গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। আর খবরের কাগজটা দেখছিলাম। আনন্দবাজার পত্রিকার রাজ্যের খবরের পৃষ্ঠায় দেখলাম একটি ভিন্নধর্মী কলাম নিয়ে একটা রিপোর্ট। যার বিষয়বস্তু ছিল সমকামী বিবাহের আইনি স্বীকৃতি কতটা যুক্তিসঙ্গত। এই বিষয় নিয়ে আমরা জনা আষ্টেক ব্যক্তি কেউ একটু আধটু লেখাপড়া জানেন তো কেউ আবার জানেন না। যারা জানেন তারা তাদের বিদ্যা ও জ্ঞান প্রকাশের একটি ভালো উপায় পেয়ে বসলেন। ফলস্বরূপ দোকাণে বসে থাকা পাড়ার বয়োঃজ্যেষ্ঠ বিজয় দা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই পাড়ারই ছেলে কমলকে বলল - বলতো কমল সমকামী বিবাহের আইনি স্বীকৃতি দিয়ে সরকার কী এটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিল?

কমলের বয়স অল্প। সবেমাত্র কলেজের পড়াশুনা শেষ করে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তার হাজার মানসিকতার বন্ধুর সাথে চলার অভ্যেস আছে। তাই খুব সহজেই সে নিজের মত জাহির করল। কমল বলল - আসলে দাদা আমার মনে হয় সিদ্ধান্তটা সঠিকই নেওয়া হয়েছে। এরপর বিজয় দা বলল - জানতাম তুই এই উত্তরটাই দিবি। কারণ .....

কমল বলল - তা তুমি যাই-ই মনে করো দাদা আমার পূর্ণ সমর্থন আছে এই বিষয়ে।

- থাকাটাই স্বাভাবিক। ওরা তো তোরই সঙ্গীসাথী। ওদের সাথে তো তোকে মাছে মাঝেই ঘুরতে দেখা যায়। ওদের প্রতি তোর সমর্থন থাকাটাই স্বাভাবিক।

- আসলে দাদা ব্যাপারটা অন্য জায়গায়। ওরা নিজেদের ভেতরকার সত্ত্বাকে সকলের সামনে বলতে কুণ্ঠিত বোধ করে। ওরা বহিরঙ্গে পুরুষ হলেও মানসিক চাহিদা, সখ, ইচ্ছা, আকাঙ্খা, প্রাপ্তি, কামনা-বাসনা সবকিছুই একটি নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে প্রভাবিত ও আকাঙ্খিত করে তোলে যা আমাদের পুরুষ সমাজে একান্তই হাস্যকর ঘটনা। তাই ওরা নিজেদের স্বভাবের কাউকে বা যারা ওদের নিয়ে ব্যঙ্গ করে না বা ওদের কথা শোনে তাদের সাথেই মিশতে পছন্দ করে। ওরা এইভাবেই জীবনে সুখী হতে চায়। তাতে ওদের তো কোন সমস্যা নেই।

- আরে কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বললেই তো পারিস, যে তোর তাতে অনেক সুবিধা হয় - 'মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।'

- দাদা তুমি কিন্তু কথার প্রসঙ্গ বিকৃত করছো। তুমি আমায় যা জিজ্ঞাসা করেছো তার উত্তর পেয়েছো তো? তাহলে এই কথা বলার কী মানে?

- তা হলে বলব না ! প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওরা জীবন যাপন করছে, আর তুই শিক্ষিত ছেলে হয়ে কী করে তা সমর্থন করছিস? এতো রুচিতে বাঁধে যখন ঘরে স্ত্রী থাকতেও মহান সুপুরুষগুলি প্রকৃতির নিয়ম রক্ষা করতে বের হয়। গোপনে নারী সঙ্গ করে; স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গোপনে কোনো নারী ঘরে পরপুরুষকে ডেকে নেয়; তখনতো

প্রকৃতি রুষ্ট হয় না ? কারণ আমরা যারা দোষী তারাই অপরের সমালোচনা বেশী করি। আর ওরা যদিএকটা ভিন্ন পথে গিয়ে নিজেদের স্বাধীনতাকে আমূল দিয়ে সুখ, শান্তি পায় তাহলে তাতে দোষ কোথায়? সব মানুষেরই নিজস্ব একটা স্বাধীন চিন্তাধারা থাকে, কোন পথে পরিচালনা করব? সেটা একান্তই তার ব্যক্তি স্বাধীনতা। ওরা যদি ঐ পথে শান্তি খুঁজে পায় তাতে দোষ কোথায়?

- এই চুপ করতো !! দুইদিন একটু বই পড়ে বেশী পন্ডিত হয়ে গেছিস না কী? হোমো কোথাকার .....

- দ্যাখো দাদা তুমি কিন্তু আমায় যেচে অপমান করছো।

- হোমোদের আবার কীসের মান রে ? নির্লজ্জ কোথাকার .....

- আচ্ছা ওদের যতক্ষণ হোমো বলছো, তাহলে ওদের কাছে যে পুরুষরা অন্ধকারে ডাকে তারা কী দোষী নয়? যে পুরুষরা ওদের টাকা দিয়ে নিজেদের যৌন লালসার পরিতৃপ্তি ঘটায়, তাহলে তারা কী প্রকৃতি রক্ষা করে ? আসলে আমরা যা প্রকাশ্যে করি বা বলি তা আমাদের লোক দেখানো অভিনয় মাত্র। কিছু মানুষ আছে যারা ভালোমানুষি পোষাক পড়ে একটা হিংস্র চেতনাকে ভেতরে দমন করে রাখে। সেই মানুষুলিই বেশী করে ন্যায়নীতির বিচার করতে আসে।

- তাহলে তুই কী বলতে চাইছিস, আমি ওদের কাছে গোপনে যাই ? ফূর্তি করি?

- দাদা আমি কিন্তু সে কথা একবারও বলিনি। তুমি কথাটা ইচ্ছা করে গায়ে টানছো।

- এখানে এতগুলো লোক বসে আছে তারা কী কিছুই বোঝে না, যে তুই কাকে ইঙ্গিত করে কথাগুলি বললি।

- দাদা আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু কিছু বলিনি। আমি শুধুমাত্র আমার বক্তব্য প্রকাশ করেছি মাত্র।

- আচ্ছা এখন এখান থেকে যা তো .... আমার আর তোর সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে না।

পরের দিন কমলকে আবার সেই সুমনা, অলকা, রঞ্জিতাদের একসাথে রাস্তায় বের হতে দেখে চায়ের দোকান থেকে কে একজন টিটকিরি দিয়ে বলেন - কী রে হোমো এবার কী তোর কমল থেকে কমলা হবার পালা এর নাকি রে ? কমল কথাটা শুনলেও ব্যাপারটা এড়াবার জন্য চুপ করে ওদের সাথে হেঁটে চলল। মাঝে সুমনা বলে বসল বীরপুরুষের দল তোদের ঘরে মা বোন নেই গো! তুমি যাবে আমার বাড়ি? এবারে সুমনা, অলকা, রঞ্জিতারা খানিকটা এগিয়ে এসে বলল - আয়রে সামনে; আয় কোন মর্দা বললিরে কথাটা? এবার আর কেউ উত্তর করল না। এরপর সুমনা, অলকারা সেখান থেকে চলে গেল কমলের আন্তরিক অনুরোধে।

নিয়ম করে পরের দিন সকালবেলা কমল দোকানে চা খেতে আসলে কমলকে একা পেয়ে সকলে মিলে যে যার মতো করে কালকের ঘটনার জন্য নোংরা নোংরা বাক্যকুলি বলতে লাগল। তর্কাতর্কি এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। শেষ পর্যন্ত কমল নিজেকে সংযত করে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বাড়ি চলে আসে। বাড়ি এসে কমল বাড়ির সকলের

অলক্ষ্যেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দীর্ঘক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে। দুপুরবেলা তার মা ভাত খেতে ডাকতে আসলে দিনের বেলা দরজা বন্ধ দেখে প্রথমে একটু অবাকই হয়। তারপর বলে কী রে কমল তুইতো আজ স্নান করলি না, ভাতও খেলি না, কোথায় ছিলিস সারাদিন? ওঠ, উঠে স্নান করে, ভাত খেয়ে তারপর ঘুমা। একথা বলে কমলের মা আবার নিজের সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরপর বাড়ির সকলের স্নান করা হয়ে গেলে খেতে বসে দেখা যায় কমল খেতে বসেনি। তখন বাড়ির সকলকে খেতে দিয়ে কমলের মা কমলকে ডাকতে গিয়ে দেখে সেই তখন থেকেই দরজা বন্ধ করে কমল ঘরে কী করছে তাই ভেবে খুব কৌতূহল জাগে। অনেকবার ডাকা সত্ত্বেও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আতঙ্কে গলার স্বর আরও চওড়া করে। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই না হওয়ায় ভীত হয়ে চিৎকার শুরু করলে বাড়ির সকলে পাতের ভাত পাতে রেখে সকলে ছুটে আসে। তারা সকলে মিলে দরজা ধাক্কা দিতে আরম্ভ করলে পাড়া পড়শীরা সেই আওয়াজের উৎস খুঁজতে এবং কোন বাড়ি থেকে এই আওয়াজ আসছে, তা জানতে বের হন। সকলে আওয়াজের কিনারা বুঝতে পেরে কমলদের বাড়ির উঠোনে ভিড় জমায়। খবরটি চায়ের দোকানে পৌঁছাতে আর বাকী থাকে না। এইরকম একটি খবর শোনা মাত্র চায়ের দোকানে বসে থাকা বিজয় দা, রতনদা-রা কমলদের বাড়ি ছুটে এসে দরজা ভাঙলে দেখা যায় ঘরের আলনায় ভাঁজ করে রাখা মায়ের একটা পুরানো শাড়ি সিলিং ফ্যানে বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে নিথর, শান্ত, স্থিতিশীল দেহটি গ্রীষ্মের দাবদাহে গরম বাতাসে দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলে আছে। সেই দৃশ্য দেখে কমলের মা হতভম্ব হয়ে শোকস্তব্ধ, নিস্তেজ হয়ে কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন পাড়ার ছেলেরা ধরাধরি করে শবদেহটি নীচে নামালে দেখা যায় কমলের বাম হাতে একটি চিঠি লেখা। তাতে লেখা —

শ্রদ্ধেয় বিজয় দা,

আমি আমার পাড়ার বয়োঃজ্যেষ্ঠ দাদাদের মতো তোমাকেও সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। কিন্তু আজ সকালে তোমরা, আমার সাথে যে ব্যবহার করলে তা হয়তো ঠিক করলে না। আমি ওদের সাথে মিশি কারণ ওরা কারোর সাথে খোলা মনে মিশতে পারে না। নিজেদের কথা প্রকাশ করতে পারে না। ওরা রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করলে সকলেই ওদের ব্যঙ্গ করে। ওদের ইচ্ছা, স্বাধীনতা, কামনা-বাসনাকে কেউ মূল্য দেয় না। তাই ওরা অন্যের সাথে মিশতে পারে না। আর যদি কারো সাথে ভালোভাবে মিশতে চায় তারা আবার মিশতে লজ্জা, দ্বিধা, সঙ্কোচ বোধ করে। সম্মানহানির ভয়ে অবহেলা বা বঞ্চনা করে। তাই ওরা সকলের সাথে মিশতে পারে না। আর আমি নিজের মধ্যেকার সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে সরিয়ে বন্ধুর মতো সমব্যথী হয়ে মিশেছি এবং ওদের মনের মতো বন্ধু হবার চেষ্টা করেছি। তাই তোমাদেরকে একটা কথাই বলে যেতে চাই যে - 'আমি হোমো নই'।

কুয়াশাচ্ছন্ন অতীত

মীনাক্ষী ভৌমিক

দূরে রেলগাড়ির হুইসিল্ বেজে গেল। ধোঁয়াশায় কাছেরই আলো জ্বলা পথটাকে কী সুন্দর মায়ায় ভরা বলে মনে হচ্ছে। কাছেরই কোন একটা শিশুর কান্না বাতাসে ভেসে আসছে।

নিস্তব্ধ সন্ধ্যার আমেজটাকে ভেঙে কতকগুলো ছোট কুকুর চিৎকার করে উঠল। কপিলদার দোকানে ছেলেগুলো গরম গরম জলখাবারের আশায় অনেকক্ষণ বসে আছে। এ্যাকোইরিয়ামের মাছগুলো জলের মধ্যে খেলা করছে। কখনও বা ফাইটারটার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

গী দ্য মোপাসার ছায়া অবলম্বনে যে কাহিনীটা পড়া শেষ কললাম, মনে হয় জীবনের যেন একটা মানে আছে। বালির ওপরে ঝিনুক কুড়োচ্ছিল যুথী, ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় থেমে যায়। পড়ে আছে খানিকটা জেলি, আবার ছোটে, সামনে ঐ তো একটা বড় ঝিনুক। রোজের মতো ছুটে বেড়ায় যুথী। সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে যায় ঝিনুক খোঁজা। অন্ধকারে শত শত কামান গর্জনের মতো সমুদ্রের গর্জন।

বালুকাবেলায় লাল আলোটুকু ছড়ানো। পা ছড়িয়ে বসে আর ভাবে। এ অন্ধকার যদি চির স্থায়ী হতো, আলোর উৎস সুদূর পরাহত হতো ? প্রাণের স্পন্দন তবে তো থাকতো না। তবে এ বিপুল পৃথিবীর কি পরিণতি না হতো। একখন্ড পাথরের ঢেলার মতো মহাশূন্যেই ভেসে থাকতো। জাতি, সভ্যতা, দেশ কিছুই তো থাকা সম্ভব হতো না।

রাত কেটে সকাল, সন্ধ্যে কেটে রাত, শেষ নেই এ উত্তর খোঁজার। অতীত যেমন কথা বলে না। যুথীর প্রশ্নের শেষও নেই, সমাধানও নেই। গল্পের সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াতে কুড়াতে বাইঘাটা বসন্ত ফেলে এসেছে। সন্ধ্যের অন্ধকারে তাই তার যুবতী মুখটাই শুধু দেখা যায় কিশোরী মুখটা নয়। গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁটে কতই জিজ্ঞাসা। এত প্রশ্ন তুমি পাও কোথায়? দুদিনের আনন্দে এসোনা আমরা মেতে থাকি! সাগনিকের কথাগুলো খুব মনে হয়।

আজ যুথী মালিকার গন্ধ সত্যিই যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তমসাচ্ছন্ন সকলই যেন পিছনে টেনে রেখেছে, যার নেই কোনও অবশেষ।

আমি মেয়ে

মালা তালুকদার

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর দিন আমি প্রথম পৃথিবীর বুকে এসেছিলাম। খুব আনন্দের দিন, অনেক স্বপ্নের সূচনা হওয়ার কথা। কিন্তু তা হল না, সবার চোখে মুখে কেমন যেন হতাশার ছাপ। বাবা চেয়েছিল ছেলে কিন্তু তা হল না। ঠাম্মি চেয়েছিল তার নাতি হোক। আর মা সবার খুশিতেই খুশি। তাই মা-ও আর বেশি আনন্দ উল-াস করল না। আমি একটু একটু করে বড় হতে থাকি সবার মাঝে।

আমার প্রথম স্কুলে যাওয়ার দিন আমি বাবার সাথে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা হল না বাবার ব্যস্ততার কারণে। বাবা একজন পুলিশ অফিসার। আমি ছোট থেকেই বাবার মত হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঠাম্মি বলতো বাবার মত না মায়ের মত হওয়ার চেষ্টা কর। এর কিছু দিনের মধ্যে আমার একটা ভাই এল, আমাদের সকলের মধ্যে। ভাইও বড় হতে লাগল সবার স্নেহ ভালোবাসার সাথে। আজ ভাইয়ের প্রথম স্কুলে যাবার দিন, বাবা অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ভাইকে নিয়ে স্কুলে গেল। "৪" বছর আগে আমার জীবনেও ঠিক এমনই একটি দিন এসেছিল কিন্তু সেই দিন আর আজকের এই দিনের মধ্যে এত তফাত কেন ? — উত্তর পাইনি !

এখন আমার বয়স আট। আজ আমাদের স্কুলে Annual Sports Day আমি আর ভাই দুজনেই Participate করেছি। দুজনে আলাদা আলাদা Group এ post হয়েছি। বাবা ভাই এর Prize টা দেখে বলল বাবাই তো ভালো দৌড়তে পারে তাহলে বড় হয়ে কি পুলিশ হবে। কিন্তু আমি যখন আমার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম তখন তার উত্তরে তিরস্কার পেয়েছিলাম কেন? — উত্তর পাইনি !

এখন আমার ১৬ বছর বয়স। আমি প্রথম বোর্ডের পরীক্ষায় বসবো। আমি ভেবেছিলাম আজ হয়তো বাবা আমায় উৎসাহ দেবে, আমার ভয় দূর করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কোনটাই হল না। যথারীতি আগের মতই একা। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার দেড় মাস পরে রেজাল্ট আউটের দিন চলে এল। আমি 1st ডিভিশন পেয়েছি। অঙ্কে ৮৯। আমি সায়েন্স নিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হল না। আর্টস নিয়ে পড়তে হল। কিন্তু কেন? — উত্তর পাইনি !

দু'বছর পরে আজ আবার সেইদিন আজ আমার H.S Exam এর রেজাল্ট আউট হবে। আমি তিনটে সাবজেক্ট এ লেটার নিয়ে 1st ডিভিশনে পাশ করেছি। আমি ভীষণ উৎসাহী এবং আগ্রহী কলেজে পড়াশুনা করার জন্য। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হল না। বাবা চায়না আমি আর পড়াশুনা করি। তাই আমার আর পড়া হল না। কিন্তু কেন? — উত্তর পাইনি !

এখন আমার বয়স কুড়ি। ঠাম্মি বাবাকে বলল এবার বিদায় দে, আর কতকাল রাখবি? এবার পরের ঘরে দে। আমায় দেখতে পাত্রপক্ষ আসলো। সকলেরই পছন্দ কিন্তু

আমার ইচ্ছের কথা কেউ জানতে চায়নি। সকলের ইচ্ছা মেনে নিলাম। বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের সমস্ত আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। বিয়ের দিন চলে এল শুভ লগ্নে। সেই অপরিচিত মানুষটির সাথে আমার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল।

এখন আমার বয়স ২৪ বছর। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে আমার বিয়ের পরে। এই দিনগুলোতে আমার সাথে সেই অপরিচিত মানুষটির পরিচয় ঘটেছে। ধীরে ধীরে আমরা এক ভালোবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছি। আমার পরিবারের অন্যান্য মানুষজনের সাথে আমি মিশে গিয়েছি। এরই মধ্যে আমার ভেতরে এক নতুন জীবনের প্রবেশ। সে একটু একটু করে আমার মধ্যে বেড়ে উঠল।

আজ আমার জীবনে সেই স্মরণীয় মুহূর্ত আমি একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি। আমাদের সকলের মধ্যে ধীরে ধীরে সে বড় হয়ে উঠল আমি তার মধ্যে আমাকে হারিয়ে ফেললাম আজ আমার ইচ্ছে চাওয়া পাওয়া সব তাকে ঘিরে। আজ তার স্বপ্ন, ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্খা সব পূরণ হয়েছে। সে আমায় ছেড়ে দূরে বিদেশে সেটল। আমার সন্তানের সব স্বপ্ন পূরণ করতে করতে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। আমার কাছের মানুষগুলো আজ আমার থেকে অনেক দূরে।

এখন আমার '৭০' বছর বয়স। এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একা আর আমার ভাবনা চিন্তা শুধু উত্তর খুঁজে বেরোচ্ছে। আমি কে? আমার অস্তিত্ব কোথায়? আমার এই পৃথিবীর বুকে আশার উদ্দেশ্য কী? আজ আমি নিস্তব্ধ মনে উত্তর শুনতে পেলাম।

আমি মেয়ে।

তাই আপন মনে যেন গানের অন্তরাগুলো ভেসে ওঠে —

বাবার বাড়ি ঐ গ্রামে শ্বশুরবাড়ি ঐ।
তবে তোমার বাড়ি কইগো নারী, তোমার বাড়ি কই ।।

সারা জীবন ভাত রাধিনি পরের হাঁড়িতে।
আপন ভেবে বাস করিলি পরের বাড়িতে।।
যেমন পরের ঘরে বেঁধে বাসা
বাস করে চরুই।
তবে তোমার বাড়ি কই গো নারী,তোমার বাড়ি কই ।।

শিশুকাল কৈশোর কাটে বাবার আশ্রয়ে
যৌবন কাটে স্বামীর সাথে শ্বশুরালয়ে।।
বৃদ্ধকালে আশ্রয় নাই আর
ছেলে কাছে রই।
তবে তোমার বাড়ি কই গো নারী, তোমার বাড়ি কই ।।

পরিচয়

নমিতা পাল

নিম্নবিত্ত , মধ্যবিত্ত বা বিত্তশালী, সে যেমন পরিবারই হোকনা কেন নারীর অবস্থান সব জায়গাতেই সমান। জন্মের পর তার নিজের অজান্তেই তার নিজের নামের শেষে পিতার পদবী যুক্ত হয়। মায়ের না। এর কারণ জানেন? পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে পিতাই পরিবারের প্রধান। সংসারে পিতার অবস্থান যাই হোকনা কেন - যদি তিনি অক্ষম, অত্যাচারী, অসৎ, দুশ্চরিত্র হন, যদি তাঁর কোনো অর্থনৈতিক অবদান নাও থাকে তবুও সন্তানকে তাঁর পরিচয়ে পরিচিত হতে হবে (এক্ষেত্রে অবশ্য নারী ও পুরুষ সমকক্ষ)। মা যতই একটি ভ্রুণকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে, অনেক ভালোবাসা, অনেক স্বপ্ন নিয়ে, জীবনকে বাজী রেখে সন্তানের জন্ম দেন, তবুও তাঁর পরিচয়ের কোন মূল্য নেই।

এতো গেল পিতার পরিচয়। এরপর বিবাহ আর শুরু স্বামীর পরিচয় বহন করা। বিবাহের পর স্বামীর পদবীতে এক নারীর নামের পদবী পরিবর্তিত হয়ে যায়। কেন? পূর্ব পদবী কি দোষ করেছে। এটাই দোষের যে সেই নারীর প্রতিপালকের স্থান বদল হয়েছে - পিতা থেকে স্বামী। তাই পদবীও স্বামীর। আচ্ছা যে পরিবারে মাতা প্রতিপালক তাহলে সেখানে কেন মাতার পদবী ধারণ করা হয় না? উত্তর নেই এই কেন'র? সামাজিকভাবে নারীদের নামের উপর পদবী চাপিয়ে দেওয়ার নিয়ম নতুন নয়। অবিলম্বে এই নিয়মটি বন্ধ করা উচিৎ। অন্তত যে নারীদের নিজের ব্যক্তিত্ব বলে কিছু আছে, তারা অন্তত শুধু পিতা বা স্বামী'র পদবী নিজের নামের সাথে যুক্ত করে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেবেন না। বিবাহের পূর্বে পিতা বা মাতা যার পদবী আপনার পছন্দ সেটিই নিজের নামের সাথে যুক্ত করুন। আর বিবাহের পর যদি প্রয়োজন হয় বা কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে তাহলে পূর্ব পদবীর সাথে স্বামীর পদবী যুক্ত করুন। কেন আপনি এতো দিনের পরিচয়কে ধ্বংস করে আবার নতুন পদবী যোগে নতুন এক পরিচয় সৃষ্টি করবেন? ভেবে দেখেছেন কোনো ছেলে কি বিয়ের পর স্ত্রীর পদবী ধারণ করেন? না। কেন? কারণ এটাই সমাজের নিয়ম। সব থেকে ভালো হয় পদবীর পতন। বর্ণ-ধর্ম-জাত-পাত নির্বিশেষে বাঙালী সন্তানরা পদবীহীন শুধু নামে পরিচিতি হোক, যেমন - সোনালী, নীলিমা, আকাশ, সোমা, করুণা, শংকর, হৃদয় ইত্যাদি। এ তো গেল পদবী পুরাণ, দাঁড়ান এখনো আরো আছে।

কোন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির ফর্ম বা চাকরী পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার সময় প্রার্থীর নাম, ঠিকানা, জন্ম, তারিখ, বয়স,শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির সাথে অভিভাবকের নামের জায়গায় পিতা/স্বামী এটি পূরণ করতে মেয়েদের অসুবিধায় পড়তে হয়। বিবাহিত পুরুষরা পিতাকেই অভিভাবক হিসাবে বেছে নেন কারণ তাঁর পিতা আছেন কিন্তু স্বামী নেই (পুরুষদের স্বামী থাকে না, পিতা থাকে। যদিও মাতা এবং স্ত্রী বর্তমান কিন্তু তাদের পরিচয় গৌণ)। বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে স্বামী ও পিতা দুজনেই আছেন। এখন সে কার অভিভাবকত্ব স্বীকার করবে? সাধারণত স্বামীর পদবীর সাথে অভিভাবকত্বও তাদের

বরণ করে নিতে হয়।

কিছুদিন আগে এক সরকারী চাকরীর ফর্মে উলে-খ ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রার্থীর যে নাম ছিল সেই নাম লিখতে হবে এবং অভিভাবকের স্থানে পিতার নাম উলে-খ করতে হবে। যথারীতি এই পদ্ধতিতে ফর্ম পূরণ করেন এক বিবাহিত নারী। গোল বাধে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে। পরিচয়পত্রে অভিভাবক তাঁর স্বামী এবং পূর্ব পদবী পরিবর্তিত হয়ে স্বামীর পদবীতে সে পরিচিত। তাঁতে তো প্রথমে পরীক্ষায় বসতেই দেওয়া হচ্ছিল না মিথ্যা পরিচয়ের অপরাধে। তবে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের প্রায় ২০ মিনিট পর তাঁকে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। শুধুমাত্র সামাজিক নিয়মের কিছু বেড়াজাল একজন নারীর জীবনে কতটা সংশয় আনতে পারে এ তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

সমাজ দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে বলে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের পরিফূরক। স্ত্রী যদি তাঁর জীবন পুঞ্জিতে স্বামীর পরিচয় দেন, তাহলে স্বামীরও উচিৎ স্ত্রীর নাম উলে-খ করা এবং সেভাবেই জীবনপুঞ্জি তৈরী করা। তবেই তো'পরিপূরক' কথাটা স্বার্থকতা পাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে এটা সম্ভব নয়। আশা করা যায় ভবিষ্যতে নারী আরো সচেতন হবে এবং এই পদ্ধতির সূচনা করবে। তবে বর্তমানে নারী বা পুরুষ বিবাহিত হোক বা না হোক, অভিভাবক হিসাবে মাতা বা পিতার অভিভাবকত্ব এবং পদবী দুটোই স্বীকার করা যুক্তিসম্মত, তাহলে আর এই গোল বাধবে না।

আবার কোন নাগরিককে তার বাসস্থান কোথায় জানতে চাইলে উত্তর আসে 'আমার আদি বাড়ি অমুক জায়গায়' (পিতার জন্মস্থানের না)। আদি বাড়ি হিসাবে পিতার জন্মস্থানকেই চিহ্নিত করতে হবে, মাতার জন্মস্থান কে নয় কেন? নাগরিক যদি তাঁর বর্তমান বাসস্থান উলে-খ করে তবে তো আর কোন সমস্যাই থাকে না।

আর এক নির্মম অভিজ্ঞতার কথা বলি, বেশ অনেক দিন আগের কথা - কলকাতার কোন এক নামকরা বহুজাতিক সংস্থাতে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম। আমি তখন বিবাহিত। নূন্যতম যোগ্যতা যেকোন স্তরে স্নাতক আর তার সাথে কম্পিউটারের জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক। অনেক উচ্চশিক্ষিত বিবাহিত/ অবিবাহিত নারী পুরুষের সাথে আমিও উপস্থিত। অবাক হলাম নারী ও পুরুষ আবেদনকারীর প্রতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের ভিন্ন ব্যবহার দেখে। পুরুষ আবেদনকারীকে ইন্টারভিউ টেবিলে নিজের নাম, যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি খুব সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। কিন্তু একই যোগ্যতার আর একই পদে আবেদনকারী এক নারীর ক্ষেত্রে প্রশ্ন ভিন্ন, আচরণ ভিন্ন। নিজের নাম, যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বদলে প্রথমেই জানতে চাওয়া হচ্ছে প্রার্থী বিবাহিত কিনা! যদি বিবাহিত হন তাহলে পরবর্তী প্রশ্নগুলি - স্বামীর নাম, তাঁর যোগ্যতা, তাঁর পেশা ইত্যাদি। আবেদনকারীর যোগ্যতার চেয়ে তাঁর স্বামীর যোগ্যতা বেশী প্রাধান্য পেল। স্বামী সাধারণ কেরানী বা ব্যবসায়ী হলে আবেদনকারীর মান কম আর স্বামী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি হলে আবেদনকারীর মান বেশী। স্বামীর যোগ্যতার নীচে চাপা পড়ে গেল এক বিবাহিত নারীর যোগ্যতা। এখানেই শেষ নয়, নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যকেও যোগ্যতার নিরিখে মাপা হচ্ছে। আর পোশাকের উপরও অবাধ হস্তক্ষেপ। নির্লজ্জের মতো বলা হচ্ছে

শাড়ী বা চুড়িদার নয়, জিন্স বা ওই ধরণের অত্যাধুনিক কোন পোশাক পরে অফিস আসতে হবে।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা করে নারীরা অনেক ডিগ্রি অর্জন করেছে। কিন্তু যোগ্যতার ডিগ্রি অর্জন করতে পারছে কি? না নিজের একার অস্তিত্ব, নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে সবার সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

আমি বলছি না চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে সরিয়ে ফেলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে। বলছি শুধু নারীর শক্তিকে বাস্তবায়িত করতে। নারীজাতির কাছে আমার আবেদন চলুন সবাই মিলে শুধু পিতা বা স্বামী'র পদবী নয় মাতার পদবীকেও যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করি। চাকরির ফর্ম পূরণে স্বামী কেন; পিতা ও মাতার অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি। সর্বোপরি দৈহিক সৌন্দর্য্য বা স্বামীর ডিগ্রি নয়, চাকরীর ক্ষেত্রে নিজের পড়াশুনার ডিগ্রি ও নিজের ব্যক্তিত্বকে যোগ্যতা হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করি।

মনসার ছোবোল

চিত্ত সরকার

মলি তোর কি স্নান হল, স্কুলে যেতে দেরী হয়ে যাবে যে, মলির মা অর্চনা রান্নাঘর থেকে কথাটা ছুঁড়ে দিল, বাথরুম থেকে মাথা মুছতে মুছতে মলি তোমার সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো বুঝলে মা, ঢের সময় পড়ে রয়েছে, জানি জানি নে নে এবার চটপট খাবার টেবিলে বসে পর, স্কুলে ভর্তি হবার আজকে শেষ দিন, তাই আগে আগে যাওয়াই ভালো, অর্চনা কথাগুলি বলতে বলতে ভাতের থালা টেবিলে রেখে আবার রান্নাঘরে পা রাখে।

হ্যাঁ স্কুলে ভর্তি হবার আজকেই শেষ দিন, তাই কোনভাবেই সময়কে অবহেলা করা যাবে না। এটাই হাইস্কুলের ব্যাপার, তারপর নতুন হেড মাষ্টার এসেছে, শোনা যায় তিনি খুব কড়া ধাঁচের মানুষ, সব সময় নিয়ম মেনে চলেন।

মলি নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে সাইকেল ছোটালো স্কুলে যাবার উদ্দেশ্যে, এক ঘন্টা ছুটবে ঐ দুচাকার বাইকটা, তারপর যা হাল হয়েছে রাস্তাটার, সে আর বলার মতো নয়, এখানে ভাঙা ওখানে গর্ত, এ রাস্তায় গড়িয়ে গড়িয়ে যাবার যে কি সুখ, তা হারে হারে টের পায় ঐ সাইকেলটা, রীতিমতো নাচ করতে করতে যেতে হয়।

মলি এবার ক্লাস সেভেনে পাশ করেছে, ক্লাস viii (এইটে) ভর্তি হবে, লেখাপড়ায় ও খুব ভালো। প্রতি বছর নিজের ক্লাসে প্রথম হয়। গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরষ্কারটা মলির জন্য সংরক্ষণ করা থাকে, নাচেও কম যায় না সে। ছবি আঁকায় দারুণ হাত তার, ব্যাডমিন্টনেও অনায়াসে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয় সে।

মলির মনটা ছিল প্রতিবাদী, সমাজের অনেক কিছুই যেমন ভালো লাগত না, তেমনি আবার অনেক কিছুই প্রশ্ন জাগাতো মলির মনে, এই বয়সে পা দেওয়া কিশোরী, কোন অন্যায় দেখলে অমনি ফোঁস করে উঠবে। তা সে স্কুলেই হোক বা পাড়াতেই হোক, ছোট ও সমবয়সীদেরও রীতিমতো শাসন করতো, বড়দেরও রেহাই নেই। ওর সামনে কোন ভুল বা অন্যায় করা যাবেই না। সঠিক কথা, ন্যায্য কথা, সত্য কথা বলতে ও এক পাও পিছোবে না।

এতে বড়রা খুবই অসহায় হয়ে পড়তেন। তারা লজ্জায় পড়তেন, তাদের মানহানি হত। ঠিক এই কারণে পাড়াতে সবাই মলিকে মনসা বলে ডাকত। সবাই বলতো ও একটা সাপ, ওর জিভে বিষ আছে। মলির মা কোন কারণে মলির উপরে বিরক্ত হলে - সে বলতো যে পাড়ার লোকে মনসা বলে ঠিক কাজই করেন। মলির বাবা কিন্তু মলির সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতেন না, নীরব হয়ে থাকতেন। এই মনসা নামের কথা স্কুলেও প্রচলিত ছিল, নামটা নিজে মেনেও নিয়ে ছিল।

এক ঘন্টার পথ পার হয়ে স্কুলে পৌঁছে গেল মলি, সাইকেলটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে স্কুলের অফিস ঘরে ঢোকার আগে মলির চোখ পড়লো দূরে বসে থাকা চম্পার দিকে। চম্পা ওভাবে বসে আছে কেন বকুল গাছের তলায়? মাথা গুজে বসে আছে, কি হয়েছে

ওর? কাছে গিয়ে দেখিতো, ভাবে মলি। হন্‌হন্‌ করে চম্পার কাছে যায় মলি। চম্পার মুখে হাত দিয়ে মুখটাকে উঁচু করে মলি, কিরে তুই কাঁদছিস কেন, চম্পার কান্না আরো বেড়ে যায়। আরে থাম থাম কাঁদছিস কেন বল। কেউ তোকে মেরেছে, একবার নামটা বল তার। দ্যাখ কি হাল করি তার। চম্পা মাথা নেরে না বলে, তবে কি কেউ বকেছে, চুপ করে থাকিস না মুখে কিছু বল। চম্পা চোখ দুটো মুছে নিয়ে - জানিস মলি আমার আর লেখাপড়া হবে না, মা টাকা জোগাড় করতে পারিনি, তাই ক্লাস viii-এ ভর্তি হতে পারব না। কথাটা শুনে মলির মাথায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল।

মলিকে স্কুলের সবাই মনসা নামে ডাকে। এই চম্পাই শুধু মলি নামে ডাকে। সেই চম্পা আর স্কুলে পড়বে না, স্কুলে মলি নামে আর কেউ ডাকবে না,কি করতে পারি আমি চম্পার জন্য ভাবে মলি। চম্পা খুব গরীব ঘরের মেয়ে। বাবা মারা গেছে, ছোট একটা ভাই আছে। মা বাবুদের বাড়ীতে কাজ করে কোন রকমে আধপেট খেয়ে বেঁচে আছে। ঝিলের ওপারে কলোনীতে থাকে। কলোনীর অন্য সবাই চম্পাদের মতোই গরীব। লেখাপড়ার চল নেই ওখানে। একটা সরকারী প্রাইমারী স্কুল আছে, তাই লেখাপড়া ঐ পর্যন্তই।

একমাত্র চম্পা লেখাপড়া শেখার জন্য ঝিল পার হয়ে হাইস্কুলে এসেছে। তারও আর লেখাপড়া হবে না অভাবের জন্য। চম্পার সাথে সাথে মলিও বকুল গাছের নিচে, মুখে হাত দিয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে মলি - এই চম্পা তুই সত্যি টাকা আনতে পারিসনি, বলছি তো না। তাহলে স্কুলে এসেছিস কেন? চম্পা - এ্যাতো বছর এই স্কুলে লেখাপড়া করলাম, তাই শেষবারের মতো স্কুলকে একটা প্রণাম করবো, আর সবার সাথে দেখা করবো, আরতো দেখা হবে না - তাই এসেছি।

আবার দুজনে চুপ করে বসে রইল, আর তো দেখা হবে না সেই জন্য এসেছি, চম্পার এই কথাটা বার বার মলির মাথায় আঘাত করতে লাগলো। মলি উঠে দাঁড়ায়। এই চম্পা ওঠ, উঠে দাঁড়া, উপায় একটা খুঁজে পেয়েছি। চম্পা উঠে দাঁড়ায়, কি পেয়েছিস মলি। মলি এবার হাসি মুখে নিজের ভর্তি হবার টাকা চম্পার হাতে দিল, চম্পা অবাক হয়ে - আমি টাকা দিয়ে কি করবো? মলি - ক্লাস viii-এ ভর্তি হবি। আমি! হ্যাঁ তুই তাহলে তোর কি হবে? আমি এখন বাড়ি যাবো, টাকা এনে আমিও ভর্তি হব, তুই আর দেরী করিসনা চম্পা। তুই ভর্তি হয়ে বাড়ী চলে যাবি, আমার সাথে কালকে দেখা হবে।

মলি সাইকেল ছুটালো বাড়ির দিকে। চম্পা মলির কথামতো ভর্তি হয়ে বাড়ি চলে গেল। মলির সাইকেল তীব্র গতিতে ছুটছে, রাস্তা কোথায় ভাঙা, কোথায় গর্ত, কোন কিছুই মানছে না ঐ সাইকেলটা। কারণ বাড়ি থেকে টাকা এনে আজকেই ভর্তি হতে হবে মলিকে। আজকেই যে ভর্তির শেষ দিন।

ভাগ্যদেবী মনে হয় মলির সহায় ছিল না। তাই সাইকেলের টায়ার ফেটে গেল। হায় হায়, এবার কি হবে, কাছে পিঠে কোথাও যে সাইকেল সারাবার দোকান নেই। মলির চোখে এবার জল নেমে এল। কি হবে এবার? কি করবে মলি? ভাগ্যের উপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল মলি।

মলি মনে মনে ভাবল চম্পাকে টাকাটা দিয়ে সে কোন ভুল করেনি তো? সাইকেলের টাকা ফেটে গেল এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। মলি এটাও বুঝে নিল এই পায়ে হেঁটে বাড়ি থেকে টাকা এনে আজকে সে স্কুলে ভর্তি হতে পারবেনা।

তাহলে এখন ওর স্কুলে পড়ার কি হবে? হাঁটছে আর ভাবছে। ভাবছে আর হাঁটছে। মলি জানতো আজকের বিষয়টা ওর মা কিছুতেই মেনে নেবে না। তাই মায়ের কাছে কোন স্তরের শাস্তি অপেক্ষা করছে কি জানি। বাবা মৃণালকান্তি খুব ভালো মানুষ। তিনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝবেন। মলির মনে বিশ্বাস ছিল যে, ওর বাবা স্কুলে ভর্তি হবার বিষয়ে হাল ছাড়বেন না, কিছু একটা করবেই করবে।

অবশেষে বিষন্ন মনে বাড়ি পৌঁছালো মলি। মা বিষয়টা শুনেই কষে এক চড় মারল মলির গালে। রাগের ভাষায় গালি গালাজ করতে লাগল। ভাত খেতে দিলনা, বাড়িতে শোক নেমে এলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। মা ও মেয়ে দুজনের চোখেই জল।

সন্ধ্যার পরে অফিস থেকে ফিরলেন মলির বাবা। বাড়িতে পা দিয়েই তিনি বুঝে নিলেন কোন অঘটন ঘটেছে বাড়িতে। মলির মা - মলির বাবাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে সব কথা বলে। মৃণালবাবু - বুঝলাম, ওকে খেতে দাওনি। না দিইনি, ও তো খেতে চায়নি। মৃণালবাবু - এখন ভাত বাড়ো, আমাকেও দিয়ে দাও। মৃণালবাবু মলির কাছে যায়। মলিমা, মা মলি। মলি পড়ার টেবিলে মুখ গুজে বসেছিল, আমার কাছে একটু আয় মা। এ্যাতো বড় মন তুই কোথায় পেলি, তোর বাবার মনতো এ্যাতো বড় না। আমার মাথাটা আজ তুই কত উঁচু করে দিয়েছিস জানিস। আমার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে সবাই দেখে যাও সবাই শুনে যাও আমি যা ভাবতেও পারি না, আমার মেয়ে তাই করে দেখালো।

মলি - বাবা বলে জড়িয়ে ধরে মৃণালবাবুকে, অর্চনা পাশে দাঁড়িয়ে নিজের চোখ মুছতে লাগলো। আর মেয়ের উদার মনের বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলো।

মৃণালবাবু পরের দিন অফিসে না গিয়ে, মলিকে নিয়ে স্কুলে গেলেন। চম্পা আগেই স্কুলে গিয়ে মলির জন্য অপেক্ষা করছিল। মলিকে দেখতে পেয়ে কাছে এল এবং বিষয়টা জানতে পারল। মৃণালবাবু মলি ও চম্পাকে সাথে নিয়ে হেডমাষ্টারের ঘরে ঢুকলেন। মৃণালবাবু বিষয়টা হেডমাষ্টারকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন।

হেডমাষ্টার সব কিছু শুনে অবাক দৃষ্টিতে মলির দিকে তাকিয়ে রইলেন কারণ হেডমাষ্টারমশাই যে নীতিটা বিশ্বাস করেন, যে আদর্শটা মেনে চলেন তার সব কিছুই যেন মলির মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে।

মাষ্টারমশাই নীরবতা ভেঙে কথা শুরু করলেন, এমন মেয়েই তো আমার স্কুলে দরকার। মলি এই স্কুলেই পড়বে। আমি নিয়ম ভেঙে ওর ভর্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এখুনি।

মলি এই স্কুলের গৌরব, চম্পার ব্যথাটা মলি যেভাবে বুঝতে পেরেছে সেই অনুভবকে সম্মান দেওয়ার জন্য ও স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমি ঘোষণা করছি যে, চম্পা এই স্কুলে যত দিন পড়তে চায় সে পড়তে পারবে। স্কুল চম্পার নিকট হতে কোন টাকা পয়সা নেবেনা। আর মলিকে এই স্কুল আনুষ্ঠানিক ভাবে সংবর্ধনা জানাবে। হেডমাষ্টারমশাই এ কথাও জানালেন যে, মলির এই বিষয়টা শিক্ষা পর্ষদের কাছে সবিস্তারে

লিখিতভাবে জানাবেন। বিষয়টা ছোট করে দেখার কোন কারণ নেই।

স্কুলের কাজ মিটিয়ে যে যার বাড়িতে চলে গেল। অর্চনা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। মৃণালবাবুর মুখের হাসি দেখে অর্চনা বুঝে নিল স্কুলের খবরটা ভালোই হবে। ঘরে গিয়ে মৃণালবাবুর মুখে সব শুনে অর্চনা পাশের ঘরে মলির কাছে যায়। মলিরে তোর বাবার মতো এ্যাতো বুদ্ধি আমার মাথায় নেই তাই রাগের মাথায় চড় মেরেছিলাম। তোর খুব লেগে ছিল তাইনা। কি যে বলো মা কথা বলে মলি - চড় মেরে তুমি একজন মায়ের মতোই কাজ করেছো।

মলির পাড়ার অন্য একটি মেয় মলির স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। স্কুলের এই খবরটা পাড়াতে এসে ছড়িয়ে দিল। পরের দিন সকালে অর্চনার চোখে পড়ল বাড়ির সামনে পাড়ার অনেক মানুষের ভিড়। অর্চনা কিছু বুঝতে না পেরে, মৃণালবাবুকে ঘুম থেকে তুললেন। মৃণালবাবু বাড়ির বাইরে যেতেই সবাই ঘিরে ধরলেন। মলি কোথায়, যেই মেয়েটি পাড়ার মুখ উজ্জ্বল করেছে, তাকে সবাই দেখতে চায়। অর্চনা মলিকে ঘুম থেকে ডেকে নিল। মলি বাইরে যেতেই পাড়ার ঠাকুমা মলির গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। ক্লাবের সম্পাদক মলির হাতে ফুলের তোড়া ধরিয়ে দিলেন। এগুলি রাতেই এনে রেখেছিল। পাড়া কমিটির সভাপতি বললেন, আমরা দু-চার দিনের মধ্যে পাড়ার পক্ষ থেকে মলিকে সংবর্ধনা জানাবো।

কয়েকদিন পার হয়ে গেছে। খবরটা আশে পাশের পাড়াতেও ছড়িয়ে গেল। ঐ সব পাড়ার ক্লাবগুলি মলির বাবার সাথে যোগাযোগ করে তারাও মলিকে সংবর্ধনা দিতে চায়।

শিক্ষা পর্ষদ থেকে মলিকে অভিনন্দন জানিয়ে স্কুলে চিঠি এসেছে, পর্ষদ এ কথাও লিখেছে পরে দিন তারিখ ঠিক করে মলিকে পর্ষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেবে।

এই সংবর্ধনার পর্ব যেখানে যেখানে হয়েছে, মলি সব খানেতেই চম্পাকে সাথে করে নিয়ে গেছে। লেখাপড়া শেখার জন্য চম্পাকে আর চোখের জল ফেলতে হয় না। মলি আর চম্পার দিনগুলি আনন্দের সাথেই কাটতে লাগলো।

নপুংসক

সোমনাথ দাস

রিয়া, তোমাকে সাহায্য করতে পারি। মানে, তোমাকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসতে পারি।

না রিম, আমি বাস ধরে চলে যাব। আমাকে ছেড়ে তুমি আবার বাড়ি ফিরবে। তোমার দেরি হয়ে যাবে।

না রিয়া, আমার কিচ্ছু দেরি হবে না। আমি তো তোমাদের ওদিকে এক বন্ধুর কাছে একটা পার্সেল আনতে যাব। চাইলে তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে আসতে পারি - বলে উত্তরের অপেক্ষায় থাকে রিম।

রিয়ার চোখ এবং ঠোঁট কিছু একটা বলতে চায়। না বনাম হ্যাঁ-এর দ্বন্দ্বে পড়ে কী যেন ভাবে। ঠোঁট নেড়েচড়ে বলে, আমি বাসে চলে যাব রিম। তুমি যাও।

এরকম একটা উত্তর আশা করেনি রিম। একটা অস্বস্তির ভাব তার চোখে মুখে। রিয়া চলে যেতে চাইলে রিম ডেকে বলে, একটা কথা ছিল রিয়া। কথাটা অনেকদিন মনের গভীরে লালন করে রেখেছি। কিন্তু বলার সুযোগ পাইনি।

কী এমন কথা রিম, যেটা আমাকে বলার ছিল অথচ বলতে পারনি! এতদিন ধরে একসঙ্গে কাজ করছি, একদিনও সময় হয়নি কথাটা বলার! তোমরা পুরুষরা কি সবাই একরকম? পেটে কথা অথচ মুখে নেই - বলে রিয়া ঠোঁটের কোণে হাসি লুকায়।

ঠিক কি ভাবে কথাটা শুরু করবে ভেবে না পেয়ে রিম বলে, আমরা এক অফিসে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি। আমাকে দেখে তোমার কোন ফিলিংস হয় না?

ফিলিংস ! তুমি কী বলতে চাইছ?

মানে অনুভূতি। তোমাকে যখন দেখি আমার মনের মধ্যে যেন কেমন একটা অনুভূতির স্রোত বয়ে যায়। আর তুমি এত সুন্দর যে, একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে পারি না।

কথাটা এখনই শেষ করে দিতে চায় রিম। সুযোগটা মোটেই হাতছাড়া করা যায় না। রিয়ার শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায় রিম। আন্তরিক শক্তিতে সে বলে, 'আই লাভ ইউ' রিয়া।

কী পাগলের মত বলছ রিম ! তোমার থেকে এরকম একটা কথা শোনার জন্য আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। তাছাড়া আমি তোমাকে এরকম ভাবে ভাবিনি, দেখিনি। তুমি আমার জাস্ট বন্ধু। তোমাকে বন্ধুর চোখেই দেখি। আর তুমি কীসব অনুভূতির কথা বলছ। না, তোমাকে দেখে আমার কোন অনুভূতি হয় না। কোন পুরুষকে দেখেই আমার অনুভূতি হয় না - বলে রিয়া চলে যেতে চাইলে রিম হাত টেনে ধরে।

তুমি এসব কী করছ? কেউ দেখে ফেললে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে - বলে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় রিয়া। তুমি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ রিম। এরকম ব্যবহার আমি আশা করিনি। তোমার ভালবাসাকে সম্মান জানাই, তুমি তাকে অপমানিত করো না। আর সেটা গ্রহণ করা আমার ব্যক্তিগত। সেখানে তুমি জোর খাটাতে পার না।

অপ্রতিভ রিম ডেকে বলে, এত তাড়াতাড়ি উত্তর দিও না। সময় আছে। ভেবে দেখ।

রিয়া পেছন ফিরে দাঁড়ায়। বলে - আমার ভাবার পরের উত্তরটাও না-ই থাকবে। তুমি আমাকে আর এ বিষয়ে বিরক্ত করবে না। তুমি শিক্ষিত, নিশ্চয় বুঝবে - বলে চলে যায় রিয়া।

অমাবস্যার অন্ধকারে স্ট্রিট লাইটের আলোয় রিমের চোখ দুটো ক্ষুধার্ত বাঘের মতো জ্বলজ্বল করে ওঠে। মানুষের মনের গহনে ভালো ও মন্দের যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তার যে দিকটার পাল-া ভারী থাকে, মন সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। ক্ষুধার্ত বাঘের প্রধান লক্ষ্য তার ক্ষুধার নিবারণ করা। তাই শিকার ধরার জন্য সে ওত পেতে থাকে। ক্ষুধার্ত, ক্ষিপ্র, চতুর বাঘ কষ্টসাধ্য চেষ্টায় তার শিকার ধরতে সক্ষম হয়। খাদ্য-খাদক এর এই সম্পর্ক চিরকালীন সত্য। পশুকূলে এই সত্য স্বীকৃত।

এর মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে যায়। রিয়া ও তার মা, বোনের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অফিস থেকে চারদিনের ছুটি নিয়েছে। মা, বোন এবং রিয়ার সংসারে রিয়াই একমাত্র রোজগেরে। বাবা বছর দুয়েক আগে মারা গেছে। বাবার চাকরিটা-ই রিয়া পেয়েছে। তাই সংসারের সমস্ত ভার রিয়া নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। তার মনের প্রায় সমগ্র অংশই সাংসারিক কাজে ব্যস্ত। অন্যকিছু ভাবার অবকাশ সে পায় না। বোনের পরীক্ষার প্রস্তুতি ও মা'র শারীরিক যত্ন এই নিয়েই তার চেতনার জগৎ। নিজ সত্ত্বার উপলব্ধি করলেও তাকে সে অনেকটা অপাংক্তেয় করে রেখেছে।

চারদিন পর রিয়া অফিসে যায়। একেবারে অফিসের গেটের সামনেই রিম দাঁড়িয়ে। রিয়াকে দেখামাত্রই বলে, আমি দুঃখিত। সেদিনের সেই ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। বন্ধু ভেবে আমাকে ক্ষমা করতে পার না।

ঠিক আছে রিম। তুমি যে তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ, সেটা দেখে আমার ভালো লাগছে - বলে রিয়া অফিসের ফটক দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যায়।

রিম পিছন পিছন গিয়ে রিয়াকে বলে, তাহলে বুঝে নিতে পারি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করলে। আজ থেকে আমরা দুজনে আগের মতোই ভালো বন্ধু।

হ্যাঁ। বলে দুজনেই হাসে।

আকাশে পেজা তুলোর মতো সাদা মেঘ পাল তুলে পাড়ি দেয় কোন দূর নীলাকাশে। হাওয়ায় দোল খায় কাশফুলের গুচ্ছ। রঙিন উষায় বৃন্ত থেকে খসে পড়ে শিউলি ফুল। লুটোপুটি খায় মাটিতে। রাঙা হয়ে ওঠে ধরণী। পূজোর ক'দিনের ছুটিতে সংসারটাকে একটু গুছিয়ে নিতে চায় রিয়া। একথা ভাবতে ভাবতে অফিসে পৌঁছায় রিয়া। তার টেবিলে অনেকগুলি ফাইল পড়ে। কাজগুলি আজই শেষ করে বাড়ি ফিরবে।

হায় রিয়া, বেশ দেখাচ্ছে আজ তোমাকে। একথা বলে রিম তার টেবিলের পাশে চেয়ারটিতে বসে।

থ্যাংকস।

রিম একটু আনমনা হয়েই চেয়ারে বসে। মাঝে মাঝে রিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার পাশ ঘেঁষে বসতে চায়। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। রিয়ার দিকে আড়চোখে তাকায় রিম। একটা কিছু ভাবনায় তার মনের গভীর গহনে আন্দোলন দানা বাঁধে। তার বিস্ফোরিত নয়ন কিছু একটা চায়। চাওয়া পাওয়ার ভাবনায় সময় বয়ে যায়। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়। রিয়ার কাজ সমাপ্ত হয় না। রিয়া আজ কাজ শেষ করেই উঠবে। অন্যদিকে অফিসের প্রায় সকলেই বাড়ি চলে যায়। অকারণ বসে থাকে রিম। এতক্ষণ

রিম অফিসে বসে একটা কাজই করেছে। তা রিয়ার দিকে তাকানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাখির কিচিরমিচির শব্দ জানালার কাঁচের ফাঁক দিয়ে রিয়ার কানে প্রবেশ করে। আর দুটো মাত্র ফাইল বাকি আছে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে কাজ। এই ভেবে একটু হাত চালিয়ে কাজ করে রিয়া। অন্যপ্রান্তে কম্পিউটারের কি-প্যাডটাকে অকারণ আঘাত করে চলে রিম। কাজ করতে করতেই রিয়া রিমকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এখনও বাড়ি যাওনি। আমি ভাবলাম আমারই একমাত্র কাজ বাকি। তা তুমি কখন যাবে?

এই তো আর কিছুক্ষণ। আর দুটো ডি.টি.পি বাকি আছে। হলেই কাজ শেষ। তুম কখন উঠবে? বলে রিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করি রিম।

বলতে পারছি না - বলে কাজে মগ্ন থাকে।

রিম কথা বলার কোন কথা খুঁজে পায় না। সেও বসে থাকে। তবে অকারণ।

স্ট্রিট লাইটের আলোগুলি অনেকক্ষণ আগেই জ্বলে উঠেছে। বাইরে মানুষের কোলাহল অনেকটা কমে আসে। একফালি বাঁকা চাঁদ উঁকি মেরেই ডুবে যায় মেঘের আড়ালে। একটা ট্রেন যাওয়ার হুইসল শুনতে পায় রিয়া। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিমর্ষ দেখায় রিয়াকে। কখন যে রাত দশটা বেজে গেছে খেয়ালই করেনি। এদিকে তার কাজটাও শেস হয়নি। কিন্তু এবার কাজ বন্ধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই তার। ফাইলগুলি গুটিয়ে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু বাড়ি যাবে কী করে? গাড়ি তো নেই।

তোমার কাজ হয়েছে রিম ?

হ্যাঁ, রিয়া।

আমাকে একটু তোমার বাইকে ছেড়ে আসতে পারবে ?

নিশ্চয়।

যে রিয়া একদিন তার একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তার বাইকে ওঠেনি, সে-ই কিনা আজ নিজে থেকে যেতে চাইছে! রিমের মনের আনন্দধারা মুখাবয়বে স্পষ্ট প্রতীয়মান।

একসময় রিম বাইক নিয়ে একটি কানাগলিতে প্রবেশ করে। রিয়া আপত্তি জানিয়ে বলে, এটা তো আমার বাড়ির রাস্তা নয় রিম। খটকা বাধে তার মনে। রিম অকপট ভঙ্গিতে বলে, শর্টকার্ট রাস্তা। তবুও একটা অজানা আশঙ্কায় রিয়ার কপালে চিন্তার ভাঁজ। যেতে যেতে জনহীন বড় রাস্তার মোড়ে গাড়িটা দাঁড় করায় রিম। রিয়া জিজ্ঞাসা করতেই রিম হাত ধরে বলে, 'আই লাভ ইউ' রিয়া। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।

আশঙ্কাটা যে সত্যি হবে এটা রিয়া কল্পনা করতে পারিনি। বিরক্তভাবে রিয়া বলে, তুমি বন্ধু নামের কলঙ্ক। ভেবেছিলাম সেদিনের সবকিছু তুমি ভুলে গেছ। আমার ধারণা ভুল হয়েছে। তোমাকে বন্ধু ভেবে বিশ্বাস করাটাই আমার চরম ভুল হয়েছে।

আমার মধ্যে কিসের কম আছে রিয়া। তোমার মা-বোনের সংসার আছে এটা জেনেও তোমাকে আপন করতে চেয়েছি। বলে রিয়াকে জড়িয়ে ধরে।

নিজেকে রিমের বাহুপাশ ছিন্ন করে রিয়া বলে, তুমি যে নরপিশাচ তা তোমার আচরণেই প্রমাণ দিচ্ছে। তুমি নপুংসক।

'তবে রে' - একথা বলে রিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিম। তাকে পাজাকোল করে তুলে নিয়ে যায় ঝোপের দিকে। মধ্যরাতে জনহীন প্রান্তরে একটি নারীকণ্ঠের ব্যাকুল আর্তনাদ ঝোপের আড়ালেই চাপা পড়ে থাকে।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের শিক্ষাচিন্তা

অনিরুদ্ধ সাহা, মুদাসার নাজার বৈদ্য, অভিজিৎ মন্ডল

ভূমিকা ঃ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান ছিলেন বহুমূখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক চেতনার স্ফুরণ তাঁর জীবনধারায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। মানবিকতাবাদ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়, ধর্মীয় প্রজ্ঞা, আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রভৃতি দিকগুলি রাধাকৃষ্ণানের কর্মজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ এবং প্রজ্ঞার অধিকারী। জীবনের অধিকাংশ সময় সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে অতিবাহিত করার চেষ্টা করেছেন। এহেন বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী রাধাকৃষ্ণাণের শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় ছিল প্রগাঢ় বাস্তববোধ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সংমিশ্রণ। একবিংশ শতকের সমস্যাময় বিশ্বে তাই রাধাকৃষ্ণাণের জীবনাদর্শের আলোকেই মানবিক মূল্যবোধে জাগরণে এই পত্রে সময়োচিত প্রয়াস রাধাকৃষ্ণাণের শিক্ষাচিন্তা।

রাধাকৃষ্ণাণের শিক্ষাদর্শন ঃ

রাধাকৃষ্ণাণ ছিলেন বেদান্তদর্শন এবং উপনিষদের চিন্তাধারায় গভীরভাবে বিশ্বাসী। ভাববাদী দর্শনের চিন্তাধারার দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর এই দার্শনিক প্রেক্ষাপট শিক্ষাচিন্তার উপর প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি এমনই এক শিক্ষাপ্রদানের কথা বলেছিলেন যা আত্মিক উন্নতির সহায়ক। যা তেজ বা নৈতিক শক্তি জোগাবে। তাঁর মতে, “Literacy is not education, knowledge is not education, but the growth of wisdom, the capacity to look upon other objects with Compassion, that is what is necessary.”

রাধাকৃষ্ণাণ প্রতিটি মানুষকে সত্যদ্রষ্টা হওয়ার কথা বলেন। জগতের প্রতিটি বস্তু, ঘটনার পশ্চাতে যে চৈতন্যস্বরূপ তাঁকে জানার কথা বলেন। ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’ উপনিষদের এই বাণী তাঁর অন্তর্জগতকে আলোড়িত করেছিল। উপনিষদের অভিমন্ত্রে তিনি সাহস সঞ্চয় করেছেন। উপনিষদই জগতের মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে - ‘হে মানব তেজস্বী হও, তেজস্বী হও। বীর্য অবলম্বন কর’।

১৯৬২ সালের ৫ই আগষ্ট আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন - শিল্পকলার অর্থ হল দৈব উপলব্ধি। শিল্পকলার দ্বারা অনন্ত সত্ত্বাকে উপলব্ধি করা যায়। শিল্পকলার উদ্দেশ্য শুধুই আমোদ প্রমোদ বা বিশেষ ধরণের শিক্ষা নয়। নিজস্ব শিল্পকলার মাধ্যমে নিজের স্বতন্ত্র শক্তি তৈরী হয় যা অন্যের থেকে নিজেকে পৃথক করে। শিল্পকলাকে ধর্মীয় সত্ত্বা থেকে পৃথক করা যায় না।

শিক্ষাব্যবস্থার অসাড়তা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা আজও গ্রহণযোগ্য। ১৯৫৬ সালের ১২ই জুলাই কেনিয়ার নাইরোবিতে গান্ধী মেমোরিয়াল একাডেমি উদ্বোধনকালে রাধাকৃষ্ণাণ বলেন - বর্তমান যুগে যে সঙ্কটের সম্মুখীর আমরা হচ্ছি তা হল আধ্যাত্মিকবোধের সংকট।

জাতি, উপজাতি ও জাতীয় স্তরে আমাদের অহংবোধকে নাশ করে যদি ভালবাসার দ্বারা সকলকে আপনার করে নিতে না পারি তাহলে তা ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল হবে না। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির এমন অবস্থা হয়েছে যে এখানে শিশুদের চামচে করে বিষয়বস্তুকে খাইয়ে দেওয়া কিছুটা মনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিনী শক্তির প্রবেশ ঘটানো হয় না। (Occasional Speeches and writtings third series)

শিক্ষার অর্থ ঃ

রাধাকৃষ্ণাণ জানিয়েছেন, ‘Education has been my special subject.’ এজন্য শিক্ষার প্রকৃত অর্থ নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল। প্রথাগত শিক্ষাকে তিনি প্রকৃত শিক্ষা হিসাবে গণ্য করেননি। এজন্য তিনি বলেছেন — Education is there to help his to findout what we are for in this world. Is it merely to grow leaned, or is it for the purpose of fulfilling yourself and making yourself an offering to the supreme? Man cannot be satisfied by wealth, by learning, but by developing the quality of detachment, of renunciation, making himself the instrument of a frigher purpose.

রাধাকৃষ্ণাণ মানবিক, আত্মার পরিশুদ্ধি এবং হৃদয়সত্ত্বার বিকাশকেই শিক্ষার প্রকৃত অর্থরূপে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, “.... it must include not only the trainning of the intellect but the refinement of the heart and discipline of the spirit. No education can be regarded as complete if it neglects the hear and spirit.”(Occassional speeches and writings, 1956-p. 142)

শিক্ষার অর্থ এই নয় যে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু তথ্য আত্মস্থ করা। শিক্ষা হবে চরিত্রগঠনের সহায়ক। দুর্বল চরিত্রের রোক কোন মহৎ কাজ করতে পারেনা। কিংবা তার দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ হতে পারে না। রাধাকৃষ্ণাণের মতে, “The progress of the nation depends on our character.”

শিক্ষার কার্যাবলী ঃ

শিক্ষার কাজ কি হবে সে সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণাণের সুস্পষ্ট চিন্তাধারা ছিল। রাধাকৃষ্ণাণ শিক্ষার নিম্নলিখিত কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন —

মানবকল্যাণ সাধন ঃ শিক্ষার মাধ্যমে মানবকল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন, “ No nation in this world can hold its place of primacy in perpetrity. What counts is the moral contribution we make to human welfare .....” (Occassional speeches and writings, 1956-p. 142)

গণতান্ত্রিক মনোভাব গঠন ঃ রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন, “Education must be developing dedmocratic attitude. Educational institutions should train people for freedom, unity and not localism, for democracy, not for dictatorship.”

বিজ্ঞান ভিত্তিক চেতনা গঠন ঃ এ প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন, “ Science is to

be used for productive work. We should develop spirit for enquiry and dedication in the persuit of science and sccholaarship."

মানবিক মূল্যবোধ গঠন ঃ রাধাকৃষ্ণাণ নৈতিক নীতি সমূহ এবং আধ্যাত্মিক চেতনার দ্বারা মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের কথা বলেছিলেন।

অনুসন্ধানের স্পৃহা বিকশিত করা ঃ এ প্রসঙ্গে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, "We should develop the spirit ofenquiry and dedication to the prrsmit of science and scholarship. We waste our years in college in trivialities and inanities. We need education in character."

শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ ঃ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ছিলেন একজন মানবতাবাদী চিন্তাবিদ। এজন্য তিনি শিক্ষার বহুমুখী লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন। শিক্ষার লক্ষ্যরূপে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, চরিত্রের বিকাশ, সংস্কৃতির সঞ্চালন - সংরক্ষণ ও উন্নয়ণ সাধন, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ, বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিকাশ, জাতীয় সংহতির বিকাশ, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার বিকাশ, বিজ্ঞানভিত্তিক মনোভাবের বিকাশ ইত্যাদিকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "The true aim of education, according to the Indian stages, is second birth. We are born into the world of nature and necessity, we must reborn into the world of spirit and freedom. In silence and meditation we discover the spirit in us, learn truth and love, acquire grace and strength by which we can implement our ideas."

শিক্ষার পাঠ্যক্রম ঃ রাধাকৃষ্ণাণের মতে, পাঠ্যক্রম হবে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি চেয়েছিলেন, শিক্ষার্থীরা নানাবিধ নিয়ম শিক্ষালাভ করুক। ভাষা, সাহিত্য, সমাজবিদ্যা (ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ইত্যাদি) দর্শন, নীতিতত্ত্ব, তত্ত্ববিদ্যা, রাজনীতি, নাগরিকবিদ্যা, বিজ্ঞান (প্রাকৃতিক এবং মানবিক), গণিত, কলা, সঙ্গীত, চারুশিল্প, বৃত্তিমূলক/পেশাগত বিষয়সমূহ, খেলাধূলা এবং শারীরশিক্ষা,যোগ এবং ধর্ম ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়কে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন। রাধাকৃষ্ণাণ ভাববাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর পাঠ্যক্রমে ভাববাদী পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। জ্ঞানমূলক, নৈতিক বিষয়গুলির পাশাপাশি গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উপর তিনি গুরুত্ত আরোপ করেছিলেন। নারীদের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রমের কথাও বলেছিলেন। গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শিশুপরিচর্যা, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতি বিষয়কে নারীদের জন্য নির্ধারিত করার কথা বলেছিলেন। মাতৃভাষা, হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষা চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ রাধাকৃষ্ণাণ জ্ঞান আহরণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা বলেননি। তিনি দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন। যথা — কি শেখাতে হবে ? এবং কিভাবে শেখাতে হবে? এই দুটি দিক সম্পকে শিক্ষকদের জানতে হবে। কারণ এগুলি কার্যকরী শিক্ষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসাবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, আলোচনা, ধ্যানের মাধ্যমে শিখন, পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক কৌশল, সেমিনার, টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা, যোগব্যায়াম এবং অপরোক্ষানুভূতি (intuition) ইত্যাদির উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণাণের শিক্ষণ পদ্ধতির দুটি বিশেষ দিক হল - সহযোগিতামূলক পদ্ধতির সূচনা এবং

আন্তঃবিষয় ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে প্রচেষ্টা করবে এবং একটা সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে উঠবে।

শৃঙ্খলা ঃ রাধাকৃষ্ণাণ 'শৃঙ্খলা' বলতে আত্মনিয়ন্ত্রণকেই বুঝিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাবই শিক্ষার্থীদের পাণ্ডিত্য, চরিত্র এবং ঐক্যের মানকে কলুষিত করে থাকে। শৃঙ্খলা ছাড়া যোগকর্ম এবং আধ্যাত্মিক কার্যাবলী পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই আত্মোপলব্ধি ঘটানো সম্ভব।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তোলার জন্য তাদের মধ্যে সুঅভ্যাস তৈরি করতে হবে। N.C.C ইউনিটের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্ত করে তাদের শৃঙ্খলা পরায়ণ করা যায়। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা পরায়ণ করার জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। মানসিক উন্নতির জন্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে আপনা থেকে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠবে। (Discipline and University Education Commission, Chapter XII)

শিক্ষকের ভূমিকা ঃ শিক্ষকের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণাণ বলেছিলেন, "Teacher is the corner stone of the arch of education." তিনি শিক্ষকদের 'আচার্য' রূপে গণ্য করে বলেছিলেন - যার আচার-আচরণ অনুকরণযোগ্য সেই-ই প্রকৃত শিক্ষক। রাধাকৃষ্ণাণের মতে, একজন প্রকৃত শিক্ষক নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশের ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন। রাধাকৃষ্ণাণ বিশ্বাস করতেন যে, "A good teacher must know how to arouse the interest of the pupil in the field of study for which he is responsible ....."

শিক্ষকের ভূমিকা হবে,অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করা, নবচেতনার উন্মেষ ঘটানো। তিনি বলেছিলেন, "Teachers are thereservoirs of new spirit, the new spirit of adventure, in the intelectual matters, in social matters, in political matters. If you do not have that spirit you cannot Communicate that spirit to the youth, who are entrusted to your care ...." শিক্ষক নিজেকে দৃষ্টান্ত রূপে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপন করবেন। এ প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণাণ বলেছিলেন, "It is education, it is instruction, it is knowledge and it is also the example which the teacher give." (Aggarwal J.C., 2002, p 260-261)

নারী শিক্ষা ঃ নারী শিক্ষার প্রতি রাধাকৃষ্ণাণের সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি নারীদের প্রতি আমাদের রক্ষণশীল সমাজের চিন্তাধারার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, "In ancient times, our women had the ceremony of upanayana performed for them. They were also entitled to the chanting of the qayatrijapa.All these things were open to our women .... it is essential, therefore, that our women should be treated as equal to others in every respect, political, economic, cultural and spiritual, That is what we should do."

রাধাকৃষ্ণাণ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থেকে নারীজাতিকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলেছেন। নারীরা যাতে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে কাজ করতে পারে এবং সমমর্যাদার অধিকারী হতে পারে তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার কথা বলেছেন। নারীরা যাতে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে তারজন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষায় পুস্তক ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা ঃ রাধাকৃষ্ণাণের মতে পুস্তকই সভ্যতার বাহন। আমরা গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন করতে চাই। এজন্য পুস্তকের প্রয়োজন। আমাদের জনসাধারণকে বলা দরকার গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়। পুস্তকের মাধ্যমেই তা করা যেতে পারে।

রাধাকৃষ্ণাণের মতে, প্রাচীন গ্রন্থগুলি সর্বোৎকৃষ্ট। প্রাচীন পুঁথি-পুস্তক আমাদের সত্যানুসন্ধানে সাহায্য করে। সর্বশাস্ত্র প্রয়োজনম্ তত্ত্বদর্শনম্। শাস্ত্রজ্ঞান লাভের মাধ্যমে সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করাই সমস্ত শাস্ত্রের সারকথা।

চিত্তবিনোদন এবং অবসরযাপনের ক্ষেত্রে পুস্তকের গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথাও রাধাকৃষ্ণাণ তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন আজকাল বিভিন্ন লোক বিভিন্ন উপায়ে সময় অতিবাহিত করে। সর্বোত্তম পন্থা পুস্তকের সান্নিধ্যে থেকে সময় অতিবাহিত করা। তবে সেই পুস্তক হবে নৈতিক এবং আত্মিক উন্নতির সহায়ক। তাঁর মতে, "The best life one can have is the life in the company of great books and great men."

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের চাহিদা পূরণ এবং জ্ঞানের সীমা প্রসারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকার অপরিহার্যতা উলে-খ করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণাণ বিশ্বের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের উদাহরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে উলে-খযোগ্য অক্সফোর্ডের বোদলেয়ান লাইব্রেরী, লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম রিডিং রুম, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ওয়াশিংটনে দ্য লাইব্রেরী অব কংগ্রেস এবং নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী। বহু খ্যাতনামা লেখক, দার্শনিক এবং সাহিত্যিক এই গ্রন্থাগারগুলির সাহায্য নিয়ে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। রাধাকৃষ্ণাণ চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করুক। এজন্য তিনি গ্রন্থাগারগুলির উপযুক্ত ব্যবহারের কথা বলেছেন।

একবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে রাধাকৃষ্ণাণের প্রাসঙ্গিকতা ঃ একবিংশ শতকের সমস্যাদীর্ণ এবং বিশ্বায়নের যুগে ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে গিয়ে বলা যায়, তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ছিল দার্শনিক প্রজ্ঞাপূর্ণ, সুদূরপ্রসারী এবং বাস্তবজীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এবং লক্ষ্য সংক্রান্ত তাঁর মতামতটি খুবই গ্রহণযোগ্য। পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এবং লক্ষ্য সংক্রান্ত তাঁর মতামতটি খুবই গ্রহণযোগ্য। পাঠ্যক্রমের সঙ্গে বাস্বজীবনের সংযোগসাধন এবং বহুমুখী বিকল্পভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি সংক্রান্ত দিকগুলি একান্তভাবে অপরিহার্য। বর্তমান ছাত্র বিশৃঙ্খলার যুগে রাধাকৃষ্ণাণের 'শৃঙ্খলাতত্ত্ব' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। শিক্ষকের কর্তব্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারাটি শুধুই গ্রহণযোগ্যই নয়; প্রয়োগযোগ্যও বটে। তাঁর জীবনধারার পদ্ধতি এক্ষেত্রে অনুকরণযোগ্য। পরিশেষে হিতবাদের উক্তি দিয়েই আলোচনা শেষ করা হল -

"Dr. S. Radhakrishnan (1888-1975), philosopher, humanist, educationist, orientalist and religious thinker was one of those few greatmen of this Country who distinguished themselves equally in the fields of knowledge as well that of statemanship."

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। বরেণ্য শিক্ষক সর্বপলী রাধাকৃষ্ণাণ - বিদ্যুৎ বিকাশ দে, বুক ওয়ার্ল্ড, জানুয়ারী ২০১০, কলকাতা।

২। ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ - রেণু সারাণ, জে.আর.ডায়মন্ড, জানুয়ারী ২০১৩।

৩। Aggarwal, J.C. (2002), Theory and principles of Education, New Delhi : Vikas publishing house Pvt. Ltd.

৪। Banerjee, A.K. (1991). Dr. S. Radhakrishnan, B.H.W., Varanasi.

৫। Sarvapalli Radhakrishnan (1957) Occassional speeches and writings, second series, New Delhi, Publications Division, Ministry of Information & Broad Casting, Govt. of India. P-88.

৬। Sarvapalli Radhakrishnan (1956) Occassional speeches and writings, Volume 3, New Delhi, Publications Division, Ministry of Information & Broad Casting, Govt. of India. P-142.

৭। Sarvapalli Radhakrishnan(2009). The pursuit of truth, New Delhi : Hind Pocket Book.

বিভূতি'র দেবযান ঃ বৈষ্ণবীয় প্রেমভাবনা

সুদীপ সেনগুপ্ত

সুদীপ সেনগুপ্ত (বাংলা বিভাগ) শিমুরালী শচীনন্দন কলেজ অফ এডুকেশন।

সর্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যাপি ধ্বংস কারণে
যদ্ভাবো বন্ধন যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিত ॥
(উজ্জ্বল নীলমণি/শ্রীরূপ গোস্বামী)

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন — 'ধ্বংসের সবরকম কারণ থাকা সত্ত্বেও যা ধ্বংস হয় না তাই যথার্থ প্রেম।' বলাবাহুল্য এ প্রেম কাম-গন্ধহীন প্রেম, দেহকে অতিক্রম করে তা নন্দন কাননের সামগ্রী তো বটেই, বরং বাস্তবিক ধূলা ধূসরিত জাগতিক কামনা বাসনাকে অতিক্রম করে ওঠা এ প্রেম যেন স্বর্গীয় পারিজাত। প্রকৃতি ও মানব প্রেমিক বিভূতিভূষণ তাঁর 'দেবযান'-এ এই পারিজাতকে এনেই তাঁর কথা সাহিত্যের বাগানকে সুসজ্জিত করেছেন। তাঁর এক একটি পাঁপড়ি 'যতীন-পুষ্পের প্রেম, 'বিধবারমনী - তাঁর স্বামী', 'যতীনের চতুর্থ জন্মের মা ও যতীনের অংরিতটান' ও অন্যান্য নানাবিধ চরিত্র।

বিভূতিভূষণ উপন্যাস-এর সূচনা লগ্নেই বলেছেন —

" সর্ব্বজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।"

অর্থাৎ, এ বৃহতে সর্বজীব তথা সমস্ত কিছুই এই ব্রহ্মচক্রে আবর্তিত হয়। পুষ্প ও যতীন তাঁদের প্রেম পূর্ণতার জন্য এই ব্রহ্মচক্রে আবর্তিত হয়েছে, পুষ্প ও যতীনের প্রেম বিশুদ্ধ কামগন্ধহীন নিকষিত হেম এ পরিণত হয়েছে সেই ব্রহ্মচক্রের আবর্তনের কষ্টিপাথরে।

প্রথমেই আসে পুষ্পের কথা, বৈষ্ণবীয় প্রেমিকা শ্রীরাধার প্রেমের মতো তার প্রেমও যেন নিকষিত হেম। বিভূতিভূষণ তাঁর পুষ্পের এক একটি পাঁপড়ি উন্মোচন করে পুষ্পের প্রেমের অন্তঃস্থলকে দেখিয়েছেন। যে যেন ক্রমেই ভোগী থেকে যোগিনী, নারী থেকে সাত্ত্বিকায় নিজেকে উত্তরিত করেছে।

রাধা শ্যামকে পেয়ে নিজ প্রেমকে পূর্ণ করে নিতে চেয়েছিল, যার জন্য ছিল তার দুর্নিবার আকাঙ্খা, ঠিক তেমনই পুষ্পও যতীনকে পাওয়ার জন্য হয়ে উঠেছিল আকুল। যতীনের প্রতি সমর্পিতপ্রাণা। উপনিষদে বলা হয়েছে — 'ভুমৈব মহাসুখম্ নাল্পে সুখনাস্তি।' যে পুষ্পের অল্পেই সুখ ছিল, সে যতীনকে ধরে রাখতে পারেনি। তার পূর্বজন্ম নির্দিষ্ট হয়। আর শুক্লাগতির পথে অনাবর্তন মুক্তি লাভ করা পুষ্পের জন্য পড়ে থাকে কেবল মাত্র হাহাকার, সে নীরবভাবে জগতের নিয়মকে শিরোধার্য করলেও তাঁর অন্তর যেন বৈষ্ণবীয় নায়িকার মতোই আর্তনাদ করে ওঠে —

'যতীন : বলতে পারিস পুষ্প জন্মের পর জন্মান্তর
হলেও আমরা কেন মিলিত হতে পারছি না।'

পুষ্প : জানি না যতীনদা, আমি করুণাদেবীর কাছে প্রার্থনা করেছি, তিনি গ্রহদেবের কাছে জানাবেন বলেছেন।'

(বিভূতিভূষণ - দেবযান)

বৈষ্ণবীয় রাধারও কণ্ঠে যেন ঝরে পড়ে সেই এক সুর —

'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।'

(বিদ্যাপতি - পদাবলী)

পুষ্পের যে প্রেম দানা বেঁধেছিল পূর্ব জন্মে, জীবনের পরপারেও সে প্রেমকে অমর করে তোলার জন্য আশায় আশায় বুক বাঁধে, প্রেয়র আশার পথ চেয়ে থাকে; রাধা যেমন প্রেয়র আশায় অঙ্গসজ্জা করেন, যোগিনী পুষ্পও যেন প্রেয় আসার প্রস্তুতি নিতে ঘর সাজায়, প্রেয়র আগমন কালের দিন গোণে —

রাধার প্রেম প্রস্তুতি ঃ—

"হাথক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।
পাখিক পাখ মীনক পাণি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি ।। (বিদ্যাপতি)

পুষ্পের প্রেম প্রস্তুতি ঃ—

"যতীনকে পুষ্প একটা ছোটখাটো সুন্দর বাড়ীতে নিয়ে গেল। .... বাড়ীর চারিধারে ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসের মাঠ। দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। পুষ্প বললে — 'এসব আমার তৈরী জানো। আমি এদেশে এসেছি আজ আঠারো বছর, তোমার অপেক্ষায় ঘর সাজিয়ে বসে আছি।"

(দেবযান - বিভূতিভূষণ)

প্রেমের এই প্রস্তুতিতে রাধার নব সংস্করণ পুষ্প যেন বিভূতিভূষণীয় রাধা হয়ে উঠেছে।

আবার পুষ্পর এই প্রেম চিরসুখের নয়, তাঁর 'প্রেম-রৌদ্রালোকিত' প্রভাবে যেন হঠাৎ শুরু হয় - 'শ্রাবণ গগণ ঘোর ঘনঘটা।' যতীনদার মুখে শোনে আশার স্মৃতিচারণ, আশার প্রতি ভালবাসার অধিক প্রকাশ তাঁকে ব্যথিত করে। কাছে পেয়েও হারানোর বেদনা তাকে পীড়া দেয় সাধিকা রাধার মতোই —

রাধা —

" সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
নামিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ।।"

(জ্ঞানদাস)

পুষ্প —

"জন্মান্তরের স্মৃতিতেও অক্ষয় যেন হয়,
তোমার যাওয়ার পথে দেবতারা ফুল
ফেলুক। যতুদা, আমি হতভাগিনী,
চিরকাল একাই থাকব, এই আমার ভাগ্য।।"

(দেবযান - বিভূতিভূষণ)

সত্য সত্যই পুষ্প ধরে রাখতে পারেনি যতীনকে সে জন্মান্তর ছলে তার থেকে আলাদা হয়ে যায়, যেন বৈষ্ণবীয় 'মাথুরে'র হাহাকার-ই এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে —

রাধা —

' শূণ ভেল মন্দির শূণ ভেল নগরী।
শূণ ভেল দশদিশ শূণ ভেল সগরী ।।'

(বিদ্যাপতি)

পুষ্প —

'দেবী বললেন - তোকে আমার কাছে নিয়ে যাব,
পুষ্প বলল - না আমাকেও পৃথিবীতে পাঠিয়ে
দিন না; দিন না দয়া করে, সত্যি বলছি,
স্বর্গে আমার দরকার নেই।"

(দেবযান - বিভূতিভূষণ)

কিন্তু, পুষ্পের প্রেম নিকষিত হেম। তা আগুনে পোড়া খাঁটি সোনা, তাই প্রিয় হারা বেদনায় একটু শান্তির জন্য যেমন ক্ষেমদাস কিংবা রঘুনাথজীর কাছে যায় তেমনই প্রেয়রস্মৃতিটুকু আঁকড়ে বাঁচতে চায়, যা অনেকটা কৃষ্ণবিনা রাধার অনুসারীও বটে —

রাধা —

" অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শতশত গুণে
প্রিয়তম করি মানি।"

(চন্ডীদাস)

পুষ্প —

" মা ছেলেকে খাওয়ায়, কাছে বসে
বসে পড়ল প্রথম ভাগ ধারাপাত
পুষ্প বসে দেখে বেশ লাগে ওর। ...
ঘুমোও যতুদা, ঘুমোও; দুষ্টুমি
করলে মায়ের হাতের চড় মনে আছে তো!"

(দেবযান - বিভূতিভূষণ)

বস্তুত রাধার প্রেম যেমন স্তরানুক্রমে বিবর্তিত হয়, পুষ্পের প্রেমও তেমনি বিবর্তিত হয়ে উঠেছে নন্দনকাননের সামগ্রী স্বর্গীয় পারিজাত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন —

'মিলনে আছিলে বাধা শুধু এক ঠাঁই,
বিরহে টুটিয়া বাধা আকি বিশ্বময়,
ব্যাপ্ত হয়ে গেছে প্রিয়ে।'

(বৈষ্ণব কবিতা / সোনারতরী)

পুষ্পের প্রেম এই বিরহে অখিল ভুবনের নিখিল আকাশে পরিব্যাপ্ত। এখানে উলি-খিত হয় মরণোত্তর আশার যতীনের প্রতি প্রেম ব্যাকুলতা, হাহাকার, বিধবা রমনীর স্বামীর প্রতি প্রেমের কথাও।

এছাড়াও আছে বাৎসল্য প্রেম। কৃষ্ণ-যশোদার মতো যতীন ও তার মায়ের সম্পর্কও বাৎসল্যের আবরণে মোড়া —

বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য ঃ-

'শ্রীদাম সুদাম দাম ওহে শুন বলরাম
মিনতি করায় তোমাজনে।
বলে কত অতিদূর নবতৃণ তৃষ্ণাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইও দূর ।।
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করহ গমন।
নবতৃণ তৃণাঙ্কুর রাঙা পায় যদি লাগে
প্রবোধ মানে না মায়ের মন ।।

(বলরাম দাস)

দেবযানীর বাৎসল্য ঃ-

যতীনের চতুর্থজন্মের সন্তানহারা মায়ের বিলাপ —

"মেয়েটি কাঁদছে, আর বিলাপ করছে
- ও আমার ধনমণি; ও আমার সোনা
... আমার মানিক; চোখ চাও, আমার
কোল খালি করে পালিও না আমার সোনা
কোথায় যাবা আমায় ফেলে।"

(দেবযান - বিভূতিভূষণ)

সন্তান হারানোর বেদনা ও মায়ের শঙ্কাতুর চিত্রের বাৎসল্য যেন অনেকটাই বড় হয়ে ওঠে। মায়ের প্রতি যতীনের স্নেহ মাত্রা ও পুত্রের সম্পর্ককেও প্রকট করে বৈকি।

এর পাশে আছে বৈষ্ণবীয় প্রেম ভাবরসের নিবেদন, দাস্যভক্তি। রঘুনাথ দাসের গোপাল সেবা, পুষ্পের গোপাল সেবা, বিগ্রহের সঙ্গে বাক্যালাপ এই ভক্তিকেই প্রকট করে বৈকি ? কেবল রামের ভক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত। দাস্যভক্তির পরকাষ্ঠায় ক্ষেমদাস বিদ্যাপতির পদ আওড়ান —

"কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখি অথবা কীটপতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগতি পুনঃপুনঃ মতিরহু তুঁহু সঙ্গে ॥"
(বিদ্যাপতি / প্রার্থনা)

তাহলে দেখা গেল বিভূতিভূষণ যেমন উপন্যাসের মধ্যে বাৎসল্য প্রেমরসের ধারাকে দেখিয়েছেন, তেমনই দাস্যভক্তির বৈষ্ণবীয় ভগবতীয় ধারা। আশা - নেত্যনারায়ণ - রামলালের মধ্য দিয়ে পঙ্কিলতাকে দর্শন করালেও পুষ্পের ত্যাগের মহিমায়, প্রেম ভাস্বরতায় সে পঙ্কিলতা চাপা পড়ে যায়। পুষ্প সেই পঙ্কে পদ্মফুল হয়ে প্রেমকে অমরত্ব দান করে। বিভূতিভূষণ যাতে দিয়েছেন বৈষ্ণবীয় আলিম্পনা; যা তাকে কথাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট আসন দান করেছে। তিনি যেন প্রকৃতিপ্রেমিক থেকে দেবযানে প্রেমভাবনায় ললাটে রসকলি আঁকা সাদা কাপড় পরা বৈষ্ণব হয়ে উঠেছেন।

রেস

রবিশঙ্কর সেন

রেসের মাঠে দুরন্ত বেগে ছুটে চলা ঘোড়াটার পিঠের সওয়ারীর দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে মারিয়ানা। অল্পবয়সী ছেলেটা অথবা তার ঘোড়াটা, কারও একটা না বুঝি জ্যাক। সারা মাঠ জুড়ে জনতা পাগলের মতো চ্যাঁচাচ্ছে জ্যাক - জ্যাক। সওয়ারীর হাতের জাদুতে যেন ঘোড়াটা ছুটে চলেছে হাওয়ার বেগে। একটু একটু করে এগোতে এগোতে একসময় সবাইকে অনেকটা পেছনে ফেলে রেস জিতে নেয় জ্যাক। সারা মাঠ জ্যাক জ্যাক বলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। সমবেতে জনতার সাথে তালে তাল মিলিয়ে জ্যাক জ্যাক বলে নেচে ওঠে রাজকুমারী মারিয়ানাও।

এত আনন্দের মধ্যে বিজয়ীর হাতে পুরষ্কার তুলে দেবার সময় মারিয়ানা আবিষ্কার করল ছেলেটার চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। দুঃসাহসী ছেলেটার নাম জ্যাক নয়, ইয়ান। বয়স আঠারো - উনিশ। রঙ দুধে আলতা। টানা চোখ, টিকালো নাক, পুরু ঠোঁট। উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট। পুরষ্কার দেবার সময় ইয়ানের চোখে চোখ পড়তে মারিয়ানার কিশোরী মনটা কেঁপে ওঠে। মারিয়ানা লক্ষ্য করে সবাই যখন ছেলেটাকে একটিবার ছোঁয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে তখন ছেলেটা কেমন যেন অদ্ভুত নির্বিকার। শুধু তার চোখের কোণ থেকে ঝরে পড়ার অপেক্ষায় টলমল করছে দু'ফোঁটা জল। রাজকুমারী মারিয়ানার মনে হল সেই দু'ফোঁটা জল যেন ঝরে পড়তে চাইছে তার মনের উপর যার আড়ালে হয়তো বা লুকিয়ে রয়েছে কোনো করুণ রহস্য। আর তাই বুঝিবা আজ তার সামনে দাঁড়ানো এক মোহময়ী রাজকুমারী হয়ে উঠেছে আর সাধারণ পাঁচটা নারীর একজন বইতো নয়।

মারিয়ানার মনটা প্রথমে শুধু দুলে উঠেছিল। এবার যেন কোন এক অজানা ঝড়ের সামনে তার কচিপাতার মতো শরীরটা বুঝিবা কেঁপে উঠতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে কখন যেন ছেলেটির ছায়া নিঃশব্দে এসে পড়ে মারিয়ানার মনের উপর। মারিয়ানা তার চৌদ্দ বছর পার করা জীবনটাতে আগে কখনও রেসের মাঠে আসেনি। অনেকের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও এখানে আসতে তার মন চাইতো না। সেদিন শুধুমাত্র কোনো একটা বিশেষ পরব উপলক্ষ্যে রাজপরিবারের রীতি মেনে সদ্য ঋতুমতী রাজকুমারীকে রেসের মাঠে হাজির থাকতে হয়েছিল। ঐদিন রাজকুমারীর হাত দিয়ে পুরষ্কার দেওয়াটাই রীতি। সেইমতো মহাসমারোহে ঘোষণাও করা হয়েছিল। অথচ মাঠে উপস্থিত জনতার যেন রাজকুমারীর দিকে কোন নজরই নেই। তারা মাতোয়ারা জ্যাকের মালিক ইয়ানকে নিয়েই। মারিয়ানা নিজেও সেই ঝড়ে কেঁপে উঠেছিল। তবুও তার সদ্য কিশোরী মনের তলে কোথায় যেন ঠাঁই করে নেয় ইয়ান। আর তাইতো এরপর থেকে প্রায়ই রেসের মাঠে দেখা যেতে থাকে মারিয়ানাকে। মারিয়ানা যেন সম্মহিতের মতো মাঠে যায় আর বুকের তলে কি যেন একটা লুকিয়ে নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে কখন যেন বিষবৃক্ষের মতো পল-বিত হতে থাকে একটা প্রশ্ন - কি অলৌকিক ক্ষমতায় ঐটুকু ছেলেটা প্রায়ই রেস জিতে নেয়। অথচ তার

কোনো উচ্ছ্বাসই বাইরে থেকে ধরা পড়ে না। ছেলেটির ঐ নির্বিকার চাহনির নীচে যেন লুকিয়ে আছে এক অসীম যন্ত্রণা। অজানাকে জানার বাসনাটি মারিয়ানার ভিতরে কখন যেন লাগামছাড়া হয়ে ওঠে।

মারিয়ানার প্রিয়সখী আয়েনা। রাজকুমারীর ভিতর -বাইরের পরিবর্তন তার চোখ এড়ায়না। ওদিকে মারিয়ানা মনের কথা কাউকে বলতে না পেরে ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। ডাক্তার-বদ্যি এসে ওষুধ দিয়ে যায়। মারিয়ানার বাইরে বেরোনোও বন্ধ হয়ে যায়। তবুও মারিয়ানা মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারে না। এমনকি আয়েনাকেও নয়।

আয়েনা কিন্তু গোপনে খোঁজখবর করে প্রিয়সখীর মনের খবর জানতে পেরেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল রাজকুমারীর অসুখ সারাতে যা করার তাকেই করতে হবে। না হলে সুস্থ হবার বদলে রাজকুমারী পাগল হয়ে যাবে। তাই আর সকলের ব্যস্ততার ফাঁক গলে আয়েনা যোগাযোগ করে ইয়ানের সাথে। সে ইয়ানকে অনুরোধ করে সে যেন যে করেই হোক রাজপ্রাসাদে ঢুকে একবার অন্ততঃ রাজকুমারী মারিয়ানার সাথে দেখা করে। আয়েনার কথা শুনে ইয়ান চমকে ওঠে। ব্যাপারটা জানাজানি হলে যে তার কি পরিণতি হতে পারে তা ভেবেই ইয়ান ভয়ে কাঁটা হয়ে যায়। তাই প্রথমে ইয়ান রাজী না হলেও আয়েনা তাকে পাল্টা ভয় দেখিয়ে রাজী করায়। আয়েনা তাকে এই বলেও আশ্বস্ত করে যে একথা আর কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। সে সমস্ত বন্দোবস্ত করে রাখবে।

গভীর রাতের মায়াবী জ্যোৎস্নাকে সাক্ষী রেখে রাজপ্রাসাদের এক কোণে সরোবরের বাঁধানো ঘাটে পাশাপাশি বসে ইয়ান আর মারিয়ানা। ক্লান্ত, অসুস্থ মারিয়ানা যেন গভীর শান্তিতে মাথা রাখে তার প্রেমস্পদের কাঁধে। তার অবসন্নতা ছুঁয়ে যায় ইয়ানকেও। সে মৃদুকণ্ঠে বলে, রাজকুমারী, তোমার তো কিছুরই অভাব নেই। তবে তুমি কেন .....

মারিয়ানা তার ক্লান্ত মোমের মতো তর্জনী আলতো করে ছোঁয়ায় ইয়ানের ঠোঁটে। বলে, ইয়ান তুমিও তো রেসের মাঠে প্রায়ই হাজার হাজার পাউন্ড জেতো। তবুও সবসময় তুমি কেন অমন উদাসীন থাকো। পুরস্কার নেবার সময় খুশীর পরিবর্তে কেন তোমার চোখের কোল চিকচিক করে ওঠে? বলোনা ইয়ান কি তোমার সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা! আমি যে জানতে চাই।

রাজকুমারী, সে কাহিনী শুনে তুমি কি করবে? একজন জকির জীবনের করুণ কাহিনী শুনে তুমি কি করবে? তুমি কি জানো জ্যাক আমার কত প্রিয় ! ওকে আঘাত করলে সেই আঘাত আমার মনের উপর এসে পড়ে। আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে তোলে। রোজ রোজ। জ্যাক্ কেন, আমি কাউকেই আঘাত করতে চাইনা। তবুও তো .....

তবুও কি ইয়ান, চুপ করে থেকোনা। আমি আজ তোমার সব কথা শুনতে চাই। তোমার দুঃখের ভাগ নিয়েই আমি সুস্থ হয়ে উঠতে চাই। বলোনা ইয়ান তোমার কথা।

তবে শোন রাজকুমারী।

রাজকুমারী নয় ইয়ান, বলো মারিয়ানা। তোমার কাঁধে মাথা রেখে আমি তোমাকে আমার ভার বইবার দায়িত্ব দিয়েছি। তাকে তুমি অস্বীকার করো না ইয়ান। তুমি আমাকে একটিবার মারিয়ানা বলে ডাকো।

ইয়ান মারিয়ানার মাথাটা কোলে টেনে নেয়। চাঁদের আলো ধোয়ানো ক্লান্ত চোখ দুটিতে চোখ রেখে গভীরভাবে ডাকে - মারিয়ানা। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে থাকে, জানো মারিয়ানা, একসময় আমি ওই রেসের মাঠকে ভীষণভাবে ঘৃণা করতাম। আমার পাষন্ড, অকর্মণ্য বাপটা সারাজীবন রেসের মাঠে পাগলের মতো দৌড়ে বেড়ালো। জিতলো সামান্য, হারালো সব। জানো তো আমার মা'ও ছিল একজন অসামান্য রূপবতী ও গুণবতী রাজকন্যা। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল আমার বাপের মতো সামান্য এক ছেলেকে। প্রতিদানে সে আমার মা'কে লোকের বাড়ীর ঝি পর্যন্ত বানাতে ছাড়েনি। শুধু তাই নয়, রেসের মাঠে জিতলে মদ- মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি করতো অন্যখানে,আর হারলে সেই জ্বালা এসে উগরে দিতো মায়ের উপর। মা মুখ বুজে সব সহ্য করতো শুধু আমার জন্য। আমি তখন বাপকে ঠেকাতে পারিনি। লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে সেসব দেখেছি আর কেঁপে কেঁপে উঠেছি। মা তার ভালোবাসার প্রায়শ্চিত্ত করতেন মুখ বুজে। তারতো অভিযোগ জানানোর মতো কেউ ছিল না। আমি মায়ের ক্ষতে হাত বোলাতে গেলে তিনি হেসে চোখের জল লুকাতেন। আর বলতেন - বাবা কথা দে, তুই রেসের মাঠে কোনদিনও যাবিনা।

- তুমি তাকে কথা দিয়েছিলে ইয়ান?

- দিয়েছিলাম। কিন্তু রাখতে পারিনি। কারণ একদিন বাবা আমাকে মায়ের থেকে দূরে সরিয়ে দিল। জোর করে ধরে নিয়ে গেল একজনের কাছে। সেখানে আমাকে রেখে দিয়ে এলো। পরে জানলাম আর্থিক শর্তসাপেক্ষে সেইদিন থেকে সে আমার মালিক হয়েছে। সে একজন রেসের কারিগর। আমাকে জকি তৈরী করবে। আমাকে রেসের মাঠে নামিয়ে যা আয় করবে,তার একটা মোটা ভাগ যাবে আমার বাবার ফূর্তির জন্যে। আমার জন্য জমা হবে সামান্য কিছু। সেই থেকে সেখানে প্রচুর অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে আমি একজন পাক্কা জকি হয়ে উঠতে থাকলাম।

- আচ্ছা ইয়ান, জ্যাক কি তোমার নিজের?

- হ্যাঁ, আমি একজন পাক্কা জকি হয়ে ওঠার পর লোকটা আমাকে নিয়ে যায় অন্য একটা ঘোড়াশালে। এই ঘোড়াগুলো রেসের ঘোড়া। কি তাগরাই তাদের চেহারা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘোড়াগুলো যেমন দামী, তেমনি তাদের খাতির যত্নের বহর। লোকটা একটা সাদা কালো ছোপ ছোপ ঘোড়া দেখিয়ে বলে, আজ থেকে ঐ ঘোড়াটার মালিক তুই। ওকে দেখভাল করার দায়িত্বও তোর। রেসের মাঠে ও - ওই হবে তোর বাজী। লোকটার কথা শেষ হবার আগেই সবগুলো ঘোড়ার ওপর আমার চোখ ঘুরে যায়। প্রায় গোটা কুড়ি ঘোড়া। ওদের সবাইকে দেখার পর আমার কি মনে হল কে জানে, এক কোণের গাঢ় বাদামী রঙের ঘোড়াটাকে দেখিয়ে বললাম আমার এই ঘোড়াটা চাই। আসলে তখন আমি একবগ্গা হতে চেয়েছিলাম। কে যেন আমায় শিখিয়েছিল যে একবগ্গা না হলে জীবনে কোন কঠিন বাজী জেতা যায় না। বোধহয় আমার মা।

- তোমার কথা শুনে লোকটা কি বলল ইয়ান।

- লেঅকটা আনন্দে একরকম লাফিয়ে উঠল। বলল, সাবাস বেটা, তোর জহুরীর চোখ আছে। তুই-ই পারবি রেসের মাঠে সেরা বাজী হতে। ওর নাম আছে জ্যাক। আজ থেকে

জ্যাক তোর হলো।

- তারপর।

- সেই থেকে জ্যাক হল আমার সুখ দুঃখের সাথী। ওকে আমার ভাষা বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হলো। ওর মতো দামাল কি সহজে একটা পুচকে ছেলের বশ মানে। কিন্তু যখন ওকে বোঝাতে পারলাম যে, আমি ওর সুখ দুঃখের সত্যিকারের বন্ধু, তখন থেকে শুরু হল ওর আমার দুরন্ত যুগলবন্দী। বছর ঘুরতে না ঘুরতে আমরা নেমে পড়লাম রেসের মাঠে। আর ক্রমশ হয়ে উঠতে শুরু করলাম অপ্রতিরোধ্য। তবুও রেসের মাঠে ওকে বোঝানোর মতো যে ওই একটাই ভাষা থাকে। মানে যেখানে যে ভাষা কাজে দেয় আরকি। ওকে চাবুকের ক্ষত থেকে বাঁচাতে গিয়ে রেস জিততে না পারলে যে আরও একজোড়া হিংস্র চোখের মালিক ওকে আরও বেশী ক্ষতবিক্ষত করে তুলবে, সে জ্যাক যতই আমার হোক না কেন। জ্যাকও সেটা বোঝে। সেইজন্য মার খেয়েও আমার ওপর কখনও রাগ অভিমান করে না। আমার সাথে গদ্দারি করে না। তাইতো রেস জিতেও এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমার চোখের কোল ভিজে ওঠে। পরে সুযোগ মতো ওর ক্ষতে হাত বুলিয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নিই। ওষুধ লাগিয়ে দিই। গভীর সোহাগে ওর গলা জড়িয়ে ধরি। এভাবেই আমাদের দিন কাটতে থাকে।

- আর তোমার মা !

- এইভাবে চলতে চলতে একদিন আমি অনেক বেশী স্বাধীন হয়ে উঠলাম। আমার মালিক আমার হাতের পুতুল হয়ে উঠল। তখন আমি মায়ের খোঁজ করলাম। জানতে পারলাম সে এখন একাই থাকে। বাবা নাকি কোন এক বাইজিকে নিয়ে অন্য কোথাও সংসার পেতেছে। রাজকুমারী তার কপালে সয়নি। সে মদ আর রাস্তার এক সস্তা মেয়েছেলের মধ্যে সুখ খুঁজে পেয়েছে। আর রাজকুমারী পরের বাড়ীতে কাজ করে রোগা ক্রান্ত শরীরটাকে কোনো মতে টিকিয়ে রেখেছে। আমি তার পরের বাড়ী কাজ করা বন্ধ করে, তার জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করি। তার দেখভালের বন্দোবস্ত করে দিই।

কথা বলতে বলতে সম্বিত ফিরে পায় ইয়ান। বলে, অনেকবেশী কথা বলে ফেললাম রাজকুমারী। হয়তো এর কোন দরকার ছিল না।

মারিয়ানা বলে, দরকার ছিল ইয়ান। তুমি নিজের বুকে হাত দিয়ে দ্যাখো, অনেকদিন ধরে, সেখানে চেপে বসা পাথরটা এখন কতো হাল্কা হয়ে গেছে।

সময়ের সাথে সাথে আকাশের রঙটাও কখন হাল্কা হতে শুরু করে। সেদিকে তাকিয়ে ইয়ান বলে, এবার আমাকে আসতে হবে যে রাজকুমারী।

- মারিয়ানা বলে , যদি কখনও সুযোগ পাই ইয়ান, তবে তোমার জন্য কিছু করার চেষ্টা করব।

ইয়ান বলে, না। আমি পুরুষ মানুষ। নিজের লড়াইটা নিজেই লড়ে নিতে পারব। তবু বলে যাই, এক ঠগের রক্ত বইছে আমার রক্তে। আর হতে দিতে পারিনা। আজকের এই রাতটা আমার জীবনে সবথেকে দামী হয়ে থাকবে। আজ তবে আসি মারিয়ানা।

ইয়ান না চাইলেও বিদায়ের মুহূর্তে সে মারিয়ানার দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরা দিতে বাধ্য হয়। আবেগের টানে ভেসে যেতে যেতে মারিয়ানার ওষ্ঠে এঁকে দেয় এক প্রগাঢ় চুম্বন। তৃপ্ত মারিয়ানা বলে, ইয়ান তোমাকে আর এখানে আসতে হবে না। আয়েনা তোমার সাথে যোগাযোগ

রাখবে। কোন দরকার হলে আমাকে জানিও।

বেশ কিছুদিন যাবার পর আয়েনা একদিন হঠাৎ করে যেন হারিয়ে গেল। আরও কিছুদিন পর একদিন মারিয়ানার রেসের মাঠে যাবার নিষেধাজ্ঞা জারি হল। ইয়ানের সাথে মারিয়ানার যোগাযোগের সমস্ত রাস্তাই ছিন্ন হয়ে গেল। আরো কিছুদিন ধরে নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে মারিয়ানা যেন খুব দ্রুত অনেকবেশী পরিণত হয়ে উঠল। এক তীব্র অন্তর্দাহকে সামলে নিয়ে তার মনের কোণে জমা হওয়া কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় সে খাঁচা ভাঙার জন্য ছটফট করতে লাগল।

একদিন মারিয়ানা খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে গেল। তক্কে তক্কে থেকে প্রহরীদের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে নিকষ কালো রাতের শেষ প্রহরে সে দাসীর ছদ্মবেশে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। কোনো এক দুর্বোধ্য ভালোবাসার টানে আরও এক রাজকুমারীর মত মারিয়ানাও নেমে এল রাস্তায়। সে খোঁজ করতে করতে প্রথমে এল আয়েনার বাড়ী। সেখানে এসে শুনলো কিছুদিন হল সে নাকি একটা ছেলের সাথে কোথায় চলে গেছে। ওরা ছেলেটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারল না।

মারিয়ানা প্রথমে হতাশ হল। ভাবলো, আয়েনা যদি কাউকে ভালোবেসে থাকে, তবে তো তাকে জানাতে পারতো। তার সই বলে কথা। কিন্তু আয়েনার কাছ থেকে তো ইয়ানের বাড়ীর কোন ঠিকানা নিয়ে রাখা হয়নি। তবে একটা নাম শুনেছিল আয়েনার মুখে - বিলডোলা। মারিয়ানা ভাবল সে নিজেই কেননা ইয়ানকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করে। ওর নামটা তো বহু লোকেই জানে। তাহলে কারও না কারও কাছ থেকে তো .....

তবে আর পাঁচটা লোকের কাছে খোঁজ খবর করার আগে মারিয়ানা অনেকবেশী সতর্ক হয়ে যায়। যদি কেউ তাকে কোনরকম সন্দেহও করে, তাহলে আর কোনদিনও সে ইয়ানের মুখোমুখি হবার সুযোগ পাবে না। সামান্যতম জানাজানি হলেও ইয়ানকে চিরতরে মুছে যেতে হবে এই পৃথিবী থেকে। অনেক সতর্কভাবে সে খুঁজে বার করে একটা বৃদ্ধ লোককে। তার দৃষ্টিশক্তি কিছুটা কম হলেও স্মরণশক্তি বেশ প্রখর। সে বলে দেয় বিলডোলা গ্রামের ঠিকানা। রাজ্যের শেষ প্রান্তে একটা জঙ্গল পথের শেষে নির্জন একটা গ্রামে সে খুঁজে পায় একটা পোড়ো বাড়ী। দিনের আলোতেও যেন গা ছমছম করে। মারিয়ানা তার আস্তিনের নীচে লুকানো ছোরাটা আরও ভাল করে চেপে ধরে।

বাড়ীটার ভেতরে ঢুকে সে দেখে এক বৃদ্ধা জীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ততোধিক এক জীর্ণ শয্যায়। কিন্তু ইয়ান কোথায়? মারিয়ানা ডাকে ইয়ান, ইয়ান। সেই ডাক এই নির্জন প্রান্তরে যেন হাজার কণ্ঠের ডাক হয়ে ফিরে আসে তার কাছেই। কিন্তু ইয়ান আসেনা। পরিবর্তে রক্তমাংসের যে মূর্তিটি তার সামনে এসে হাজির হয় সে বছর দশ-বারোর একটি মেয়ে। জীর্ণতা তাকেও অনেকটা গ্রাস করেছে। মারিয়ানা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। মেয়েটি সেখানে উপস্থিত হতেই বৃদ্ধা অস্ফুট আওয়াজে তাকে ডেকে নেয়। মেয়েটি ফিরে এসে জানিয়ে দেয়, এখানে ইয়ান বলে কেউ থাকে না।

এখানে ইয়ান বলে কেউ থাকে না। তবে এর এখানে এভাবে কিন্তু কি করছে? এভাবে কি কোনো মানুষ থাকতে পারে ? তাও আবার ওই অসহায় বৃদ্ধা আর ঔ একরত্তি মেয়ে। মারিয়ানার মাথার ভিতর সব তালগোল পাকিয়ে যায়। কখন যে আনমনে সে ফেরার

পথ ধরে আর কখন যে সে সেই জঙ্গলের পথে পথ হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ একটা সুন্দর সরোবর সামনে চলে আসায় সে থমকে দাঁড়ায়। সরোবরের পাশে এক প্রাসাদোপ্রম বাড়ী। আরও একবার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় মারিয়ানা। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য মাত্র। এমন সময় তার কানে আসে নারী পুরুষের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর। সন্তর্পণে সে এগিয়ে গিয়ে দেখে সরোবরের বাঁধানো ঘাটে দুটি নারী পুরুষ জলকেলিতে ব্যস্ত। অতি উৎসাহী হয়ে আরও কাছাকাছি যেতে চমকে ওঠে মারিয়ানা। ওরা যে দাম্পত্য ক্রীড়ায় মগ্ন। ওইতো ওইতো ছেলেটা সম্পূর্ণ নগ্ন। কে-কে ও। ইয়ান ! ইয়ানই তো। আর মেয়েটা ? এ কি! এ তো আয়েনা। ইয়ান, তোমার মা ওদিকে এক চরম দুরবস্থার মুখোমুখি লড়াই করছে আর তাকে সেখানে ফেলে রেখে সবার চোখের আড়ালে তুমি বিত্ত - বৈভবের উচ্ছ্বাসে এমন বেলেল-াপনায় ভেসে চলেছ। হ্যাঁ ভেসে চলেছ তোমার বাপের মতই। এক রাজকুমারীর ভালোবাসা ছেড়ে বেছে নেওয়া এক বাইজির পদবাচ্যের সাথে। সত্যি বলেছিলে ইয়ান। তোমার হয়ে ওই ঠগের রক্তই শেষ পর্যন্ত কথা বলল। আর আয়েনা বিশ্বাসঘাতিনি। ভেবেছিলি যে এই জঙ্গলের মধ্যে তোর বিলাসিতার বেলেল-াপনার খবর রাজকুমারীর কান পর্যন্ত কোনদিনও পৌঁছাবে না। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সেটা তোদের আরও ভালো করে বুঝিয়ে দেবে এই রাজকুমারী।

বুঝিবা এই প্রথম আর এই শেষ। আর কোন দিনই দেখা হবে না তার একনিষ্ঠ ভালোবাসার উন্মুক্ত দেহসৌঠবকে। তাই কখন যে নির্লজ্জের মত ডুবে যায় এক অনাস্বাদিত আবেশে। বিশ্বাসঘাতিনী আয়েনার রতিলীলার মাঝে সে যেন আবিষ্কার করে নিজেকে। সহসা প্রচন্ড শারীরিক কাঁপুনিতে সে নিজের মানসিক স্খলনকে টের পায়। তীব্র ঘৃণায় তার সারা গা রি রি করে ওঠে। এক তীব্র আক্রোশ বুকে চেপে সে সেখান থেকে দ্রুত সরে আসে। হারিয়ে ফেলা পথের মাঝে সে হঠাৎ মুখোমুখি হয় সেই কিশোরী মেয়েটির। সে জানায় হঠাৎ উত্তেজনায় বৃদ্ধার শরীরটা কেঁপে উঠে থেমে গেছে। সে আর সাড়া দিচ্ছে না। কি করবে বুঝতে না পেরে সে ইয়ান দাদাবাবুকে খবর দিতে যাচ্ছিল।

মারিয়ানা জিজ্ঞাসা করে, তুমি চেন তোমার ঐ দাদাবাবুর বাড়ী।

মেয়েটি বলে হ্যাঁ। মারিয়ানা এবার কথা ঘুরিয়ে বলে, তোমার নাম কি? তোমার বাড়ী কোথায়? সেখানে কে কে আছে?

মেয়েটি বলে, আমার নাম এওেনা। আমার কেউ নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। ইয়ান দাদাবাবুই আমাকে এখানে নিয়ে আসে।

মারিয়ানা বলে, এওেনা, এই দুনিয়ায় তুমি একা। তাই তোমাকে অনেকবেশী সাহসী হতে হবে। তুমি ভয় পেও না এওেনা। মনে সাহস রাখ শুধু। আর একটা কথা বলি এওেনা, আমি একটা কথা বলব, শুধু শুনবে, কাউকে মুখ ফুটেও কখনও একথা বলবে না। বলবে না আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া তোমার জীবনের কোনো কথা। কাল থেকে শুরু হবে তোমার নতুন জীবন। শোনো আমি এ রাজ্যের রাজকুমারী মারিয়ানা। তুমি যাও, ঐ বৃদ্ধার মৃতদেহের পাশে বসে অপেক্ষা কর। ভয় পেও না। এই নাও আমার ছুরি। বিপদ আপদ এলে সাহসের সাথে মোকাবিলা করবে। অন্ধকার নেমে এলেও ঘাবড়াবে না। এতগুলো রাত যেভাবে কাটিয়ে এসেছ, আরও একটা রাত সেভাবেই কাটাবে। মনে করবে কোনো কিছুই আজ রাতটার জন্য বদলায়নি। যা বদলাবে তা কাল সকাল থেকে। বুঝেছ এওেনা। এওেনা

পরম তৃপ্তির সাথে সামনে দাঁড়ানো রাজকুমারীকে প্রণাম করে বলে, এমনতর সৌভাগ্যের জন্য শুধু একটা রাত কেন রাজকুমারী, আরও অনেকগুলো রাত অনায়াসে অপেক্ষা করতে পারি। তাছাড়া আপনার দেওয়া এই ছোরাটাতো আমার কাছে রইল। এটা যে আমার কাছে কত বড় শক্তি, তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

মারিয়ানা বলে, হয়েছে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারব লোক পাঠাব। আমি আসছি। তার ঐ বৃদ্ধার সৎকারের ব্যবস্থা করবে। আর তোমাকে পৌঁছে দেবে আমার কাছে।

এওেনা বলে রাজকুমারীর আদেশ শিরোধার্য। দেখবেন, আমি ঠিক আপনার আদেশ পালন করব।

দেখতে দেখতে মানখানেক কেটে গেল। ইয়ানের মায়ের সৎকারের পর এওেনাকে নিজের কাছে এনে রাখে মারিয়ানা। সে তার পিতাকে সবকিছু খুলে বলে। রেসের মাঠ যে মানুষের জীবনে কি ভয়ংকর পরিণতি আনতে পারে তা সে তার এই ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় ভীষণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, সেকথা ভেবে বার বার চমকে ওঠে। শিউড়ে ওঠে এর বাপ্তির পরিণামের কথা চিন্তা করে। তাদের রাজ্যের বহু মানুষের পরিবার কি প্রতিনিয়ত এভাবেই ভেসে যাচ্ছে? তাই যদি হয়, তবে সে তাদের রাজত্ব থেকে চিরকালের জন্য এই রেসের মতো মানুষের চরম অনিষ্টকারী এক খেলাকে বন্ধ করে দিতে চায়।

মহারাজ এরিক ডিনারবার্ড মেয়ের এইটুকু বয়সের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও পরিণতি বোধ দেখে যেমন অবাক হয়, তেমনি নিশ্চিন্তও হয়। সে বলে মা, তুমি যদি চাও তবে তাই হবে। মারিয়ানা বলে হ্যাঁ বাবা আমি তাই চাই। তবে তার আগে একবার আমি শেষবারের মত রেসের মাঠে যেতে চাই। তুমি ঘোষণা করে দাও যে এবারের রেসটাই এই রাজ্যের শেষ রেস হবে। এই রেস হবে অভিনব। এদিন রেসের মাঠে কোনো টিকিট লাগবে না। কোনো বাজী জেতার সুযোগও থাকবে না। কিন্তু মাঠে থাকবেন রাজা, রাজকুমারীসহ রাজ পরিবারের সকল সদস্য। তারাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করছে ঐদিন মাঠে উপস্থিত থাকার জন্য।

নির্দিষ্ট দিনে মাঠে কাতারে কাতারে হাজির হয় জনগণ। এক অন্যরকম রেস দেখতে। কেমন সেই রেস। উত্তেজনায় যেন সারা মাঠ কাঁপছে। চিরদিনের জন্য রেস বন্ধ হওয়ার কথা শুনে ভগ্নহৃদয়েও গুটি গুটি পায়ে হাজির হয়েছে হতভাগ্য জুয়াড়ীর দল। আজ যে কারুরই টিকিট লাগবে না। কিন্তু অন্যরকম রেস। কেমন সেই অন্যরকম রেস। কে অজানা আশঙ্কায় যেন কেঁপে ওঠে বাঘা বাঘা জুয়াড়ীদের বুকের নীচটা। মাঠে ঢুকতে গিয়ে যেন পায়ে পা জড়িয়ে যেতে চায়। তবুও তারা আসে। তাদের টেনে নিয়ে আসে যেন এক অমোঘ নিয়তি। টেনে নিয়ে আসে যেন অজানা অচেনা এক বধ্যভূমিতে।

বন্ধুগণ! রাজকুমারীর গলা মাইকে ভেসে উঠতেই মুহূর্তে মাঠ নিস্তব্ধ হয়ে যায়। রাজকুমারী বলে চলে, আমার বাবার সম্মানীয় প্রজাগণ, আমার প্রিয় ছোটটো বড় বন্ধুরা, আমি আপনাদের সকলের একরত্তি রাজকুমারী বলছি, আপনাদের মতো আমিও একদিন এসে উপস্থিত হয়েছিলাম এই রেসের মাঠে। প্রথমে এর রোশনাই-এ মুগ্ধ হয়েছিলাম, এর জৌলুস দেখে নেচে উঠেছিলাম আনন্দে। কিন্তু রেস না খেললেও এই রোশনাই, এই জৌলুসের পিছনে যে কী ভয়ংকর সত্য লুকিয়ে আছে তা উপলব্ধি করার সুযোগ আমার হয়। আমার জীবনে দ্রুত এমন কতগুলো ঘটনা ঘটে যায়, যা আমাকে চমকে দেয়। রেসের মাঠকে ঘিরে কত অসহায়তা, নির্লজ্জতা, নির্মমতা, অমানবিকতা, পৌশাচিকতা,

বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী লুকিয়ে আছে তা এখানে না আসলে আমার জানা হতো না। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে এই মাঠের মাটি ভিজে রয়েছে আমার বহু বন্ধুর চোখের জলে। এই মাঠ আপনাদের অনেকের সুখের সংসার ভেঙেছে, অনেককে পথের ভিখারী করেছে, অনেক বিশ্বাসঘাতকের জন্ম দিয়েছে, স্নেহ-ভালোবাসা-দায়িত্ব-কর্তব্যবোধকে ছিঁড়ে ফালাফালা করেছে। এই মাঠ আসলে কোনো বিনোদনের জায়গা নয়, বরং সর্বনাশের আতুড়ঘর। এসব জানার পর আমি চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। তাই আজ শেষবারের জন্য একটু অন্যরকম রেসের আয়োজন করেছি, যাতে আর কেউ কোনদিনও এই রেসের মাঠে, জুয়ার আসরে আসার সাহস না পান। হ্যাঁ, আর কোনদিনও আপনাদের এই রেসের মাঠে আসতে হবে না। আমি কথা দিচ্ছি এই রেসের মাঠ যাদের জীবনে ঝড় তুলে সংসার তছনছ করে দিয়েছে, আমরা তাদের পাশে থাকবো। আপনাদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেবার সবরকম চেষ্টা করব। কাল থেকে এই রেসের ময়দান আপনাদের সেবা করার জন্য নতুনভাবে সেজে উঠবে। এখানে আপনারা বিনা পয়সায় সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা পাবেন। আর হ্যাঁ, যারা আমাদের কথা শোনা বা বোঝার চেষ্টা করবেন না, তাদের সম্ভাব্য পরিণতির একটা নমুনা আজ আপনারা দেখে যাবেন। প্রহরী, আসামীদের মাঠে হাজির করা হোক।

বন্ধুরা, মাঠে যাদের দেখতে পাচ্ছেন, তাদের মধ্যে একদম বাঁদিকে বাদামী ঘোড়ার উপর রয়েছে আপনাদের প্রিয় জ্যাকের মালিক ইয়ান আর তার পাশে সাদা ঘোড়ার উপর বয়স্ক ভদ্রলোক হলেন আপনাদের ঔ ইয়ানের জন্মদাতা পিতা সার্জান অ্যাশহোল্ড। তার পাশে খয়েরী রঙের ঘোড়ার উপর যে ভদ্রলোক, তার নাম হান্ড্রেড হিলস্। উনিই ইয়ানকে এই রেসের মাঠের সেরা বাজী তৈরী করেন। আর ইয়ানের বাঁ দিকে সাদা খয়েরী ছোপ ছোপ ঘোড়ার উপর যে মেয়েটিকে দেখছেন সে হচ্ছে ইয়ানের প্রেমিকা আয়েনা। ইয়ানের বাবা একজন রেস খেলোয়াড়। তাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল এক রাজকুমারী। প্রতিদানে ঐ লোকটা, মিস্টার সার্জান অ্যাশহোল্ড সেই রাজকুমারীকে টেনে রাস্তায় নামায়। লোকের ঝি গিরি করতে বাধ্য করে। তার ছেলে ইয়ানকে নিয়ে যায় ঐ হান্ড্রেড হিলস্ -এর কাছে। মিঃ হিলস্ অমানবিক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে একরত্তি ইয়ানকে রেসের বাজী তৈরী করে তোলে। এটা নাকি তার পেশা। এক জঘন্য পেশা বৈকি। আর ইয়ান আর ঐ আয়েনা - ইয়ানের শরীরে বইছে তার বাপের রক্ত। তাই সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তার মা, হতভাগ্য এক রাজকুমারীকে ফেলে রাখে কে জঘন্য, ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যে, ফেলে রাখে এক ধরে আনা নাবালিকার ভরসায়। আমি দেখেছি সব। দেখলে আপনাদের শরীরেও কাঁটা দেবে। জন্তু জানোয়ার ঘেরা এক জঙ্গলের মধ্যে, ভগ্ন জীর্ণ পরিত্যক্ত এক অট্টালিকার কোণে কিভাবে যে দিন কেটেছে ঐ বৃদ্ধা রাজকুমারী আর সেই নাবালিকার। আর অদূরেই সবার চোখের আড়ালে গড়ে তোলা এক বিলাসবহুল প্রাসাদোপম অট্টালিকায় ইয়ান মেতে উঠেছে এক নারী সঙ্গের উল-াসে। সেই নারীটি কে জানেন ! আমাদেরই রাজপ্রাসাদের এক সময়ের বিশ্বস্ত দাসী ঐ আয়েনা। সে আমাদের কিছু জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা সংক্ষেপে শুনলেন আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা। বাকীটা আপনারা বুঝে নেবেন। আমি শুধু বলতে চাই যে আমি সেই হতভাগ্য রাজকুমারী, মানে ইয়ানের মা'কে বাঁচাতে পারিনি। এক রাজকুমারীর এই পরিণতির জন্য যারা দায়ী, আমি রাজকুমারী হয়ে তাদেরতো

ছেড়ে দিতে পারিনা। তবুও ছেড়ে দেব বৈকী ! ছেড়ে দেব তাদের নিয়তি, ঐ রেসের ময়দানে।

রাজকুমারীর ইশারায় চারটি ঘোড়াকে পৌঁছে দেওয়া হল রেসের স্টার্টিং পয়েন্টে। চার সওয়ারীর হাত পিছে মোড়া করে বাঁধা। পাগুলো বাঁধা ঘোড়াদের পেটের নীচে। চার সওয়ারীরই চোখে মুখে আতঙ্ক। নির্বিকার রাজকুমারীর ইশারায় সপাটে চাবুকের আঘাত আছড়ে পড়ল ঘোড়াগুলোর পেছনে। এমন বেমক্কা অভিজ্ঞতার সামনে পড়ে ঘাবড়ে যাওয়া বেলাগাম ঘোড়াগুলো উন্মাত্তের মতো শুরু করল দৌড়। জোরে, আরও জোরে। যেন এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা। একটি হাততালির আওয়াজও শোনা গেল না। সারা মাঠ বিস্ফোরিত চোখে দেখতে লাগল এই প্রতিযোগিতা, যেখানে সওয়ারীর নির্দেশে নয়, বরং সওয়ারীকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্য যেন এই মরণপণ দৌড়। দেখতে দেখতে উন্মুক্ত হয়ে গেল রেসের মাঠের প্রবেশপথও। আর সেই পথ দিয়ে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল বেলাগাম ঘোড়াগুলো। আর রেসের মাঠে স্তব্ধ জনগণের সামনে যেন পাক খেয়ে ফিরতে থাকলো চারটি উন্মত্ত খুরের আর্তনাদ।

আজ জীবনের গোধূলি লগ্নে পৌঁছেও মারিয়ানা ভুলতে পারেনা বহুদিন আগে ফেলে আসা দিনগুলোকে। রেসের মাঠের গগনভেদী উচ্ছ্বাস, মৃত্যু পথযাত্রী এক বৃদ্ধা রাজকুমারীর জল জল বলে অনুচ্চ হাহাকার, এক বিশ্বাসঘাতিনীর নির্লজ্জ রতিক্রীড়ার বেলেল-াপনা। এওেনা আজও তার কাছে রয়ে গেছে। আর রয়ে গেছে তার জীবনের পাতা জুড়ে এক ঘৃণ্য শিল্পীর এঁকে যাওয়া কুহেলিকা ভরা এক রাতের ছবি। মারিয়ানা যেমন তাকে কিছুতেই ভুলতে পারেনি,তেমনি হাজার চেষ্টাতেও মুছে ফেলতে পারেনি জীবনের পাতায় লেপ্টে থাকা জলছবিটা। একরাশ ঘৃণা দিয়ে সে সেটাকে বারবার মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোন এক গভীর রাতে মায়াবী আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উপলব্ধি করেছে যে কখন যেন আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই মুছে ফেলা ছবিটা। তাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি। মারিয়ানা ভেবে পায় না কেন সে ভারী হয়ে ওঠা চোখের পাতায় ভর করে বারবার এসে দাঁড়ায় এই খোলা আকাশের নীচে। মনের কোণে লুকিয়ে থাকা এক কিশোরীর স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে ঝুলতে থাকে এক গভীর শূণ্যতায়।

জীবনের এই প্রান্তে আজ আর সেই রাজাও নেই, রাজত্বও নেই। সবকিছুই যেন আজ গোধূলির রক্তিমাতে হারিয়ে যেতে চাওয়া বলাকা বিলাস। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠে এক বৃদ্ধার। আবার কখন যেন কে এসে রাত্রির সবটুকু কালো মুছে দিয়ে মেতে ওঠে প্রভাতী আলোর আয়োজনে। আর ঠিক তখনই চমকে ওঠে বৃদ্ধা। টগবগ - টগবগ স্পষ্ট ভেসে আসে তিনটে - না চারটে খুরের আওয়াজ। আর তারও পিছন পিছন ছুটে আসে এক রহস্যময় অতীত। চমকে ওঠে বৃদ্ধা। ঘামতে থাকে দরদর করে। দুই কানে হাতচাপা দিয়ে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে ওঠে - না।

রাজকুমারী চলুন - এওেনা বৃদ্ধাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে বাস্তবের মাটিতে। মারিয়ানা স্নান করে, পূজাপাঠ সেরে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় লেপ্টে থাকা একটা বিষাক্ত অতীতকে। কিন্তু চাইলেই কি মানুষ সব পারে! মারিয়ানাও পারেনি। হয়তো বা কোন এক চিতার আগুনই মুছে দিতে পারে সব গ-ানি। মারিয়ানা বোধহয় আজও তারই প্রতীক্ষায়।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রাশিল্প আজ অবলুপ্তির পথে

কুমুদরঞ্জন দাস

যাত্রাগান নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহ্যবাহী সমুন্নত শিল্পের এক আদর্শ নিদর্শন। বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক যাত্রাপালা সমস্ত গ্রাম বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। প্রসঙ্গত যুগাবতার শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব আধুনিক থিয়েটারের নানাবিধ উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে যে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন সেটি আমরা "নটী বিনোদিনী" যাত্রাপালায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করে থাকি। সুতরাং তৎকালীন যাত্রাপালা ও লোকশিক্ষার এক বলীষ্ঠতম শিল্প প্রয়াস সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ পরিতাপের বিষয় - এত বলীষ্ঠ লোকশিক্ষার একটি শিল্প মাধ্যমকে আজ আমরা প্রায় হারাতে বসেছি। সুতরাং এর বর্তমান করুণতম অবস্থানটি নিয়ে কিছু ইতিবাচক আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি।

বিশেষত যে সমস্ত মানুষ গ্রাম বাংলার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করেন, তারা বিভিন্ন ধরণের যাত্রাপালা দেখতে পছন্দ করেন। বলাবাহুল্য তারা ছেলেবেলা থেকেই এইসব যাত্রাপালা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যাত্রাপালা দেখার অপরিসীম কৌতুহল থাকা সত্ত্বেও তাদের এ চাহিদা পূরণের সম্ভাবনা আদৌ উজ্জ্বলময়। কারণ, যাত্রাশিল্প আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে বিলীন হতে চলেছে। প্রসঙ্গত উলে-খ করা যায়, নদীয়ার কৃষ্ণনগরের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কবিগান, ভাসান, ফকিরি গান, দেহতাত্ত্বিক বাউল গান প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকের গানের প্রচলন ছিল দীর্ঘদিন ধরে। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ এগুলির মধ্যেই খুঁজে পেতেন তাদের আত্মতুষ্টি ও চিত্ত বিনোদনের বিভিন্ন উপকরণ।

ভাসান গান বলতে মূলতঃ আমরা মনসা মঙ্গলের কাহিনীকে আশ্রয় করে এক ধরণের গীতিপ্রধান গ্রামীন শিল্পের মাধ্যমকেই বুঝি। বিশেষত বিষহরি দেবী মা মনসার স্তুতি ও বন্দনা করাই হলো এ গানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মনসামঙ্গল পালায় বিশেষত বেহুলা-লখীন্দর, চাঁদ সওদাগর এ ধরণের কয়েকটি প্রধান চরিত্রে বিভিন্ন পোষাকের রূপসজ্জায় হাজির করানো হতো। যাত্রাদল কিংবা সম্প্রদায়ের অন্য কয়েকজন কুশীলব কাহিনীর প্রয়োজন মোতাবেক মঞ্চে উঠে সংলাপ সংযোজন করতেন। প্রয়োজন বোধে একই ব্যক্তি একাধিক চরিত্রেও অভিনয় করতেন। এ সমস্ত যাত্রাপালা যেহেতু ছিল গীতপ্রধান, সেই কারণে নির্বাচিত গানগুলিকে সংযোজিত করে মূল কাহিনীর গতি সঞ্চার করানোর উদ্দেশ্যেই মূলত এগুলি ব্যবহার করা হত। তবে এগুলি কবিগানের ন্যায় তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হওয়ায় সংলাপগুলি খুব একটা উচ্চস্তরে পৌঁছাতো না।

বিশেষ করে ঝাঁপান গান ও মনসা মঙ্গলকে আশ্রয় করে উপস্থাপনা এক ধরণের

গীতপ্রধান গ্রাম্য শিল্পেরই উপকরণ। প্রধানত বিষহরি মা মনসাকে প্রশস্তি ও বন্দন করাই এ গানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই যাত্রাগান। কিন্তু আজ সে ঐতিহ্য ক্রমান্বয়ে অবলুপ্তির পথে। চলচ্চিত্র জগতের চিত্র তারকা (Film-Star) দের জনপ্রিয়তাও নেহাৎ কিছু কম নয়। কেননা আধুনিক যাত্রাপালার আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য এই সব চিত্রশিল্পীদের উপস্থিতি সবিশেষ উলে-খযোগ্য। কারণ, যাত্রামোদী দর্শকগণের নিকট চিত্রশিল্পীদেরও একটা বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে দর্শক কিংবা লোক সমাগমও হয় প্রচুর। অনেকের কাছে চিত্রতারকারা প্রায় দেবতুল্য। এমনকি বহু দর্শকের বাড়িতে তাঁদের সুদর্শন ও সুদৃশ্য ছবিও শোভা বর্ধন করতে দেখা যায়।

তৎকালীন যাত্রাপালাতে প্রধান চরিত্রগুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই নামকরণ স্থির করা হতো। যেমন - বেহুলা-লখীন্দর, চাঁদ সওদাগর, মনসা-বিশ্বকর্মা ইত্যাদি। তরজা ও কবিগানের কথা বলতে গেলে উভয়বিধ গানই সমজাতীয় কিংবা একই প্রকৃতির গান। এতদ্‌সত্ত্বেও এই দুই ধরণের গানের মধ্যেও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত তরজা অপেক্ষা কবি আরও দ্রুত লয়ের গান। কেননা, কবিগানের অন্তমিলনাত্মক তাৎক্ষণিক সংলাপের প্রয়োগ ক্ষমতা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় বহন করে। তবে এ সমস্ত পালাগুলির অধিকাংশই পৌরাণিক। যেমন - রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও লোকসংস্কৃতি ও লোককাহিনী ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় বিষয়গুলিকে আশ্রয় করেই পরিবেশন করা হতো। আবার ফিকিরী গান, দেহতাত্ত্বিক গান এবং সর্বোপরি বাউল গান পরিবেশন করতেন। গ্রাম বাংলার তৎকালীন স্বল্প শিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষের আন্তরিক প্রচিষ্টায় এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে উপরোক্ত পালাগুলি সার্থক রূপে পরিবেশন করা হতো।

অন্যদিকে এরই পাশাপাশি প্রচলিত ছিল বড়ো মাপের যাত্রাপালা, যা মূলত পঞ্চমাংক বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ যাত্রাপালা হিসাবে চিহ্নিত। তবে সেকালের জাতীয় পালাকারদের মধ্যে বিশেষ করে গৌর ভড়, ব্রজেন্দ্রকুমার দে, প্রমাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ স্বনামধন্য যাত্রাপালা রচয়িতাদের নাম সর্বাধিক উলে-খযোগ্য। প্রধানত পালাগুলি ছিল পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমত এইসব যাত্রাপালায় স্ত্রী চরিত্রে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ছেলেরাই অংশগ্রহণ করতো। যাত্রা চলাকালীন নৃত্য পরিবেশন পর্বটি ছিল যাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এছাড়া যাত্রাপালার শুরুতেই নৃত্য পরিবেশন ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। এক একটি অংক শেষ হতেই নৃত্যসখীদের নাচগান যথানিয়মে চলতো। এছাড়া বিবেক ও একাঙ্গী চরিত্রের মুখেও সংগীত পরিবেশন শোনা যেতো। বিগত শতাব্দীর সাত দশকের পূর্বকাল পর্যন্ত এ জাতীয় যাত্রাপালা কোনক্রমে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে বেঁচেছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে সাত দশকের গোড়ার দিকে আঙ্গিকের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক রূপে যাত্রা উপস্থাপিত হলো দর্শকের দরবারে। বিশেষত দু' তিনটি অনুসঙ্গের পরিবর্তন যাত্রাকে দ্রুত গতিতে সাফল্যের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

প্রথমত, যাত্রা জগতে আধুনিক মাইকের ব্যবহার শিল্পীকে কণ্ঠস্বর ক্ষেপনের বিশেষ সুবিধা এনে দিল, যা অনায়াসে দর্শকের নিকট সংলাপের আবেদন পৌঁছে দিতে সক্ষম হল। দ্বিতীয়ত, অত্যাধুনিক জেনারেটর এর সাহায্যে রকমারি আলোক সৃষ্টির ফলে

মঞ্চ আলোক বৈচিত্রের কারিগরী। তৃতীয়ত, প্রয়োজনবোধে মঞ্চের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পুনর্বিন্যাস করে নেওয়া হতো। চতুর্থত, রেকর্ডিং এর বিশেষ সুবিধা সৃষ্টির ফলে মঞ্চস্থানে বিভিন্ন ধরণের শব্দ প্রয়োগের ব্যবস্থা করাও সহজসাধ্য হলো। এই বহুমাত্রিক রুপান্তর যাত্রাপালাকে গ্রাম বাংলার অগণিত মানুষের নিকট একটি আকর্ষনীয় শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে এক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। এর ফলে তরুণ যাত্রাপালাকারগণের বিভিন্ন পালা রচনায় আগ্রহ প্রকাশ ও পালাগুলির বিকাশ সাধন সুদীর্ঘ তিন দশক ধরে সগৌরবে গ্রামে গঞ্জে প্রবল প্রতাপে তার শুভাগমন ঘোষণা করতে লাগলো। পরবর্তীকালে অবশ্য চলমান যাত্রাপালার চরিত্রগুলিকে সুনির্দিষ্ট করে অভিনেতা অভিনেত্রীর সংলাপ নির্ধারণের মাধ্যমেই যাত্রাশিল্পের আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছিল।

এক বিশেষ উচ্চ পর্যায়ের বৈষ্ণব কবিগণ রচিত দার্শনিক ভাবযুক্ত পদসমূহকে সংবদ্ধ রূপে বিশেষত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক গীত কীর্তনকে লীলা কীর্তন কিংবা পালাকীর্তন হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। বিশেষত একজন কীর্তনীয়া ও তাঁর দোঁহারগণ কিংবা সম্প্রদায় সহযোগে এই পালা কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন। তবে এ ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলা উভয় শ্রেণীর কীর্তনীয়াই তাঁদের নিজস্ব আঙ্গিকে কীর্তন গান পরিবেশন করে থাকেন। এছাড়া এই জাতীয় পালাগুলির পাশাপাশি অন্য এক ধরণের যাত্রার আদলে পালাগান আমরা লক্ষ্য করে থাকি। যেটিকে এককথায় 'কৃষ্ণযাত্রা' বলা হতো। তবে এর সংলাপ অন্ত তঃ কিছুটা হলেও পূর্ব নির্ধারিত এবং চরিত্রগুলিও স্বতন্ত্রে সমুজ্জ্বল থাকতো। আবার এই কৃষ্ণযাত্রার আদলেই পরিকল্পিত হয় বিভিন্ন লোকচরিত্র ও কাহিনী। যার অবলম্বনে ছোট যাত্রাপালা গানেরও প্রচলন ঘটেছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্রের সংলাপের সঙ্গে যথোপযোগী গানেরও সংযোজন থাকত।

কিন্তু সবকিছুই একটা ইতিবাচক পদক্ষেপে চলার পর কোন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হয়। তখন হয়তো এক চরমাবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ফলে দেখা দেয় ক্রমাবনতি। বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমে প্রচারিত বিশেষ মনমোহিনী বিনোদন মাধ্যম ক্রমশঃ যাত্রইশল্পকে তার প্রবল সম্মোহনী শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে তার নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে অপসারিত করে নিজের স্থানটি সুরক্ষিত করার জেহাদ ঘোষণা করলো এই অত্যাধুনিক গণমাধ্যম। অবলীলাক্রমে সকলের মনোসংযোগ ঘটলো বদ্ধঘরের সীমাবদ্ধ দূরদর্শনের ছোট পর্দার উপর। বলাবাহুল্য, এই অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক মাধ্যমের প্রবল সম্মোহনী শক্তির নিকট চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়ে সকলের অলক্ষ্যে ক্রমশঃ অবলুপ্ত হতে লাগলো গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক এই ঐতিহ্যবাহী ও গৌরবময় যাত্রাপালার মহান শিল্প।

জীবন স্রোতস্বিনী

তপন ভৌমিক

খন্ড খন্ড ভূখন্ডে পৃথিবীর নানা দেশ। নানা ধর্ম, জাতি, বর্ণ। পরিবেশগত তারতম্যে পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, নদী। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ আর বাতাস দিয়ে অপরূপা ধরিত্রী। সূর্যের আলো, শুভ্র চন্দ্রিমা, মেঘের ছায়া। ঝড়, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম এরকম কত কিছু বিস্ময়াবিষ্ট সৃষ্টির পৃথিবীতে আমাদের কালান্তর বসবাস। এর মধ্যেই মানুষের বাসভূমি। 'ইতিহাস' প্রাচীনতা থেকে আজকের শতাব্দী। একক দশক শতক ধরে 'মানুষ' তাইতো প্রবহমান জীবিত এবং জীবজগৎও তদ্রুপ চলৎবৎ। জন্ম - মৃত্যু এই কালচক্র যানের অভিযাত্রী। বৃদ্ধি ও ক্ষয় এবং লয়। সকলেরই প্রবেশ আর প্রস্থানের নির্দিষ্ট সময় বর্তিকা।

অতঃপর আমরা কালাতিক্রমণের হাত ধরে সমকালের যাত্রী এবং নিশ্চিত ধাবমান কালচক্রের ঘুর্ণায়ণে আবর্তিত। এর মধ্যেই রাজনীতি, সমাজনীতি, ধনী-দরিদ্র, ক্ষমতা ও বশ্যতা অথবা জয় ও পরাজয়ের চিরকালীন যুদ্ধ এবং সখ্যতা। খাদ্য এবং খাদক -এর প্রকৃতি প্রদত্ত পরিণতি।

সভ্যতার সৃষ্টি ও বিকাশ প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে এই আজকের পৃথিবীতে নানা রূপে নানা ঢঙে চলমান। চিরায়ত প্রাকৃতিক অবস্থান ও রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি দ্বারা সভ্যতার সৃষ্টি ও সঙ্কট সর্বকালেই পাশাপাশি থেকেছে। সেই প্রকৃতি প্রদত্ত খাদ্য ও খাদকের ভূমিকায়। এছাড়া উত্তম বনাম অধম এই দুটি মূল শ্রেণী বিন্যাস, উত্তম শ্রেণীদের বা ক্ষমতা ধারকদের ক্রুঢ়তায় সমাজ জীবনের উন্নয়ণ ও লাঞ্ছনা পরস্পর থেকেছে। আজও চলছে। এর সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে রাজশক্তির বিড়ম্বনা, বর্তমানে যা প্রবলতম সঙ্কট। শুধুমাত্র একক বা সমাজবদ্ধ মানুষেরই নয়, রাজনীতিকদেরও বটে। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার শিথিলতা, সাধারণ মানুষকে উৎসাহী হতে ভীত করে। লোব, প্রতিপত্তি, অহংসমৃদ্ধ অলঙ্কারে যেন আদিম প্রবৃত্তির বাহক এবং শাসক, রাজা, প্রভু, আজকের "রাজনৈতিক রাজা"। আদিম প্রজা যথা "জনসাধারণ" ছুটছে। লোভের বাতাস লেগেছে গায়ে। এরা আমাদের ভাই, বন্ধু, আত্মার আত্মীয়, অতএব সভ্যতা সৃষ্টি ও সঙ্কটের বড় গভীর নিকট আত্মীয়। রক্তাক্ত হলেও আমার রক্ত। আমাদেরই রক্ত। যা কাল নিরবধি প্রবহমান।

এবং অথঃ যথার্থ মূল্যায়ণ ধুমায়িত। রাজরোষে ক্ষত বিক্ষত মানব দেহ। মনের চিন্তন রেখা অস্বচ্ছ। চেতনা বন্ধকী কারবারে বন্দী। মানবতার প্রকাশ ও বিকাশ প্রচারের সামগ্রী। অদল বদল ভিন্ন অন্য কোন আদল নেই। এই রূপের আকার ভিন্ন, কিন্তু প্রকার তথৈবচ। ফলে ব্যক্তি সত্ত্বা ও সংগঠন বা সংস্থা, রাজশক্তি ও পেশীশক্তি দ্বারা লাঞ্ছিত। মানী ব্যক্তির সম্মান রক্ষায় নিতান্তই বেহিসাবী।

এই যাঃ এত ভাবনার দায় কী ! নিরাপদ দূরত্বে সুখে বাঁচি। অসম্মানের নিরাপত্তা বীমায় আস্থাশীল থাকি। বিবেক বিক্রিত হোক চলমান সভ্যতার সৌখিন বাজারে। পরিষ্কার ভদ্রলোক থাকতে বাঁধা নেই। কিন্তু মানব মনের অন্দর বন্দরে, মানব সভ্যতার জাহাজ

ভোঁ ভোঁ শব্দ তোলে। মনের ভূগোল প্রাকৃতিক চেতনায় শুধু "আমি" নয় মানুষ থাকতেও চায়। তাইতো সঙ্গোপনে একা হয়ে যায়। বর্ণময় পৃথিবীর বিবর্ণ ব্যস্ততায় পরিশ্রান্ত বোধ হয়, ভাল-লাগেনা ....। অবশেষে 'মন' পবিত্র পন্থায়,সুন্দরের সন্ধানী হতে চায়। সুন্দরের পূজায় মানুষ আত্মমগ্ন হতে ভালবাসে। শুচিতার সিন্ধু পাড়ে আঁছড়ে পড়ে ঢেউ .... চেতনার চৈতন্যে ভালোবাসার আকিঞ্চন। দুরন্ত ঢেউ গড়ছে .... ভাঙছে .... গড়ছে। আত্মমগ্ন অনুভবে যেন উচ্চারিত পাখির কাকলি।

কী ..... যে সুন্দর বসুন্ধরা !
সবুজ পাতায় ছড়িয়ে আছে আলো।
হাসছে রোদ, পেরিয়ে দুঃখ শোক
জীবন তো নয় - অন্ধকার ...।

না ....। জীবন অবশেষে অন্ধকারা নয়। সুর আছে। আছে সঙ্গীত। তাই গান হয়ে ওঠে জীবন। রঙতুলি খুঁজে নেয় শিল্পীর হাত। সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাধনায় পৃথিবীর গদ্যে ও কবিতায় আশ্রয়, প্রশ্রয়। ভুবন ভরা কত সম্পদ আমাদের ! শুধু সকলের নয় তাই দুঃখের বহতা বাতাস। জীবনের কালস্রোতে তবুও প্রবহমান জীবিত "জগৎ মানুষ"। অধিগত নয় সকলের সুখ তাইতো যুদ্ধ যথাবৎ। ভালো মন্দ এবং সুর ও অ-সুরের শাশ্বত দ্বন্দ অহরহ।

কোলাহল মানুষের। রাজনীতিকদের। রাজনীতির ছোট বড় রকমারী ভান্ডের রুদ্র প্রখর তাপ দাহ। এই দহন জ্বালায় জ্বলছে সমাজঘর। সুখের বাড়ী। প্রেমের উষ্ণতা। পরাগের উত্তোরণ। দাম্পত্যের সৌন্দর্য্য। আনন্দের রোদ্দুর। পেটের ক্ষিদে। অথচ কে নয় সমাজবন্ধু। ভাবনা অবিরাম। উত্তোরণের বিশ্বাস তবু বাঁচাতেই হবে। জীবন স্রোতস্বিনী .....।

দুঃখ যারে সোহাগ করে নীরব চোখের জলে, তার আত্মবিলাপ সমৃদ্ধ এই সিক্ত জল প্রবাহিত হোক চেতনার সরোবরে। নদীতে। সমুদ্রে। এবং অবশেষে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পায়ের পাতায়। স্বামী বিবেকানন্দের চেতনার আশ্রয়ে। মহাত্মা গান্ধীর দার্শনিক ভাবাদর্শে। নেতাজীর স্বদেশ প্রেমের আত্ম বলিদানে। সীমায়িত জীবনের ছোট্ট পরিসরে বিস্তারিত হোক জীবনবোধ। অন্তিমকাল অস্তমিত নয়। রেখে যায় অনন্ত সকাল।

"অন্তরের শত্রুর চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর হতে পারে না।
তাই অবিশ্বাস্য স্বরূপ গৃহ শত্রুকে ভয় করতে হবে ....."
- নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

রাজার আদেশ

তাপস হালদার

প্রতিদিন ভোরেই কর্তাবাবু ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়েন প্রাতঃভ্রমণে। আজও নিত্যদিনের মত সাথে রয়েছে তার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী পদ। পদকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেই বাড়ির দেওয়ালে লেখার দিকে নজর পড়ে বাবুর। দেওয়ালে লেখা আছে 'রাজার আদেশ'। এই রাজ্যে কেহ কখনো মিথ্যা বলতে পারবে না, মিথ্যাবাদীকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাজ্যের মধ্যে সকলে মিলে মিশে চলতে হবে। ঝগড়া বিবাদ করা চলবে না, কোন সমস্যা হলে রাজদরবারে নালিশ জানাতে হবে। সত্যবাদীকে রাজা সম্মান জানাবেন ও পুরষ্কার দেবেন। মিথ্যাবাদীকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

কর্তাবাবু অনেক সময় ধরে দেওয়ালের লিখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে পড়ে পদকে জিজ্ঞাসা করল - হ্যাঁরে পদ; দেওয়ালে কি লেখা আছে, বুঝতে পেরেছিস ? না বাবু, আমি ও লেখা পড়তে পারিনা। তাই কি করে বুঝব কি লেখা আছে দেওয়ালে। নে তোর আর বুঝে কাজ নেই, চল ঐ বটগাছতলাতে গিয়ে একটু বসি। ওখানে গিয়ে তোকে সব বলব দেওয়ালে কি লেখা আছে। বাবু পদকে দেওয়ালের সব লেখা সব বুঝিয়ে বলতেই, পদ ঘাড় নেড়ে বলল, তাইতো বলি বাবু 'মা' বলেছিল পদ যত বিপদই আসুক কখনো অন্যায় করবি না, মিথ্যা কথা বলবি না, মিথ্যা বললে তোর জিব খসে পড়বে। মায়ের কথা মতো আমি কখনো অন্যায় করিনা, বা মিথ্যা বলি না। পদ সহজ সরল লোক, ও কখনো অন্যায় আচরণ করে না।

একদিন গাছ তলাতে বসে বাবু ও পদের মধ্যে নানা গল্প হচ্ছিল। এমন সময় গাছের মগডালেতে একটা সুন্দর পাখি এসে বসে। বাবু ও পদের দিকে পাখিটা তাকিয়ে কি যেন এক দৃষ্টে দেখছিল। পদ বাবুকে পাখিটিকে দেখিয়ে বলছিল,বাবু সে বার আপনি যে পাখিটাকে বেশী খায় বলে খাঁচা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, অবিকল ঐ পাখিটির মত দেখতে। বাবু পদকে থাম বলে, ব্যাগ থেকে একটা বিস্কুট বের করে পাখিটির দিকে ছুঁড়ে দিলেন, পাখিটা গাছ থেকে নেমে সেই বিস্কুট খাবার জন্য এগিয়ে এল। বাবু তৎক্ষণাৎ হাতের লাঠি ছুঁড়ে পাখির দিকে মারতেই পাখি ভয়ে পালিয়ে গেল। বাবুর লাঠি ঠিকরে নদীর জলে গিয়ে পড়ল। এক স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে গেল। পাখিটাকে অনুসরণ করে নদীর পাড় দিয়ে উড়তে থাকে, কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেল লাঠিটা রাজবাড়ির স্নানের ঘাট থেকে একটি মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে গেল। মেয়েটি লাঠিটা নিয়ে সোজা রাজবাড়িতে গিয়ে রাজার কাছে জমা দিয়ে বলল, রাজামশাই এই লাঠি আমি নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে পেয়েছি। রাজা মেয়েটিকে লাঠি রাজদরবারে জমা দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলল। পাখিটা রাজবাড়ির ছাদে উড়ে এসে বসে। খানিক বাদের জানলার ফাঁক দিয়ে রাজকুমারী সুন্দর পাখিটাকে দেখতে পেয়ে প্রহরীদের ধরে আনতে বলে। প্রহরী পাখিটাকে ধরতে গেলে, পাখি পালিয়ে উড়তে থাকে। প্রহরীরা পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে পড়ে

এবং একটা বটগাছের তলাতে এসে থমকে দাঁড়ায়। প্রহরীরা দেখতে পেল দুজন লোক ঐ গাছতলাতে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল। হঠাৎ ওরা সবাই দেখতে পেল পাখিটা ডানা ভর করে উড়ে এসে বটগাছের মগডালেতে গিয়ে বসল। রাজবাড়ির প্রহরীরা পাখিটিকে ধরবার জন্যে চেষ্টা করে বিফল হয়ে রাজবাড়ি ফিরে এল।

বেশ কিছু সময় পর একদল রাজবাড়ির প্রহরীরা ঢেঁড়া পিটিয়ে বলে গেল, রাজবাড়িতে একটা লাঠি জমা পড়েছে। যার লাঠি হবে তাকে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে লাঠিটা রাজবাড়ি থেকে আগামীকাল নিতে হবে। বাবু ও পদ এই কথা শুনে পরদিন সকালে রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হয়ে, রাজামশাইকে লাঠি ফেরৎ পাবার আর্জি জানিয়ে দরবার করায়, রাজামশাই তাকে ঐ লাঠির প্রকৃত মালিক যে উনি, তার উপযুক্ত প্রমাণ দেবার কথা বলেন। হ্যাঁ রাজামশাই আমি উপযুক্ত প্রমাণ দিয়েই লাঠি ফেরৎ নিতে চাই। কি প্রমাণ আছে তোমার কাছে? বাবু তাড়াতাড়ি রাজার দিকে এগিয়ে যেতেই , একজন বয়স্কা মহিলা এসে রাজামশাইকে প্রণাম করে বলল, রাজামশাই এই বাবুর বাড়ি আমি কোনো এক সময়ে থাকতাম। ঐ সময় আমার দাদুর দেওয়া একটা লাঠি বাবুর বাড়ি থেকে হারিয়ে যায়। লাঠিটা দেখলে চিনতে পারব এবং দাদুর যে স্মৃতি ঐ লাঠির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারব। বাবু ঐ মহিলার দিকে তেড়ে গিয়ে বলল তুই মিথ্যা কথা বলছিস। বয়স্কা মহিলা বলল ঠিক আছে আমি মিথ্যে বললে রাজামশাই আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেব। রাজা উভয়কে শান্ত হতে বলল এবং বাবুকে বলল, বলুন আপনার কি প্রমাণ দেওয়ার আছে? বাবু বললেন, ঐ লাঠিটার অগ্রভাগ রুপোর চাঁদি দিয়ে মোড়া আছে। এছাড়া আর কোন প্রমাণ দেওয়ার আছে? বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন না, আমার আর কিছু বলবার নাই। এবার বয়স্কা মহিলাকে ডেকে নিয়ে রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি প্রমাণ দেবার আছে? বয়স্কা মহিলা রাজা মশাইয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন, ঐ লাঠির অগ্রভাগে রুপোর চাঁদনির তলাতে একটা নাম লেখা আছে, দাদুর নিজের হাতে। বাবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন রাজা মশাই আমার কিছু বলার আছে। এইসময় বাবু মনে মনে ভেবেছিল বয়স্কা মহিলার নাম ছিল চাঁপা, সে কারণ রুপোর চাঁদনির তলাতে চাঁপা নাম লেখা আছে। তাই তিনি তড়িঘড়ি রাজার উদ্দেশ্যে বললেন, লাঠির অগ্রভাগে চাঁদনির তলায় চাঁপা নাম লেখা আছে। রাজামশাই বাবুকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিয়ে বললেন ঠিক আছে আপনি বসুন। আপনার কথা সত্য হলে নিশ্চয়ই লাঠিটা আপনি ফেরৎ পেয়ে যাবেন। এবার রাজামশাই বয়স্কা মহিলার কাছে প্রমাণ চাইলে তিনি বললেন রাজামশাই আমার নাম চাঁপা, ঐ লাঠির অগ্রভাগে রুপোর চাঁদনির তলাতে বাবুর সাথে যে পদ রয়েছে, ওর নাম লেখা আছে। পদ আমার ভাই। ও যখন খুব ছোট ছিল তখন এই লাঠি দাদু ওকে দিয়েছিল। আমি আর পদ বাবুর বাড়ি থাকতাম। বাবুর বাড়ি থেকে লাঠি হারিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বাবু আমাকে বাবুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। সেই থেকে আমি লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করে খাই। রাজামশাই মন্ত্রীকে ডেকে বললেন এবার লাঠিটা নিয়ে আসুন এবং লাঠির অগ্রভাগে রুপোর চাঁদনির তলাতে কি লেখা আছে দেখুন।

এদিতে রাজামশাই নিজে রাজদরবারে পদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা

পদ তুমি তো বাবুর সঙ্গে অনেকদিন ধরে আছ। সত্য করে বলতো এ লাঠিটা আসলে কার? পদ রাজামশাইকে প্রণাম করে বলল, রাজামশাই শুনুন এ লাঠিটা আমি একদিন বাবুর কাঠের বাক্সের পিছনে পাই এবং লাঠিটা এনে বাবুর হাতে তুলে দিই। সেই থেকে বাবু রোজদিন লাঠি নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরোন। তবে বাবু আমায় একদিন বলেছিলেন এই লাঠিটা তিনি মেলা থেকে কিনে এনেচেন। এর থেকে বেশি কিছু আমি জানিনা। এদিকে রাজামশাই রাজদরবারে লাঠিটা এনে লাঠির অগ্রভাগে রুপোর চাঁদনি কেটে দেখেন , সত্যই চাঁদনির তলাতে পদ নাম লেখা আছে।

রাজামশাই বাবুকে ডেকে বললেন আপনি মিথ্যাবাধী। রাজদরবারে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন সে কারণে আজ থেকে আগামী ছয় মাস কাল আপনাকে কারাগারে বন্দী থাকতে হবে। বয়স্কা মহিলাকে ডেকে বললেন সত্য কথা বলার জন্য আজ থেকে রাজবাড়ির অন্দরে আপনি কাজ করবেন। পদ সাহস করে বাবুর ও আমার সামনে সত্য কথা বলার জন্য আজ থেকে ও রাজবাড়ির প্রহরী হিসাবে কাজ করবে। এমন সময় ঐ সুন্দর পাখিটা উড়ে এসে রাজবাড়ির ছাদে বসে। প্রহরীরা পাখিটাকে দেখতে পেয়ে ধরতে গেল, পাখিটা উড়ে এসে বয়স্কা মহিলার কাঁধে বসে। বয়স্কা মহিলা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে রাজামশাইয়ের কাছে গিয়ে বললেন, রাজামশাই এই পাখিটা আমি বাবুর বাড়িতে পুষতাম, তাই আপনি যদি পাখিটাকে রাজদরবারে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে খুব ভালো হয়। রাজামশাই প্রহরীদের ডেকে বললেন, তোমরা পাখিটাকে কখনো ধরবে না। এদিকে রাজকন্যার পাখিটিকে খুব পছন্দ, তাই সে নিজের কাছে পাখিটাকে রাখবার অনুমতি রাজার কাছে চাইলে, রাজা বললেন বেশ তো তুমি তোমার ইচ্ছামতো পাখিটিকে পুষবে, তবে কখনো খাঁচায় বন্দী করে রাখবে না। বয়স্কা মহিলা রোজ রাজকন্যার ঘরের বারান্দায় এসে পাখির গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে পোষ মানিয়ে নিল। সেই থেকে পাখিটা অন্য কোথাও না গিয়ে রাজবাড়িতে থেকে গেল।

বন্ধু তুমি ভালো থেকো

ধ্রুব তালুকদার

আজ যেন একটু বেশী কড়া হয়ে গেছে মদটা, আসলে বহুদিন আগে মদের টেস্ট দুই থেকে তিনবার পেয়েছিল বিকাশ। সত্যি এমন একটা অদ্ভুত জিনিসকে যে তৈরী করেছিল আর কার মাথায় এই জিনিসটা কথা প্রথম এসেছিল। ধন্য ধন্য লাল জলের সৃষ্টিকর্তা। যার মহিমায় আজ ধনী গরিব অভিভুত। সত্যি এই লাল জলের একটা ক্ষমতা আছে বটে নইলে সারা বিশ্বকে অবশ করে রাখার ক্ষমতা অন্য কারোর নেই। এই লাল সুধাটুকু পেটে পড়তেই আহ! যেন সব দুঃখ, কষ্ট, মান, অভিমান ভুলে টলতে টলতে বীরত্ব দেখানো। যাইহোক এই লাল জল যে একেবারে নিষ্প্রয়োজন তা নয়। যেমন আজ বিকাশের পাশে লাল জল না থাকত তাহলে হয়তো এই ভয়ঙ্কর রাত ও রাতের নিঝুম হাহাকার শেষ করে দিত বিকাশকে। আজ রাতে যে বিকাশ মদ খাবে একথা ভেবে রেখেছিল প্রায় ছ'মাস আগে। তাই মদটা যেন আজ খুব কড়া হওয়া সত্ত্বেও এক শান্তির বার্তাবরণ এনে দিতে দিতে বলতে চাইছিল, - 'আমি সবার মস্তিষ্ককে শান্তি দিতে পারি আমাকে আরো বেশী আপন করে নাও।' যার ফলস্বরূপ দুই একবার জল ছাড়াই গলার নলিতে ঢেলে দিচ্ছিল লাল জলের গেলাস। আর সাথে সাথে যেন সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছিল, গলার নলিতে চিরে যাচ্ছিল, তবে যাক না আরো পুড়ে চিরে কষ্ট নিজেকে বিকাশ। যে কষ্ট আজ সে পেয়েছে, সে আঘাত তাকে আজ চূর্ণ বিচূর্ণ করেছে, ছারখার করে দিয়েছে হৃদয়খানা, সেই আঘাত কষ্টের কাছে আজ এই লাল জলের আঘাত একটি চুলের অগ্রভাগকে সহস্র ভাগ করলে তার এক ভাগস্বরূপ। বিকাশ আজ বেশী করে, যার জন্য এক সময় বিকাশ দুই থেকে তিনবার মদ খাওয়া মানুষ, সারা জীবনের মতো প্রতিজ্ঞা করেছিল মদ খাবে না। সিগারেট খাবে না। আজ সেই যখন নিজেই সব আশার বাসা ভেঙে চলে গেলো তার কষ্টটাকে কিছুটা লাঘব করার জন্য না হয় প্রতিজ্ঞা ভেঙে আর একদিন এই লাল সুধা পান করবে। যে কিনা এনে দিয়েছিল বিকাশের জীবনে এক স্বপ্নময়, সৌন্দর্য্যময়, সরল অনুভূতির বার্তা। আজ সেই মানুষটি অপরের হতে চলেছে, তবে বিকাশ-ই বা কেন একদিনের জন্য লালজলকে আপন করে নেবে না। আজকের রাত যেন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে শেষ হয়ে যাচ্ছে বিকাশের জীবনের সমগ্র স্বপ্ন, ভালোবাসা, ভালো লাগার অমৃতসুধাটুকু তবে বিকাশের জীবনের আশা স্বপ্ন ভালোবাসা শেষ হয়ে গেলেও যার জন্য আজ এই লাল সুধা পান করছে তার জীবনের সমস্ত আশা, ভরসা এতটুকু খামতি হতে দেয়নি। সমস্তটুকু জীবনের সর্বস্ব দিয়ে পূরণ করে দিয়েছে। কারণ তাকে নিয়ে হয়তো ঘর বাঁধতে পারেনি বিকাশ কিন্তু যেহেতু তাকে কথা দিয়েছিল ঘর বাঁধার তাই সেই প্রিয় মানুষটির জন্য নিজের দিকে এতটুকু তাকায়নি বিকাশ এই দুই মাসে।

আজ থেকে চার বছর আগে বিকাশ তার কাজ নিয়ে এসেছিল এই পটুয়া মৃৎশিল্প এলাকায় আর কাজ করতে করতেই একে অপরের হয়তো কথা বলার অনুমতি নিয়ে নিয়েছিল। তার নাম লক্ষ্মী দাস সত্যি লক্ষ্মী না হলে আজ পর্যন্ত জীবনে কোনদিনও দুঃখ

কষ্ট কম ছিল না। পরিপূর্ণ দুঃখ কষ্ট নিয়ে স্বয়ং দুঃখী অভাগী লক্ষ্মী ছিল। অন্যকে যথাসম্ভব সুখ দেবার জন্য নিজেকে প্রয়সী করার জন্য নিজেকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রতি বছরই এই গ্রামে আসে বিকাশ কাজ করতে। যেখানে কাজ করে সেখানেই খাওয়া দাওয়া করে আর কাজ শেষ হলে সমগ্র গ্রাম ঘুরে বেড়াই। বিকাশদের আর্থিক অবস্থা বেশী ভালো নয়। মধ্যবিত্ত পরিবার। তাই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদে প্রতিবছরই চলে আসে কাজ করতে বিকাশ। বিকাশের কাজ এত প্রশংসাযোগ্য হয় যে এই গ্রামের এমন কেউ নেই যে বিকাশকে চেনে না বা জানে না।

যাইহোক এরপর একদিন দুপুরের খাবার খেয়ে একটি বাড়িতে পান খাবার জন্য গিয়েছির বিকাশ। মাঝে মাঝে সখে পড়ে পান খায় বিকাশ কিন্তু যে বাড়িতে পান খেতে গিয়েছিল সেটা লক্ষ্মীর বাড়ি, সেটা জানত না বিকাশ। কারণ বিকাশ তার কাজের জন্য ঐ এলাকায় খুব নাম করে ফেলেছিল। যার জন্য বিকাশ যে বাড়িতেই যেত না কেন সে বাড়িতেই তার আদর ছিল অপরিসীম। তাই চাইতে না চাইতেই পান চলে এল এবং পান নিয়ে এল লক্ষ্মীর মা। যে কিনা বিকাশকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। কারণ প্রতিবছরই বিকাশ কয়েকদিনের কাজ করার জন্য আসে এই এলাকায় এবং সুবাদে তার খ্যাতি ও যশ দেখে এককথায় অনবদ্য। এরপর পান খেতে খেতে লক্ষ্মীর মায়ের সাথে কথা বলছিল বিকাশ কাজের কথা নিয়ে। এরমধ্যেই লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিকাশের দিকে একটু তাকিয়েই প্রশ্ন করল, 'তুমি কলেজে পড় না?' বিকাশ তো হতভম্ব। এই মেয়েটা কি করে জানল যে সে কলেজে পড়ে। যাইহোক এরপর কি আর করা যাবে উত্তর তো দিতেই হবে তাই লাজুক চোখে বিকাশ বলল, হ্যাঁ পরি। তারপরেই বিকাশ আবার প্রশ্ন করল 'তুমি কি করে জানলে?' লক্ষ্মী বলল- মনে হল তাই বললাম। শেষ এই অবধি সব কথা। এরপর হয়তো বাকি কথা চোখের মণিরত্নের মাধ্যমেই হয়েছিল। তাই বিকেলবেলা ঘুরতে বেরিয়ে রাস্তায় যখন দেখা হল লক্ষ্মীর সাথে তখন দুজন সামনাসামনি হল কারো মধ্যে কোন কথা নেই। তারা একে অপরকে ক্রস করে চলে যাচ্ছে। এর মধ্যেই বিকাশ বলল, এই যে তোমাকে বলছি, একটু শুনবে। লক্ষ্মী এবার হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ ঘোরাল এবং বলল হ্যাঁ বলো? বিকাশ বলল, আমরা দুজন কি বন্ধুত্ব করতে পারি? কেন জানি না বিকাশের মুখ থেকে - হঠাৎই এমন প্রশ্ন করে বসল। তখন লক্ষ্মী বলল - 'হ্যাঁ হতে পারি কিন্তু সমস্যা হল একটাই। তা হল আমি আপনাকে সেরকম ভাবে চিনি না। আর অচেনা মানুষের সাথে কি করে বন্ধুত্ব করা যায় বলো।' দুজন চলে যায় দুদিকে। এরপর আর কারো সাথে কারো কোন কথা হয় না। পরের দিন কাজ শেষে রাতের বেলা যখন বাড়ি ফিরবে বিকাশ তার সাথে ছিল তার ভাই, নাম শিবু। দুজনের কাজ কমপি-ট করে বাড়ির দিকে সবে রওনা দেবে। এমত অবস্থায় লক্ষ্মীর সাথে দেখা। শিবু একটু আন্দাজ করেছিল তার দাদার মনের ভাব ও দুর্বলতা। তাই সময় বুঝে লক্ষ্মীকে ডাক দিল, 'দিদি ও দিদি একটু শুনবে? দিদি ও দিদি। যদি বিকাশ ডাকতো তাহলে হয়তো রাতের বেলা বলে উপেক্ষা করে চলে যেত কিন্তু দিদি ডাকটা যেন শক্তিশেনের মতো হৃদয়ে গ্রথিত হল। তখন লক্ষ্মী সামনে আসতেই বিকাশ বলল 'এই যে আমি বিকেলবেলা বলেছিলাম না বন্ধুত্ব করার কথা। আর

তুমি বলেছিলে তুমি আমায় চেনো না, তাই বলছি চেনার জন্য যদি ফোন নম্বরটা দাও তাহলে আমরা বন্ধু হিসাবে কথা বলে একে অপরকে চিনে নিতে পারি।' লক্ষ্মী বলল- 'আমার ফোন নেই (সত্যি ছিল না) আর ফোন নম্বরও নেই।' এরপর বিকাশ একটি কাগজে লেখা ফোন নম্বর লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বলল - 'এটা আমার নম্বর যদি সময় হয় কল করো।' লক্ষ্মী বলে উঠল - 'দ্যাখো, আমার সময় হবে না কোনদিনই, তাছাড়া আমার নিজস্ব কোন ফোন নেই। আর আমি বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের হই না যে অন্যের ফোন থেকে ফোন করবো।' বিকাশ যে প্রতি উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, -'দেখো আবার একবছর পর এখানে আসবো। এই এক বছরের মধ্যে দিনে একবার করে কল করবে তাতে যদি সময় না হয় মাসে একবার, আর তাতেও যদি সময় না হয় তবে একবছর অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের মধ্যে একবার তো সময় হবে নিশ্চয় তখনই কল করো।' লক্ষ্মী বলল - 'আমি পারবো না।' বিকাশ বলল - 'ও তোমার বয়ফ্রেন্ড বুঝি রাগ করবে?' লক্ষ্মী বলল - 'ঠিক আছে একদিনে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোমার বয়ফ্রেন্ডের জন্য তেইশ ঘন্টা আর আমার জন্য এক ঘন্টা সময় দিও, তাও যদি সম্ভব না হয় এক মাসের মধ্যে আঠাশ দিন বয়ফ্রেন্ডকে সময় দিও আর আমাকে ফোন করার জন্য দু'দিন সময় রেখো, তাও যদি না পারো এক বছরে একটা দিন সময় বের করো তার মধ্যে একঘন্টা সময় দিলেই হবে। এরপর কারোর মধ্যে কোন কথা নেই যে যার মতো চলে গেলো। লক্ষ্মী গেল বাড়িতে আর বিকাশ ফিরে এলো বাড়িতে।

একদিন যায়, দু'দিন যায় কোন ফোন আসে না। তাই একরকম আশা ছেড়েই দিল বিকাশ। হঠাৎ করে একদিন বিকেলবেলা (চারদিন পর) ফোন এল অচেনা নম্বর থেকে। বিকাশ রিসিভ করতেই অপর প্রান্ত থেকে বলে উঠল -'আমি লক্ষ্মী বলছি।' বিকাশ বলল - 'হ্যালো! আমি তো চিনতে পারলাম না।' লক্ষ্মী বলল - 'আজ থেকে চার দিন আগে যে মেয়েটাকে আপনি ফোন নম্বর দিয়েছিলেন।' বিকাশ ওহ বলে যেন চিনতে পেরেছে এই রকমভাবে বলল -'হ্যাঁ হ্যাঁ বলো কেমন আছো?' চলতে থাকলো নানা কথা এবং মাঝে মধ্যেই সময় পেলে বান্ধবীর নং থেকে ফোন করে লক্ষ্মী। হঠাৎ করে আরেকদিন আরেক নং থেকে ফোন এল বিকাশের ফোনে। লক্ষ্মী বলল - এটা আমার নম্বর, নতুন ফোন কিনেছি, সেভ করে রেখো। কারণ ততদিনে দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ এতটাই জমে উঠেছে যে ফোন নম্বর সেভ করে রাখতে বলল বিকাশকে। এমন করে চলছে দুজনের মধ্যে নানারকমের কথা। বিকাশের কাজ খুব ভালো লাগে, লক্ষ্মীর বেশিরভাগ সময়ই সেই প্রশংসা চলে ফোনে। লক্ষ্মী প্রথম যেদিন ফোন করেছিল সেদিনই প্রথম একটা শর্ত বলে দিয়েছিল বিকাশকে। সেটা হল- বিকাশ কোনদিন বন্ধুত্বের বেশী অন্য কোন দাবী করতে পারবে না। যেদিনই অন্য কোন দাবী করবে সেদিনই হবে লক্ষ্মীর সাথে শেষ কথা বলা। এমন শর্তে রাজি হয়েই চলছে দুজনের বাক্যালাপ। আর সেটা ধীরে ধীরে প্রেমালাপে পরিণত হচ্ছে বিকাশের তৎপরতায়। কিন্তু লক্ষ্মী সেটা বুঝতে পেরে সোজাসুজি বলে দিয়েছে যে, আমার কাছ থেকে বন্ধুত্বের বেশী কিছু কোনদিন দাবী করবে না বিকাশ। তবুও বিকাশ যেন নাছোরবান্দা, রাজি করাবেই। কিন্তু না সে বিফল হয়ে যায় প্রতিবারই। বন্ধুত্বের দাবী নিয়েই

তারা দেখা করল একদিন। সামনা সামনি হতেই দুজনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। কথা শুরু হল উপহার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। কারণ কয়েকদিন আগেই লক্ষ্মীর অজান্তে বিকাশ তার কলেজে তার বন্ধুদেরকে পার্টি দিয়েছে পাপড়িচাট আর ঘুগনি খাইয়ে। এরপর অনেক কথা হল দুজনের মধ্যে। শেষে আসবার পথে একটা চিঠি দিল লক্ষ্মী, বলল বাড়ি গিয়ে পড়ো। বাড়ি এসে চিঠিটা খুলতেই বিকাশ অবাক, কারণ চিঠিটায় লেখা ছিল এক অশ্রুরিক্ত কলমের লিখন —

"এই পৃথিবী থেকে আমি যতটুকু চেয়েছি, তার থেকে অনেক বেশী কিছু পেয়েছি। কিন্তু তার কিছুই আমি চিরন্তনের জন্য ধরে রাখতে পারিনি। ঠিক এমনটাই আজও আমার জীবনে ঘটেছে। আমি তোমাকে এত কাছে পেয়েও তোমার হৃদয় মাঝে জায়গা করে নিতে পারিনি। তবে এটাকে আমি না পাওয়ার দুঃখ বলে মেনে নেব না বুঝবো এ আমার জীবনের সব থেকে বড় ব্যর্থতা। হয়তো তুমি আমার কাছ থেকে কিছু একটা আশা করছ এবং এখনো তারই অপেক্ষায় রয়েছো কিন্তু তোমার এই আশা হয়তো আমি কোন দিনই পূরণ করতে পারব না। কারণ এতদিন ধরে একসাথে কাটানো এতগুলো মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসা, এই সমাজের পিছুটান এগুলোকে অতিক্রম করে দু পা এগিয়ে তোমার কাছে যেতে এবং সে ক্ষমতাও আমার নেই। তবে আমার বিশ্বাস যে আমি তোমার জীবনে না থাকলেও এমন কেউ তোমার জীবনে আসবে যে তোমার হৃদয়ের সমস্ত শূন্যজায়গাগুলোকে তার ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেবে। আমি চাই তোমার জীবনটা খুব সুখের হোক,সুন্দর হোক। হয়তো কোন একদিন, কোন এক সময় তোমার পাশে আমি আর থাকবো না। তবুও আমি তোমায় কথা দিচ্ছি তোমার পাশে থাকবো। তবে জানি না তোমায় দেওয়া কথা আমি রাখতে পারবো কিনা। কিন্তু একদিন হয়তো আর আমার কথা মনে পড়বে না। কোন কারণবশত যদি অজান্তেও আমার কথা তোমার কখনো মনে পড়ে তাহলে শুধু একটাই কথা জানবে যে, "কোন একদিন, কোন এক জায়গায় তোমার সাথে একটি মেয়ের দেখা হয়েছিল এবং সেদিন রাতে তুমি তোমার সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ করে দিয়েছিলে। কিন্তু সেই মেয়েটি ক্ষণিকের জন্য তোমার সাথে যোগাযোগ রাখলেও সে সুযোগটাকে কাজে লাগোতে পারেনি। কিন্তু আজ সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাক, একবারের জন্য হলেও তোমার কথা তার মনে পড়ছে এবং তোমার বলা কথা তাকে তার জীবন পথে চলতে সাহায্য করছে। আমি জানি তুমি খুব ভালো ছেলে তাই আমার কথা তুমি ঠিক রাখবে।"

সত্যি লক্ষ্মী এতটা কষ্টে রয়েছে যে ইচ্ছে থাকলেও বিকাশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ নেই। এরকম করে তিনটে বছর কেটে গেল, ফোনে কথা বলে, দেখা করে আবার বছরের এই সময় লক্ষ্মীদের ওখানে কাজ করে রোজ দুপুরে পান খায় লক্ষ্মীর মায়ের হাতে। যতবারই বিকাশ তার মনের কথা জানিয়েছে প্রতিবারই লক্ষ্মী না করে গেছে। এই তিন বছরের মধ্যে লক্ষ্মীর অপছন্দ বলে বিকাশ সিগারেট,বিয়ার (সখে বন্ধুদের সাথে খায়) খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে এবং লক্ষীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। বিকাশের ফাইনাল পরীক্ষার মধ্যে ছুটে গেছে দেখার করার জন্য লক্ষ্মীর সাথে কারণ লক্ষ্মী সহজে বাড়ি থেকে বের হয় না। পরীক্ষা শেষে বেড়াতে গেছে তার পিসির বাড়ি। বিকাশ সে কথা শুনে ছুটে

গেছে লক্ষ্মীর পিসি বাড়ির পাশে একটিবার দেখা করার জন্য। লক্ষ্মীর জন্মদিনে বন্ধুদের পার্টি যে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠল। লক্ষ্মীপুজোর রাতে ফোনে ফোনে দুজনে মিলে একসঙ্গে চাঁদ দেখা, ফোনে ফোনে সরস্বতী পুজোর শাড়ি পড়া ও ধুতি পড়া ও প্রাত্যহিক জীবনের সবকিছু চলতে থাকল। দুজনের মধ্যে চিঠির আদান প্রদান। এর মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। লক্ষ্মীর বাবা মারা গেলেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। আর দিনন ১৫ পরে লক্ষ্মীর উচ্চমাধ্যমিক ফাইনাল। খবরটা পেল লক্ষ্মীর এক বান্ধবীর মাধ্যমে। সব কাজ শেষ হবার পর লক্ষ্মী ভেঙে পড়ল। ডিশিশান নেয় সে আর পরীক্ষা দেবে না। কারণ সে তার বাবাকে খুব ভালোবাসতো। আর বাবাকে হারিয়ে আজ সে বড়ই একা। ছোট ভাই ও মাকে নিয়ে লক্ষ্মী আজ বড়ো একা। তাই বিকাশ কোনরকমে রাজি করাল পরীক্ষা দেবার জন্য লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী একরকম কষ্ট দুঃখ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিল। ফলপ্রকাশের দিন খুব প্রার্থনা করেছিল বিকাশ ভগবানের কাছে। ভগবান বিকাশকে নিরাশ করেনি। লক্ষ্মী ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে (দুটো বিষয়ে লেটার) স্কুলে দ্বিতীয় হয়েছে। এরপর ও বিকাশের জোর করাতে বিবেকানন্দ কলেজে ইংলিশ অনার্স নিয়ে ভর্তি হয় লক্ষ্মী।

পারিবারিক অবস্থা ভালো না থাকায় কিছু দিনের মধ্যে লক্ষ্মী ও তার ভাই সংসারের হাল ধরল টিউশান শুরু করে। এমন করে চলছে সংসার। এর মধ্যেই লক্ষ্মীর জীবনে আসে তাদেরই এলাকার একটি ছেলে ভালোবাসার মানুষ হিসাবে। যার নাম চিন্ময়। দুজন দুজনকে ভালোবেসে ফেলে। চিন্ময় সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিল লক্ষ্মীর জন্য। বিকাশের ভালোবাসা ঠুনকো হয়ে গিয়েছিল চিন্ময়ের ভালোবাসার কাছে। তাই চিন্ময় জিতে নিয়েছিল লক্ষ্মীকে। চিন্ময় আর লক্ষ্মী দুজন দুজনকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। চিন্ময় লক্ষ্মীর বাড়িতে সে কথা জানায়। কিন্তু দুজনের মধ্যে জাতিগত মিল না থাকায় লক্ষ্মীর পরিবার থেকে রাজি হয়। এর ফলে দুজনে একটু ভেঙে পড়লেও চলতে থাকে দেখা করা, ফোনে কথা বলা। আর এদিকে বিকাশের সাথে কথা বলার পরিমাণটা কমিয়ে দেয়। কিন্তু বিকাশ অনন্ত অসীম ভালোবাসা নিয়ে অপেক্ষা করে।

হঠাৎ করে একদিন লক্ষ্মীর এক বান্ধবীর থেকে চিন্ময় আর লক্ষ্মীর সম্পর্কের কথা জানতে পারে। তখন বিকাশের মনে প্রচন্ড ঘৃণা হয় লক্ষ্মীকে নিয়ে। মনে হয় লক্ষ্মীকে সামনে পেলে দুগালে দুটো কষিয়ে চড় মেরে জিজ্ঞেস করত কি তার অপরাধ ? কিন্তু হায় একেই বলে ভালোবাসা। চিন্ময় কোন মাধ্যমে লক্ষ্মী আর বিকাশের ফোন করার কথা জানতে পারে। তারপরেই শুরু হয় চিন্ময় ও লক্ষ্মীর মধ্যে ঝগড়া। যার ফলস্বরূপ তার সম্পর্ক ভেঙে যায়। আর তারপরে লক্ষ্মী বিকাশকে ফোন কের এবং বলে - এই যে বিকাশ, তোমার জন্য আজ আমার ভালোবাসার মানুষটি হারিয়ে গেল। তুমি মানুষ নও তুমি একটা অমানুষ। বিকাশকে আজ আর কিছু বলতে দিচ্ছে না। বিকাশ শুধু চুপচাপ শুনছে। অনেক খারাপ খারাপ কথা বলল বিকাশকে আর বলল তুমি আর কোনদিনও ফোন করবে না, তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব শেষ। যদি আমায় এক সেকেন্ডের জন্য ভালোবেসে থাকো তাহলে সেই ভালোবাসার দিব্যি রইলো কোন দিনও আমার জীবনে আসবে না। আমার সামনে মুখ দেখাবে না বলে ফোনটা কেটে দিল। বিকাশ শুধু চোখের জল ফেলে একটা

কথাই বলল আমার জন্য যদি তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমি কথা দিলাম তোমার জীবনকে সুন্দর করে দেবার দায়িত্ব আমার। এরপরই বিকাশ লক্ষ্মীর ছোট ভাইকে ফোন করল এবং দুজনে একদিন দেখা করে বিকাশ সব কথা খুলে বলে লক্ষ্মীর ছোট ভাইকে এবং প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় এই কথা শুধুমাত্র লক্ষ্মীর মা ছাড়া যেন আর কেউ না জানে। লক্ষ্মীর মা বিষয়টা জানা মাত্র মাস দুয়েক এর মধ্যে লক্ষ্মীর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। বিকাশের কলেজ শেষ, বি.এড. ভর্তি হবে। যেই শুনতে পেল লক্ষ্মীর বিয়ে ঠিক হয়েছে অমনি ফোনে লক্ষ্মীর ভাই ও মায়ের সাথে কথা বলে সব ঠিক করে নিল। টিউশান পড়িয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় তাই তাদের সম্বল মাত্র লক্ষ্মীর নামে জমানো ৭০ হাজার টাকা যা লক্ষ্মীর বাবা জীবিত কালে ব্যাঙ্কে রেখে গিয়েছিলেন। তাই বিকাশ বৈষ্ণব পদাবলীতে পড়েছিল 'প্রেমের আনন্দ মিলনে নয় ত্যাগে।' তাই এই সুযোগ হারাতে চায় না। হারাতে চায় না তার ভালোবাসার মানুষের মুখের হাসি। অপরাধী তো সে লক্ষ্মীর কাছে সারা জীবনের মত হয়েছেই, যদি মুখের হাসিটাও চলে যায় তাহলে বিকাশ নিজের কাছে চিরকালের জন্য অপরাধী থেকেই যাবে। তাই বিকাশ তার নিজের পরিবারকে রাজি করিয়ে ও লক্ষ্মীর মা ও ভাইকে জোর করে রাজি করিয়ে বিয়ের জন্য কোন কিছুর অভাব রাখলো না। কারণ বিকাশের বি.এড. করার জন্য এক লাখ চলি-শ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিল লক্ষ্মীর মায়ের হাতে লক্ষ্মীর অজান্তে এবং নিজেই সবরকম ব্যবস্থা করল বিয়ের জন্য। লক্ষ্মীর সাথে যার বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার অবস্থা বেশী ভালো ছিল না।

আজ সেই বিয়ের দিন। হ্যাঁ বিকাশকে লক্ষ্মী নেমন্তন্ন করেছিল আসার জন্য কিন্তু তার বিয়ের খরচ যে বিকাশ দিয়েছে তা চিরকাল অজানাই থাকবে এমনই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় লক্ষ্মীর ভাই ও মা-কে দিয়ে। বিকাশ নিজে হাতে লক্ষ্মীর ভাইয়ের সাথে হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করেছিল কিন্তু মুখ দেখাইনি লক্ষ্মীকে কারণ যখনই কাজ করতে করতে দুজনে দুজনার সম্মুখীন হয়েছে। তখনি বিকাশ অবলীলাক্রমে মাথা নীচু করে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। বিয়ের আসরে যখন লক্ষ্মী বসেছে তখন বিকাশ একটা বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে ছোট একটা উপহার পাঠিয়ে দিল এবং সেটা যেহেতু লক্ষ্মীর কাছে একটা বাচ্চা মেয়ে নিয়ে গেছে তাই সকলে মিলে লক্ষ্মীর সামনে আগ্রহ নিয়ে খুলে ফেলল। দেখা গেল বাক্সের মধ্যে ধূপকাঠি ও ধূপদানী। পাশে একটা চিরকূট লেখা আছে এই একশো ধূপকাঠির সুগন্ধের মতো তোমার জীবন সুরভিত হোক। লক্ষ্মীর আর বুঝতে বাকি রইলো না কে পাঠিয়েছে। লক্ষ্মীর খুব ইচ্ছে ছিল এম.এ. পড়বে। তাই তার খরচ বাবদ পনের হাজার টাকা লক্ষ্মীর ছোটভাই এর হাতে তুলে দিয়ে বলল এই টাকাটা যে এম.এ. পড়ার খরচ হিসাবে শ্বশুরবাড়ি যাবার দিন হাতে দিয়ে দেয় বলে বিদায় নিল বিকাশ। বিয়েবাড়ির পাশে ফাঁকা মাঠ। মাঠে এসে বসেছে বিকাশ লাল সুধা নিয়ে। আর সানাইয়ের আওয়াজ ভেসে আসছে কানে, যার মানেটা ঠিক এইরকম —

" ভালোবেসে যাবো বন্ধু ভালোবেসেই যাবো।"

বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা

মোহন কুমার মন্ডল

সহ অধ্যাপক (সংস্কৃত বিভাগ) রানাঘাট, নদীয়া।

"নয়তি ইতি নীতিঃ"। অর্থাৎ যা মানব সমাজকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করে তাই নীতি। যদিও নীতিশব্দটি রাজনীতি,সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মনীতি প্রভৃতি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে 'নীতি' শব্দটি শাসনধর্মের বৈশিষ্ট্য, সমাজ জীবনের সুসংযত ধারা, অর্থসংক্রান্ত নিয়মাবলী, ধর্মভিত্তিক আচার আচরণ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতা কি আছে? হয়তো বিচারের এটাই যথার্থ সময়। আর যদি না থাকে তাহলে মানুষের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক দৃঢ়তা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে নীতিবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। আজকের বিশ্বের প্রত্যেক পরতে পরতে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে মনুষ্য সমাজ অতিষ্ট, লাঞ্ছিত, প্রতারিত ও বিশ্বাস ভঙ্গের মোহে নিমজ্জিত। বিশ্ববাসী মেরুদন্ড সোজা করে প্রতিবাদের ভাষা হারাতে বসেছে। তারমধ্যে যে প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি শুনি তা নৈতিকতার ও মনুষ্যত্বের জয়ধ্বনি। এই বিশ্বায়নের যুগেও মানব মনে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বোধ উদ্বুদ্ধ করতে, পারস্পরিক মৈত্রীভাব জাগ্রত করতে, প্রেম ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতে, নীত সম্বলিত সাহিত্য পাঠের গুরুত্ব অনুভূত হয়।

'জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃসমানাঃ'। এই জ্ঞানই মানুষের বিশেষ নিজস্ব সম্পদ। এই জ্ঞানই তার ভালমন্দ বিচারের পরিচায়ক। এই জ্ঞানের অভাবে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। যেহেতু আজকের বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা, সুস্থ পরিবেশ ও পারস্পরিক সদ্ভাব অনেকখানি সদাচারের উপর নির্ভরশীল তাই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু নীতিবাক্যের আলোকপাত করাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দিকে পৃথিবীর বুকে যে আলোক বর্তিকা নিয়ে হাজির হলো তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। তারই হাত ধরে বিশ্ব শিক্ষা, ধর্ম, কলা ও কৃষ্টিতে এক মেলবন্ধন শুরু হলো। সমাজতান্ত্রিক থেকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি পাকাপাকিভাবে সমস্ত বিশ্বে হাতছানি দিতে থাকলো। বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় সমস্ত রাষ্ট্রই তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে বদ্ধপরিকর। কিন্তু গোল বাঁধলো সেই নৈতিকতার প্রশ্নে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তাঁর কাব্যময় ভাষায় তাই যথার্থই বলেছেন - "কে কতটা দিবে আর নিবে। মিলাবে মিলিবে মহামানবের সাগরতলে।" (১) বিশ্বমানবের কাছে প্রশ্ন জাগলো, আমরা বিশ্বায়ন চাই নৈতিকতার মোগক ছাড়া, না বিশ।বায়ন ও নৈতিকতা যুগপদ চাই, কোনটা ? এর কারণ একটাই আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে গেলে নৈতিকতার অনুসরণ করা প্রয়োজন। তা না হলে বিশ্বায়নও একদিন ফিকে হয়ে যাবে। কেননা যদি বিশ্বায়ন চাই নৈতিকতাকে বর্জন করে, তাহলে ভর্ত্তহরির নীতিবাক্যই চিরন্তন সত্য হয়ে আমাদের উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে

এর থেকে বড় দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর হবে না।

"লোভশ্চেদগুণেন কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিম্ পাতকৈঃ
সত্যং চেত্তপসা চ কিংশুচি মনো যদ্যস্তি তীর্থেন কিম্ ।
সৌজন্যং যদি কিং নিজৈঃ স্বমহিমা যদ্যস্তি কিং মন্ডনৈঃ
সদ্বিজা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং মর্ত্যুনা।"

ভর্ত্তৃহরি / নীতিশতক/৫৫/৯০ পৃঃ। (২)

এই বিশ্বায়নের যুগে উন্নত ও উন্নয়ণশীল দেশগুলি যদি পারস্পরিক উচ্চ আকাঙ্খা রূপ অত্যাবশ্যক লোভের বশবর্তী হয় তবে সত্যই বিশ্ব মৃত্যুমুখে পতিত হবে। খলতার অস্তিত্বে অন্য কোন পাপের প্রয়োজন হবে না। তাই উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, সৌজন্যবোধ ও সৎবিদ্যা রূপ নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। "রসবৈ অমৃতম্"। (৩) অমৃত রস থেকে এই পৃথিবী বঞ্চিত হবে। 'তাই যদি আমরা এই পৃথিবীরূপ গাভী দোহনে অভিলাষী হই, তবে বৎসতুল্য এই জনগণকে পোষণ করতে হবে। (৪) জনগণ অনবরত পূর্ণভাবে পরিপুষ্ট হলে কল্পলতার ন্যায় পৃথিবী নানা প্রকার ফল প্রদান করবে। (৫) তখন বিশ্বায়নের অর্থই যথার্থ হয়েছে বলে মনে হবে।

এখন প্রশ্ন। বিশ্বায়ন পৃথিবীর সবমানুষের আর্থিক সুরক্ষা এবং সীমিত স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ আর্থিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতি মানুষের বৌদ্ধিক ও নান্দনিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে পারে? আমার মতে মানুষের ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে নিহিত আছে তাঁর যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত নৈতিকতার উৎস। ধীশক্তির দ্বারা ব্যক্তি মানুষের মনে নৈতিকতার উপলব্ধি জন্মালে নিজ মানুষের দ্রুত বিকাশের স্বার্থে সে নিজে থেকেই সাম্য ও স্বাধীনতাময় জগৎ ব্যবস্থার প্রবক্তা হবে। আর সাম্য ও স্বাধীনতা পৃথিভীতে রূপায়িত হলে মৈত্রী সহজেই জন্ম নেবে। যেমন আজ বিশ্বে মানব সভ্যতার বৌদ্ধিক ও নান্দনিক বিকাশের জন্য যেমন প্রতিটি মানুষেরই দারিদ্র্য থেকে মুক্তি এবং আর্থিক সুরক্ষা প্রয়োজন। সেইরূপ অন্তহীন ভোগবাদ ও মানুষের বৌদ্ধিক ও নান্দনিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে ভর্ত্তৃহরির সেই নীতিবাক্যই বর্তমান বিশ্বকে সতর্কীকরণ করতে পারে। কারণ ধন নাশ হেতু বিত্তহীন মানুষের কাছে একমুঠো ধানের মূল্য অনেক বেশী। আর অর্থবানের কাছে একমুঠো ধানের মূল্য অতিতুচ্ছ। ঐশ্বর্যে বিরাট পৃথিবী তৃণের মতো বলে মনে হয়।

"পরিক্ষীণঃ কশ্চিৎ স্পৃহয়তি যবানাম্ প্রসৃতয়ে
স পশ্চাৎ সম্পূর্ণঃ কলয়তি ধরিত্রীং তৃণসমাম্ ।
অতশ্চানৈকান্ত্যদগুরুলঘুতয়ার্থেষু ধনিনা -
মবস্থা বস্তুনি প্রথয়তি চ সংকোচয়তি চ ।।"

ভর্ত্তৃহরি / নীতিশতক/৪৫/৮১ পৃঃ। (৬)

দারিদ্র্য মানুষকে অভাব, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য ও অশিক্ষায় অমানুষ করে রাখে এবং তাকে অন্তহীন কায়িক শ্রমে বাধ্য করে। তাদের বৌদ্ধিক ও নান্দনিক বিকাশ স্তব্ধ করে। অপরদিকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে যে মানুষের অন্তহীন অর্থ এবং ভোগবিলাসের সন্ধানে জীবন যাপন করে, বৌদ্ধিক নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেও পশুতুল্য জীবমাত্র। রবীন্দ্রনাথ

তার কাব্যময় ভাষায় যথার্থই বলেছেন - "পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" (৭) তাই পৃথিবীর সব মানুষের আর্থিক সুরক্ষা এবং সীমিত স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ আর্থিক সাম্যের ভিত্তি ত্বরান্বিত করতে আজ বিশ্বে নৈতিক সতর্কীকরণ বড় প্রয়োজন।

পরিশেষে একথা বলতে চাই সত্যই বর্তমান বিশ্বে নীতিশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা আছে। কারণ আমরা বিলাস ঐশ্বর্যে এতটাই মত্ত যে উপকারীর উপকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকারে পরন্মুখ। আমরা ভুলে যাই সেই শিক্ষা - "ফলাগমে বৃক্ষগুলি অবনত হয়, মেঘগুলি নূতন জলকণা দ্বারা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, মহাপুরুষগণ সমৃদ্ধিকালে উদ্ধত হন না। পরোপকারী ব্যক্তিগণের স্বভাবই এরূপ।" (৮) আমরা ভুলে যাই সেই শিক্ষাই -"সৌজন্য মহত্বের, বাকসংযম শৌর্যের, ইন্দ্রিয়নিবৃত্তি জ্ঞানের, বিনয় শাস্ত্রজ্ঞানের, সৎপাত্রে ব্যয় ধনের, ক্রোধহীনতা তপস্যার, ক্ষমা প্রভুত্বের, অকপটতা ধর্মের ভূষণ।" (৯) এই গুণগুলি জানতে হলে আমাদের সৎচরিত্রবান হতে হবে। তাই সৎচরিত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ।(১০) যাদের বিদ্যা, তপস্যা, দানশীলতা, জ্ঞান, সৎস্বভাব, সদগুণ ও ধর্মভাব কিছুই নেই, তারা পশুতুল্য, পৃথিবীতে ভারস্বরূপ। তারা মর্ত্যলোকে মনুষ্য বিচরণ করে।(১১) পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় —

"এতে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য যে
সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যমভৃতঃ স্বার্থাবিরোধেন যে।
তেহমী মানবরাক্ষসাঃ পরহিতাং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে।"
ভর্ত্তৃহরি / নীতিশতক/৭৪/১০৮ পৃঃ। (১২)

যমরাজের দরবারে

প্রশান্ত পাল

বিবেক ঃ

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর সাক্ষী সময়।
সময় কখনও থেমে থাকে না।
প্রতিনিয়ত সামনে এগিয়ে চলে সে সর্বদা গতিশীল।
সময়র সাথে সাথে এই মহাবিশ্বের -
সবকিছুই পরিবর্তনশীল।
সময়ের শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যকে
আমরা উপলব্ধি করতে পারি না।
তবে কী সৃষ্টির শেষ লগ্নেও সময় শেষ হয়ে যাবে না ?
এই প্রশ্নের সমাধানে যম-দরবারে আজ,
বিস্তারিত উত্তর দেবেন, স্বয়ং যমরাজ।।

যমরাজ ঃ

নমঃ চামুন্ডায় নমঃ, নমঃ চামুন্ডায় নমঃ, নমঃ চামুন্ডায় নমঃ

কাব্য কথার যম দরবারে সবার উপস্থিতি
ইষ্টদেবী চামুন্ডার কাছে ভক্তি ও প্রণতি।
বিবেক মনুষ্য চিত্রগুপ্তসহ সকল গুণীজন
সবার অনুমতি নিয়ে, যম - দরবারের ক্ষণ।
বিধির বিধানে সমতা আনে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
নিয়তিরই কর্মী আমি, যমরাজ পরিচয়।
বিচারে আমি নিরপেক্ষ, বুঝি না আপন পর
যেমন কর্ম তেমন ফল, হতে পারে ভয়ঙ্কর।
নমঃ চামুন্ডায় নমঃ, নমঃ চামুন্ডায় নমঃ, নমঃ চামুন্ডায় নমঃ

বিবেক ঃ

স্রষ্টা থেকে সৃষ্টির জীবন যা কিছু নিয়ে বিশ্ব
রোজই মোরা বৃদ্ধ হচ্ছি তিল তিল করে নিঃস্ব।
আজ বৃন্তের ছোট্ট কুঁড়িটি ফুল হয়ে ফোটে কাল
শিশুর জীবনেও যৌবন শেষে আসে বৃদ্ধকাল।
স্নেহ আদর যত্নে লালিত এই মনুষ্য দেহ

পঞ্চভূতে বিলীন হলে আপন রবে না কেহ।।

মনুষ্য ঃ

জন্ম হয়েছে মানুষ রূপেতে, রয়েছে মৃত্যুভয়
মানব দেহ মরণশীল অমর কখনও নয়।
স্থাপত্য, আধিপত্য যত অপত্য টান
স্মৃতি হয়ে শুধু স্মরনীয় রবে দেহ হবে নিস্প্রাণ।
বিরহ ব্যথায় বিদ্ধ হৃদয় করবে হাহাকার
শূণ্য পোষাকে শয়ন করিয়ে দেহ হবে সৎকার।
স্মৃতিচারণের অমেয় জোয়ারে ভেলায় ভাসবে কেহ
অচিনপুরের অধরা আত্মা, রবে শুধু অনুমেয়।

শিল্পী ঃ

জন্মের শেষ পরিণতি মৃত্যু
এই শাশ্বত বাণীর সপক্ষে
কবিকণ্ঠে ধ্বনিতহয় -

মন বলে তুমি আছো/ চোখ বলে নেই
তুমি থাকো পঞ্চভূতে, সর্বজীবেতেই।।

চিত্রগুপ্ত ঃ

ঊষা থেকে গোধূলি আর সন্ধ্যা থেকে প্রভাত,
সূর্যের সামনে পৃথিবী, করে প্রণিপাত।
অক্ষে একটি আবর্তনেই, দিন চলে যায়,
বছর, যুগ, শতাব্দীও যায় - প্রতিদিনের ন্যায়।।
মর্ত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাণী, মানুষ যদি ধরি,
শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবে, যে যার কর্ম করি।।
ভাল-মন্দ, ভোগ-ত্যাগ, আচার-বিচার
যমরাজের কার্য্যালয়ে, হয় সুবিচার।
পৌরাণিত মতে, হিসাব - আমি চিত্রগুপ্ত রাখি,
মানুষের সব কৃতকর্মের, অংক কষে থাকি।

শিল্পী ঃ

মুখোসে মুখটা রেখে/ পোষাকে অঙ্গ ঢেকে
পশু আর জন্তু কিছু মানুষ সেজে রয়

বলনা বাবু মানুষ কোথা পায়।

যমরাজ ঃ

নমঃ চামুন্ডায় নমঃ, নমঃ চামুন্ডায় নমঃ, নমঃ চামুন্ডায় নমঃ
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই তিনটি ভুবনে
সবাই আমরা সমীহ করে যমরাজ বলে মানে।
কর্মফলের বিচারে আমি নামেই ভয়ঙ্কর,
পাপী তাপী জ্ঞানীগুণীও কাঁপে থরথর।
সুযোগ পেলে আমিও বলব আমার মনের কথা,
কর্মক্ষেত্রে আমি অবিচল নেই কোন ব্যর্থতা।
মর্ত্যবাসী বলে যম নিষ্ঠুর, পাষন্ড, শক্ত
মর্ত্যে কেউ আমাকে পূজা করে না শূন্য আমার ভক্ত।
কবির ভাবনায় আমারও অনেক সুখ দুঃখ আছে
শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিপর্যয়ের মাঝে।
কত উপচারে কত দেবতা পূজা পায় প্রতিদিন
যমপুরীতে মহারাজ হয়ে শুধু আমি কাটাই দিন।
সারাজীবন মনুষ্যকুল যা যা কর্ম করে
চিত্রগুপ্ত হিসাব রাখেন প্রতি স্তরে স্তরে।
মহাসচিব চিত্রগুপ্ত এই তো পাশেই দাঁড়িয়ে
নির্বিকল্প হিসাবের কথা বলবেন কণ্ঠ বাড়িয়ে।।

চিত্রগুপ্ত ঃ

কল্পিত এই যমপুরীতে, উপস্থিতি আজ
গুণীজনের মধ্যে, করি একসাথে বিরাজ
সকল গণ্যমান্য সহ, ধর্মরাজ অনন্য
সকলের মাঝে থেকে, নিজেও আমি ধন্য।
নিবেদনে আছে মোর, কয়েকটি কথা,
সেই সত্যযুগ থেকে, লিখে ভরছি খাতা।
মান্ধাতার আমল থেকে, লিখছি আর লিখছি
প্রতি মুহূর্তে নিত্যনতুন, সংবিধানও শিখছি।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের তিনটি যুগ পেরিয়ে
ঘোর কলিযুগে আজ, এইখানে দাঁড়িয়ে।
হিসাব মিলাতে গিয়ে, রোজ খাই হাবুডুবু
কতবার আবেদন করেছি, বলুন প্রভু ?
বিরল বসতি ছিল, প্রাণী সেই যুগে

পিঁপড়ের মতো অগুণতি প্রাণ, আজ এই যুগে।
একা একা সামলাতে পারি না আমি আর
প্রতিদিনই দাবী করি চাই কম্পিউটার।
তবুও শোনেনা কেউ, আমার কথা,
প্রভু বলেন চিত্রগুপ্তের, হিসাবেও ব্যর্থতা?
আধুনিক গতিশীল, কত যানবাহন
একবারই সুইচ টিপলে, কে শোনে কার বারণ?
হঠাৎ ঝপাং করে, হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ে
কত প্রাণ অকালেই, যায় পরপারে?
অযুতে নিযুতে আজ, মৃত্যু হচ্ছে নিত্য
তবুও প্রভু বলেন, মৃত্যুই চিরসত্য।

গান ঃ

ভেবেছিলাম যাব কাশি/ হয়ে রব কাশিবাসী
কামসিন্ধু নীড়ে আসি ডুবিলাম আবার
আমায় কর পার, এবার আমায় কর পার।

যমরাজ ঃ

নমঃ চামুন্ডায় নমঃ, নমঃ চামুন্ডায় নমঃ, নমঃ চামুন্ডায় নমঃ

যেমন তোমার কর্ম হবে তেমনই হবে ফল
উপার্জিত পারের কড়িটি রবে শুধু সম্বল।
রয়েছেন মহামনুষ্য শ্রীমান রামপুরী
তার ভাবনার কথাও কিছু শ্রবণ করি ।।

মনুষ্য ঃ

পিতা মাতার আশীর্বাদে, ধন্য মানব জীবন
বন্দনা করি সিদ্ধিদাতা, গণপতির চরণ।
অষ্টবসু নবগ্রহ, দশ দিকপতি
তোমাদের আশীষে হোক অগতির গতি।
দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু সনাতন গুরুদের পায়
নতমস্তক হয়ে সবাইকে প্রণতি জানাই।
ভোগ ত্যাগের মানব জীবনে আছে কিছু ব্যর্থতা
শ্রদ্ধাসহ এই দরবারে বলছি কিছু কথা।
নিয়ম নীতিতে বাধা, এই ভুবনে

অঙ্কটা মিলবে কীসে, কে বা জানে।
জীবনের অন্তিম এই লগনে
হিসাবে ব্যস্ত মন, সংগোপনে।।
ভিড়ে ঠাসা পৃথিবীর মঞ্চ ছেড়ে
পাড়ি দিতে হবে দূরে বহুদূরে
স্মৃতি বিজড়িত মায়া, মমতা ফেলে
বিদায় মননে, নিজেকে মুক্ত করে ।।

ভাল মন্দের সব হিসাব শেষে
যমরাজের মর্ত্যে আগমন ঘিরে
চঞ্চলতায় উদ্বিগ্ন হয়, পার্থিব জীবন
গ্রাস করে শূন্যতা, মনে ধীরে ধীরে।।

হিসাব নিকাশে পোক্ত - চিত্রগুপ্ত
নিমেষেতে ডেকে নেয় - বিচারালয়ে।
খাতা খুলে, মিল করে অংকটা
নিঃস্ব হয়ে, যেতে হয়, যমালয়ে।।

বিবেক ঃ

নমঃ নারায়নায় নমঃ
নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ
নমঃ নারায়নায় নমঃ
দেহের আত্মা বিদেহীর পরে কালের প্রবাহে রত
স্বজন হারানো স্রোত বয়ে যাবে ফল্গু ধারার মতো।
শ্রীহরি নিজেও মানুষ রূপেতে মর্ত্যে জন্মেছেন
অবতার হয়েও সুখ দুঃখ ভোগ করে গেছেন।
তাকেও কর্ম করতে হয়েছে সত্য প্রতিষ্ঠায়
কুরু কংস রাবণ ধ্বংস তারই প্রচেষ্টায়।
আপন কর্মে উন্নিত হয়ে শাশ্বত ছবি এঁকে
তাঁর আত্মাও বিদেহী হয়েছে নশ্বর দেহ রেখে।
নমঃ নারায়নায় নমঃ
নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ
নমঃ নারায়নায় নমঃ

মনুষ্য ঃ

জন্ম হয়েছে মানুষ রূপেতে, রয়েছে মৃত্যুভয়
মানবদেহ মরণশীল, অমর কখনও নয়
কত পূজা পার্বণে সঁপে গেছি মন
তবুও জীবন বুঝি, বিফল বিকাশে
নিবেদন সমর্পণ,সব ভাবনার শেষে
কৌতুহলে প্রশ্ন করি, দেবতা সকাশে।।

যমরাজ ঃ

নমঃ চামুন্ডায় নমঃ, নমঃ চামুন্ডায় নমঃ, নমঃ চামুন্ডায় নমঃ

স্রষ্টা থেকে সৃষ্টির জীবন ভাবনা থেকেই হয়েছে সৃষ্টি
ভাবনা হল ভাবের আধার, ভাবনা থেকেই পুষ্ট কৃষ্টি।
ভুক্তভোগীরা ভাবনাতে পায় ভোগ ও ত্যাগের কামনা বাসনা
মহৎ ভাবনার আকর্ষণেই মহর্ষিদের উপাসনা।
নিত্যনতুন ভাবনা থেকেই আবিষ্কারের স্বর্গবাস,
কুচক্রীদের ভাবনা -গরলে হয় অনেকের সর্বনাশ।
ভাবনা কখনও সাগরের মতো মনের সৈকতে ঢেউ দিয়ে যায়
উপলব্ধির আলপনা দিয়ে সৃজন শিল্পী ভাষাতে সাজায়।
অনেক মানুষের প্রথম ভাবনা মরবে না তো সে কোনদিন
পঞ্চভূতের এমনই বিক্রিয়া নবীন একদিন হবেই প্রবীণ।।

মনুষ্য ঃ

আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, শাস্ত্রে উলে-খ করা
মানুষের এই দেহমন্দির পঞ্চভূতে গড়া।
ভূমি জল আকাশ বাতাস - আর আলো
এদের সমতা নিয়ে প্রাণীর জন্ম হলো।।

শিল্পী ঃ

আমায় মানুষ করো নাগো আর .....

যমরাজ ঃ

অনাচার, অবিচার, দুরাচারের ফলে
কলিযুগে প্রাণহানি অধিক অকালে
আমি শুধু আমার দেহ কেন এমন ভাবি ?
সর্বজীবেত আমি আছি পরমাত্মার অনুগামী।

যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকে প্রাণ ততক্ষণ
আত্মা ছাড়ি স্থবির দেহ নিষ্প্রাণ লক্ষণ।
যে প্রাণীতে যত থাকে শুদ্ধ দেবত্ব গুণ
সেই প্রাণীর চেতনা গর্ভে তত উন্নত ভ্রূণ।।
মন্দ ভালো কর্মের ফল আত্মা ধারণ করে
তথ্য-নথ্যি নিয়ে আসে যমরাজের দরবারে।
যারা জন্মে, খায়-ঘুমোয়, শুধু অপত্য বাড়ায়
তাদের কাছে আত্মার কথা, বহুদূরে অধরায়।।

চিত্রগুপ্ত ঃ

কালের গতিতে সকাল দুপুর সন্ধ্যার পর নিশি
অমাবস্যার কৃষ্ণপক্ষ ডিঙিয়ে পূর্ণ শশী
সৃষ্টি স্থিতি লয়ের গতিতে এমনই রুদ্ধশ্বাস
দান করে দিতেই হবে শেষ নিঃশ্বাস।

যমরাজ ঃ

আত্মার আছে অনন্ত শক্তি আনন্দময় শুদ্ধ
পঞ্চভূতের কারণও আত্মা হৃদয়কে করে হৃদ্ধ।
অজ্ঞানতাই সর্বপ্রকার সুখ ও দুঃখের কারণ
শুদ্ধ জ্ঞানের উন্মেষে হয় চেতনার জাগরণ।
একে অপরকে বুঝতে শিখলেই আত্মীয়তা বাড়ে
আত্মাকে শ্রদ্ধার অটুট বন্ধন, কে তারে ছিন্ন করে?
কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য আকাশ সমুদ্রে স্থিত
একরূপ থেকে আরেক রূপেতে, নিয়ত আবর্তিত।
মনুষ্য এই দেহরূপও তাই রূপান্তরের অধীন
কখনও শিশু, কিশোর যুবক, কখনও প্রাজ্ঞ প্রবীণ।
পুনরায় কোন নবীন দেহতে, আত্মার অবস্থান
জন্ম মৃত্যুর উর্দ্ধে আত্মা, অনন্ত - আয়ুষ্মান।

শিল্পী ঃ

তুমি অন্তিমে কান্ডারী রূপে
এসো হে দয়াল,
ত্রাণের তরী নিয়ে এসো, যশোদা দুলাল।।

বিবেক ঃ

পাপী তাপী অভাজনে
কৃপা করো দুর্যোগ ক্ষণে
ভব কান্ডারীর রূপটি ধরো
তুমি আপন করুণায় ।।
সুর বেঁধে একতারাতে, মন বাউলে গান গেয়ে যায়,
আত্মা রূপী, একটি তারে, লাটাই ঘুড়ির জীবন কাটাই।।

বিবেক ঃ

মানব দেহ তিনটি শক্তির জাগ্রত মিশ্রণ
জীবনব্যাপী চলতে থাকে দেহ মনে মন্থন।
প্রথম শক্তি মাতৃগর্ভের অঙ্কুরে অধিষ্ঠান
দ্বিতীয় শক্তি দেয় পরিবেশ, যা পঞ্চভূতের দান।
তৃতীয় শক্তি সারা জীবনের কর্ম থেকে প্রাপ্ত
ত্রিশক্তির এই ভাগ্যফল কালের গতিতে ব্যাপ্ত।
জীবনের অশান্ত খেলায়, ভেসে চলি, ভ্রান্ত ভেলায়।
থাকতে চাই প্রশান্ত দোলায়, তোমার করুণায়, প্রভু তোমার করুণায়

চিত্রগুপ্ত ঃ

আত্মা অবিকার সুক্ষ্মশক্তি অবিনাশী বায়বীয়
অদৃশ্য - জ্যোতি ব্রহ্মরূপী যুগে যুগে অনুমেয়।
দেহের আত্মা বিদেহীর পরে কালের প্রবাহে রত
স্বজন হারানো স্রোত বয়ে যাবে ফল্গু ধারার মতো।

মংলু ঃ

মানুষ আমি মংলু এখন বুলবো দুটো কথা
ভুল হবে তো ক্ষমা দিবেন লিবেন নাকো বেথা।
শক্তি ভাগ্য যত্তোই বুলেন মোর কাছে লড়বড়
ধাপার মাঠে স্বর্গ হলো, মোদের জঙ্গলেতে ঘর?
কাঠ কাইটবো মধু আইনবো তবে ভইরবেক পেট
বল-ম, লাঠি, মশাল দিখালে বাঘের মাথা হেঁট।
বাঘের সামনে ক্ষমা মাংলে লিবে না পিছুটান
ইসব গেনের কুথা শুনে দান দিবে কি প্রাণ?
মূরখ্ আমি মোরগের মত্তো বুললাম দুটো কুথা
ভুল হবে তো ক্ষমা দিবেন, লিবেন নাকো বেথা।

বিবেক ঃ

বিন্দু বিন্দু জলকণাগুলি যেমন সাগরে থাকে
জ্ঞান সাগরেও কর্মের গতি তেমনই যোজনা রাখে।

আপাত সুখের উপকরণে স্থূল হয় মন ও দেহ
অহংকারের কম্পনাঙ্কেও ধূলিস্যাৎ হয় কেহ।
আহার বিহার মিথুন নিদ্রা সবই কর্মের অংশ
অযত্ন আর অতিচারিতায় হয় জীবনের ধ্বংস।
ঈর্শাকাতর সন্দিগ্ধ শুধু, খোঁজে - অপরের খুঁত
সংশোধনের দিশারী যিনি, তিনিই অগ্রদূত।

যমরাজ ঃ

গোটা জীবনের কর্মের ফল আত্মাতে হয় স্থিত
নবীন সাম্য দেহ প্রকোষ্ঠে পুনরায় বিকশিত।
নিস্প্রাণ দেহ সৎকার হলেও আত্মা অবিনশ্বর
গুণান্বিত সুক্ষ্ম আত্মার শক্তিতে জাতিস্মর।।

চিত্রগুপ্ত ঃ

অতীতের মতো আগামী দিনেরও অনন্ত সাক্ষী সময়
জীবন চক্রের সঙ্কটকালে শ্রীহরি দেবেন অভয়।
ফেলে আসা দিনগুলির হিসাবে ব্যস্ত মন
শৈশব যৌবন ছেড়ে বার্ধক্যের আগমন
প্রতিকারে রত্ন,কবচ, কেউ বা তীর্থবাসী
চিত্রগুপ্ত যমরাজকে বলেন মর্ত্য ঘুরে আসি।

যমরাজ ঃ

কেবলমাত্র শাসনে শোষণে রাজা যদি হয় কভু
যিনি সকলের দাস হতে পারেন তিনিই যোগ্য প্রভু
ভালকর্তা যদি হতে চাও আগে হও ভালকর্মী
আত্মজ্ঞানের সন্ধানে হও অভিজ্ঞ সহমর্মী।
ধৈর্য্য মনের সেনাপতি বীর্য দেহের বল
আসল শত্রু অজ্ঞানতা, অলসতা, ছল।
জ্ঞানের ফসল ধারণ করে নতমস্তকে যিনি
সদাচারী অহংশূন্য তিনিই মহাজ্ঞানী।
কর্মগুণে মহান মানুষই হয়ে যায় ভগবান
বুদ্ধ যিশু কৃষ্ণ রাম যুগে যুগেই প্রমাণ।

চিত্রগুপ্ত ও যমরাজ ঃ

এমনি করেই যুগ যুগ ধরে জীবের কর্মকথা
চিত্রগুপ্ত যম - দরবারে লিখে রাখবেন খাতা।।

ঠিকানা - ফ্ল্যাটবাড়ি

বিপ-বেন্দু বিশ্বাস

নিতাইয়ের বাবা চন্দ্রকান্তবাবু পার্টিশনের পর এদেশে এসে চাকদহ শহরের উপর কাঠা দশেক জমি কিনে সেখানে থাকার মত করে ছোটখাটো দুখানা বেডরুম। রান্নাঘর, টয়লেটসহ ছোট একটু বারান্দা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু এদেশে এসে অন্য তেমন কোন সুবিধাজনক কাজ জোগাড় করতে না পেরে রাণাঘাট কোর্টে নিয়ে মুহুরিগিরি করতেন এবং কোন রকমভাবে সংসার চালাতেন।

বড় ছেলে নিতাই যখন কলেজে ভর্তি হয়েছে সেই সময় চন্দ্রকান্তবাবু একদিন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আর ঠিক এর এক বছর পর তিনদিনের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান নিতাইয়ের মা কুসুমবালাদেবী। সেই সময় থেকে ওরা দুইভাই বিশেষ করে নিতাইকে বেশ ষ্ট্রাগেল করতে হয়েছিল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য।

নিতাই প্রথম দিকে বেশ ষ্ট্রাগেল করলেও পরবর্তীতে আধা সরকারী কেন্দ্রীয় এক সংস্থায় চাকরি পেয়ে যায় এবং নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে চাকরি করতে থাকে। নিতাইয়ের ছোটভাই পরেশ এরও অনেক পরে চাকরি পায় এবং পোস্টিং নিয়ে এসে দিলি-তেই পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে থাকে।

নিতাইয়ের স্ত্রী নন্দিতাদেবী ছোট ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে প্রথমদিকে কয়েক বছর নিতাইদের পৈত্রিক বাড়ি চাকদহতে বসবাস করলেও মেয়েদের ভালভাবে পড়াশুনা করানোর জন্য দমদমে চলে এসে একটি ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। সেই সময় থেকে চাকদহের বাড়ি তালা বন্ধই থাকত। মাঝে মাঝে নন্দিতাদেবী সকালের দিকে এসে সারাদিন থেকে আবার সন্ধ্যার ট্রেন ধরে দমদমের বাসায় ফিরে আসতেন রাত্রে মেয়েদের সঙ্গে থাকবার জন্য।

ধীরে ধীরে দুই মেয়ে বড় হয়ে ওঠে। নিতাইয়ের সংসারের খরচ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখতে দেখতে নিতাইয়েরও ষাট বছর হয়ে যায়। চাকরি শেষ করে পৈত্রিক বাড়ি চাকদহতে ফিরে আসে নিতাই এবং একা একাই বাস করতে থাকে এই বাড়িতে। ওর পরিবার রয়ে যায় দমদমের ভাড়া করা ফ্ল্যাটবাড়িতে।

চাকরি শেষ হয়ে গেলেও নিতাই কোন পেনশন বেনিফিট পেল না। ফলে অবসর গ্রহণবাবদ সামান্য যে কয় টাকা নগদ পেয়েছিল অফিস থেকে সেগুলো ব্যাঙ্কে রেখে যা সুদ পেত তার উপর ভিত্তি করে দুই জায়গার দুই দুটো সংসার খরচ চালাচ্ছিল।

বড় মেয়ের লেখাপড়া এদিকে শেষ হয়ে গেলে হঠাৎ করে একটা ভাল ছেলের খোঁজ পায়। সেই সম্বন্ধ নিতাই হাতছাড়া না করে বিয়ে ঠিক করে ফেলে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় বিয়ের এতগুলো টাকা একসঙ্গে জোগাড় করতে যেয়ে। নন্দিতাদেবী বুদ্ধি দেন ওদের অংশের থেকে বাড়ির জমি কিছুটা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। কথাটা নিতাইয়ের মনে ধরে এবং যেহেতু দুই ভাইয়ের যৌথ সম্পত্তি সেইজন্য ছোটভাই পরেশকে ফোন করে সব

ঘটনা জানিয়ে দেয়।

পরেশের স্ত্রী সুশীলাদেবী ছিলেন অত্যন্ত চালাক। সে পরেশের সাথে আলোচনা করে জানায় যে প্রথমেই দুই অংশ পার্টিশন ডিড্ করে নিতে হবে। বাধ্য হয়ে নিতাই সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় এবং দুই ভাইয়ের জমি সমান দুইভাগে রেজিষ্ট্রি হয়ে যাওয়ার পর নিতাই ওর অংশ থেকে দেড় কাঠা জমি বোকাবাবু নামে একজন বড় ধরণের ব্যবসায় লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকায় বড় মেয়ের বিয়ের কাজ শেষ করে।

নিতাই যে ভদ্রলোকের কাছে ওর নিজের অংশের জমি বিক্রি করেছিল তিনি নামে বোকাবাবু হলে কি হবে, তিনি নিজের যেকোন কাজের বেলায় অন্যসকলকে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেন। তাঁর ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল এতটাই প্রখর যেটা পরে নিতাই টের পেয়েছিল হাড়ে হাড়ে।

বোকাবাবু নিতাইয়ের কাছ থেকে ঐ সামান্য অংশ জমি কিনে নিয়ে প্রথমে চুপচাপ রইলেন এবং নিতাইয়ের মেয়ের বিয়েতে যখন ওর ভাই পরেশ এবং পরেশের স্ত্রী সুশীলাদেবী ওদের চাকদহের বাড়িতে এল তখন হরিচরণ নামে নিতাইয়ের ছোট বেলার এক বন্ধুর সহায়তায় অতি গোপনে পরেশ এবং পরেশের স্ত্রী সুশীলা দেবীর সাথে যোগাযোগ করে নেয়।

সুশীলাদেবীও ঠিক এই রকম একজন ক্রেতাকে মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এ যেন তাঁর কাছে মেঘ না চাইতেই জল এমন একটা সুযোগ চলে এলো, আজ এমন সুযোগ সুশীলাদেবী কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তাই বিয়ে বাড়ির পরিবেশের মধ্যে এই প্রসঙ্গে আলোচনা না বাড়িয়ে উভয়ে উভয়ের মোবাইল নম্বর দিয়ে রাখলেন পরবর্তী সময়ে ধীরে সুস্থে বসে এই ব্যাপারে কথা বলে নেওয়ার জন্য। আর হরিচরণকে দায়িত্ব দেওয়া হল দুই পক্ষকে সহায়তা করার জন্য। দুইপক্ষই অব্যশ হরিচরণকে কথা দিয়ে রাখলো ওকে ওরা খুশী করে দেবেন।

মেয়ের বিয়েতে ব্যস্ত থাকার দরুণ নিতাই এতসব পরিকল্পনার কথা কিছুই জানতে পারলো না সেই মুহূর্তে।

হরিচরণ বরাবরই একটু ডাকাবুকো এবং ধান্দাবাজ ধরণের ছেলে ছিল। এলাকায় বড় বড় মস্তানদের সাথে বরাবরই হরিচরণের বেশ দহরম মহরম ছিল। কাঁচা টাকার লোভ সামলাতে না পেরে নিতাইয়ের সাথে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে ওদের হয়ে কাজ করতে লাগল।

পরে যখন সব ব্যাপার নিতাই জানতে পারে ততদিনে পুরো ব্যাপারটাই ওর হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। মাঝখান থেকে হরিচরণের সাথে নিতাইয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়।

বোকাবাবু এরপর এক সকালে এসে নিতাইবাবু ও নিতাইবাবু বলে জোরে জোরে ডাকতে শুরু করে দেয়।

নিতাই ঘরে একাই শুয়ে ছিল। বোকাবাবুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে দাঁড়ায়। নিতাই দেখে বোকাবাবু বেশ কয়েকজন লোক সঙ্গে করে এনে সামনে দাঁড়িয়ে

রয়েছেন।

নিতাই প্রশ্ন করে বোকাবাবুকে, সাত সকালে এসে এভাবে ঘুম ভাঙিয়ে ডাকলেন কেন?

বোকাবাবু জানায়, গতকাল আপনার ভাইয়ের পুরো অংশের জমি আমি কিনে নিয়েছি। আমার সীমানায় আমি এখন পাঁচিল তুলবো। আপনার প্রবেশপথ যেখানে রয়েছে সেটা এখন আমার মধ্যে। আগামী পনেরো দিনের মধ্যে আপনার যা যা করনীয় রয়েছে আপনি সেইগুলো ঠিক করে নিন। দুই সপ্তাহ পরে আমি দেওয়াল তুলে দেবো। আপনি যদি এরমধ্যে আপনার ঘরে ঢোকার পথ বা অন্যান্য যা ভাঙাচুরার কাজ না করাতে পারেন তারজন্য আমাকে তখন কিছু বলতে আসবেন না।

এই কথাগুলো শোনার পর নিতাইয়ের ভিরমি খাওয়ার মত তখন অবস্থা। পকেট থেকে মোবাইল বের করে ছোটভাই পরেশকে সব ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করে।

পরেশ বলে, হ্যাঁ, আমি আমার সম্পত্তি বোকাবাবুকে বিক্রি করে দিয়েছি গতকাল।

এরপর নিতাই মোবাইল অফ্ করে পকেটে ঢুকিয়ে দেয় এবং বাধ্য হয়েই বোকাবাবুকে অনুরোধ করে বলে, এগুলো ভেঙে ফেলে নতুন করে তৈরী করাতে গেলে প্রচুর খরচ। জানেন তো এই সবে বড় মেয়েকে বিয়ে দিলাম। হাতফাত এই মুহূর্তে পুরো খালি। আপনি যখন কিনেই নিয়েছেন তখন আমাকে আমার মত করে কিছু তো একটা করতেই হবে। তা আপনি যদি আমাকে মাস তিনেক সময় দেন বাড়িয়ে তাহলে কোনমতে কিছু একটা করে নিতে পারবো। এতো অল্প সময়ে আমি কিছু করে উঠতে পারব না।

- না, আপনার ঐ দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনার গল্প আমি মানতে পারবনা। আপনার ভাইয়ের জমি পুরোটা আমি কিনে নিয়েছি। এখন এই জমির মালিক আমি। দুই সপ্তাহের বেশী সময় আমি কিছুতেই দেবনা আপনাকে, বলেন বোকাবাবু।

কিন্তু এই মুহূর্তে ভাঙাচোরা করার মত এতগুলো টাকা আমার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়, বলে নিতাই।

তাহলে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার আর্থিক সঙ্গতি নেই সেক্ষেত্রে আপনার নিজের বাকি যে অংশটা রয়েছে সেই অংশটাও আমাকে বিক্রি করে দিন, আমি কিনে নিচ্ছি। বলুন, কতটাকা হলে বিক্রি করবনে আপনি ? বলেন বোকাবাবু।

এই কথাটা শোনার পর সত্যি সত্যিই নিতাই হতবাক হয়ে যায়। এমন একটা প্রস্তাব যে নিতাই পাবে তা বোধহয় ও স্বপ্নেও ভাবেনি। নিতাই বলে, এ আপনি কি ধরণের কথা বলছেন? আপনি কি আমাকে ভিটেছাড়া করানোর কথা বলছেন? বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে আমি নিজে কোথায় গিয়ে থাকবো?

কেন? আপনার তো দমদমে ফ্ল্যাট রয়েছে একখানা, সেখানে গিয়ে বৌ মেয়েদের সাথে একসঙ্গে থাকবেন। বরং এতে আপনার সুবিধাই হবে। একসঙ্গে বেশ কিছু নগদ টাকা পেয়ে যাচ্ছেন, সকলে এক ছাদের তলায় একসঙ্গে থাকতে পারছেন এবং সব চাইতে বড় কথা আপনার সংসারের মাসে মাসে খরচ করার টাকাও অনেক বেঁচে যাবে দেখবেন, শোনায় বোকাবাবু।

থাক, আপানকে আর আমাকে হিতোপদেশ দিতে হবে না, বলে নিতাই।

যাক্‌গে। সে আপনার নিজস্ব ব্যাপার। আমার কথা হচ্ছে হয় আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনি আমার কথামত ব্যবস্তা নিন, নয়তো এক হাতে নগদ টাকা নিয়ে অন্য হাতে জমিটা আমাকে দলিল করে দিন। এই আমার আপনাকে শেষ কথা জানিয়ে দিয়ে গেলাম বলে, দলবল নিয়ে সেই মুহূর্তে চলে গেলেন বোকাবাবু।

এরপর নিতাই চিন্তাভাবনা করে কোন সুরাহা না করতে পেরে শেষমেষ স্থানীয় মাতব্বরদের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানিয়ে আসে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। স্থানীয় মাতব্বরেরা উভয়পক্ষকে নিয়ে একদিন আলোচনায় বসে এবং শেষ পর্যন্ত বোকাবাবুর দেওয়া প্রস্তাবই নিতাইকে সকলে মেনে নিতে বলেন। নিতাইয়ের তখন আর বুঝতে কিছু বাকি থাকল না যে ইনারা সকলেই বোকাবাবুর কাছে বিক্রি হয়ে গেছেন।

দিন তিনেক পর একদিন বিকেলবেলা জনা পাঁচেক মস্তানমতন লোক মোটর সাইকেলে এসে নিতাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কি সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি? বোকাদার দেওয়া প্রস্তাবখানা মেনে নিচ্ছেন তো! এরপর ওরা একটা নির্দিষ্ট তারিখ উলে-খ করে বলে ঐ দিন অবশ্যই আপনি চাকদহসাব রেজিষ্টারের অফিসে চলে আসবেন কারণ ঐ দিনেই আপনার জমির দলিল রেজিষ্ট্রি হবে। কথাটা মনে থাকে যেন বলে ওরা মোটরসাইকেল স্টার্ট দিয়ে উধাও হয়ে যয়।

ওরা চলে গেলেও দুশ্চিন্তা এবার নিতাইকে গ্রাস করলো। নিতাই ভাবতে লাগল ঘরে এখনো একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা রয়েছে তাঁর। এমতাবস্থায় এদের সাথে লড়াই করবে কিভাবে? এরা যে ধরণের লোক তাতে করে যে কোন সময় যেকোন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। আর তাছাড়া ওর নিজের লোক বলতে তেমন কেউ নেই যাঁরা ওর এমন বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। এমনকি কোন রকম পয়সার জোরও নেই যে ওদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবে। একদিকে নিজের ছোটভাই যা সর্বনাশ ঘটানোর ছিল সেটা করে দেখিয়েছে। উপরন্তু ঘাড়ের উপর এখন এসে হাজির হয়েছে বোকাবাবু আর তারসঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দিয়ে যাচ্ছে ঐ সকল মস্তানদের দোরে পাঠিয়ে এককালের পুরানোবন্ধু হরিচরণ। অথচ এই ছোটভাই পরেশকে একসময় এত কষ্ট করে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিউশন পড়িয়ে লোখাপড়া শিখিয়েছি, বড় করেছি। যদিও আজ সে কথা ভেবে মনকে কষ্ট দিয়ে কোন লাভ নেই, এই কথা মনে করে নিজের মনকে শান্ত্বনা দিতে চায় নিতাই।

এরপর রেজিষ্ট্রি করার নির্দিষ্ট দিনে বোকাবাবু একদল মস্তান পাঠিয়ে নিতাইকে একপ্রকার জোর করেই তুলে নিয়ে আসে রেজিষ্ট্রি অফিসে। সেখানে এনে কোমরে পিস্তল ঠেকিয়ে ধরে জোর করেই যেখানে যেখানে সই সাবুদ করা দরকার। সেইগুলো সব ঠিকঠাক মত করিয়ে নেয় এবং জমির উপযুক্ত দামের চাইতে অনেক কম দাম দিয়ে নিতাইয়ের কাছ থেকে জমির দলিল করিয়ে নেয়। নিতাই হাতে পাওয়া টাকার বান্ডিলগুলো একটা ব্যাগের মধ্যে যখন রাখছে তখন বোকাবাবু নিতাইকে বলেন, অতটা অকৃতজ্ঞ আমাকে ভাববেন না। আপনার জমি নেবো আর দাম দেবো না সেরকম মানসিকতার লোক আমি নই। আসলে আপনার এই জমিটা আমর ব্যবসাটাকে আর একটু বাড়াবার জন্য খুব প্রয়োজন ছিল। তাই

তার হাতছাড়া করলাম না। দেখবেন ভগবান নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল করবেন। আমি আবার একটু ঈশ্বরে ভক্তি টক্তি করিতো, এ যা একটু দোষ আমার। জ্ঞানতো আমি কোন অন্যায় কাজ করিনা। সবই মায়ের ইচ্ছা। তিনার অসীম করুণা। তিনার দয়াতেই আমার যেটুকু যা হয়েছে। অনেক কথা বলে ফেললুম। কিছু মনে করবেন না, বরং চলুন দোকানে পেট ভরে মিষ্টি খাবেন আজ। আমার মনটা আজ ভীষণ খুশি আপনার একটু উপকারে লাগাতে পেরে নিজেকে বলেন বোকাবাবু।

নিতাই কোনরকম তিক্ততা না বাড়িয়ে বলে, না। আজ থাক, আমার হাতে আর সময় নেই। আমাকে এক্ষুনি ট্রেন ধরতে হবে।

আচ্ছা তাহলে আপনাকে আর দেরী করাবো না। তবে আপনার নেমন্তন্ন রইল। অন্য যেকোন একদিন আমার ওখানে এসে মিষ্টি খেয়ে যাবেন অবশ্যই, বলেন বোকাবাবু।

নিতাই একটা রিকসায় উঠে সোজা চলে আসে চাকদহ রেল ষ্টেশনের ডাউন প-াটফর্মে। এক্ষুনি যে ট্রেন আসবে সেই ট্রেনে চেপেই সোজা চলে আসতে হবে বৌ মেয়ের কাছে ভাড়া করা ঐ ফ্ল্যাটবাড়িতে। বোকাবাবুতো সেদিন এই প্রস্তাবই দিয়েছিলেন, নিতাইয়ের মনে পড়ে যায় ট্রেনে যেতে যেতে।

এতক্ষণে অনুভব করে নিতাই যে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য এইরকম একটি নাম ওর জন্য বেশ মানানসই হয়েছে। বোকাবাবু ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ আপনার সৌজন্যতাবোধ দেখানোর জন্য। এই যে যেক'টাকা পাওয়া গেছে হাতে সেইটাকা না পেলেও আমারতো কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, আপনাকে তারজন্যই ধন্যবাদ, মনে মনে বলে নিতাই।

ট্রেন দমদম ষ্টেশনে এসে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে ট্রেন থেকে নেমে আসে নিতাই। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করে ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য। এখন থেকে তো ওর ঠিকানা হবে দমদমের এই ফ্ল্যাটবাড়ি।

যে ইতিহাস পাঠ্যক্রমে ব্রাত্য

বীথি সরকার

সহকারী অধ্যাপিকা (গান্ধী সেন্টিন্যারী বিটি কলেজ) হাবড়া।

বিজ্ঞানের প্রাথমিক শর্ত হল তার নৈর্ব্যক্তিকতা। ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞান। কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজে যে ইতিহাস পড়ানো হয় তা কতটা নৈর্ব্যক্তিক? আমাদের ইতিহাসবিদরা কতটা প্রত্যক্ষবাদী ও পক্ষপাতশূন্য? আজ ইতিহাসবিদদের সুনিপূণ অস্ত্রোপচারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অনেক সত্যই পাঠ্যক্রম থেকে ছেঁটে বাদ হয়ে গেছে - সময়রেখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে চিরদিনের মত।

নিজ অস্তিত্ব ও বাসভূমির অধিকার রক্ষার জন্য বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে ভীল ও সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস আমরা পড়েছি। ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে গর্বের সাথে তা ছাপা হয়েছে। সে ইতিহাস সত্যিই গৌরবের কারণ তা প্রমাণ করে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লড়াই ছিল সর্বসাধারণের; বর্ণহিন্দু,শিক্ষিত, শহুরে ও বুদ্ধিজীবি থেকে শুরু করে জঙ্গলবাসী, অসভ্য, অশিক্ষিত উপজাতি সহ আপামর ভারতবাসীর কাছেই ব্রিটিশ অপশাসনের অবসান ছিল সাধারণ লক্ষ্য। কিন্তু এর পাশাপাশি ভারতে যে আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ সমাজ ইতিহাস ছিল, পাঠ্যবই-এর ইতিহাস তাকে অতি সযত্নে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ভারতবর্ষে দু'হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে চলে আসা 'বর্ণাশ্রম' বা 'জাতিভেদ' নামের ভয়ঙ্কর ও চরম বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে শোষিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত দলিতগোষ্ঠীর প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সেই ইতিহাসের কথা আমরা কজনই বা জানি! সাধারণ পাঠ্যক্রমে কোথাও কখনও তা উলি-খিত হয়নি। না, গুরুত্ব কম বলে সেই ইতিহাস উলি-খিত হয়নি বিষয়টি এমন নয়; বরং এর গুরুত্ব অনেক গভীরে বলেই তাকে চতুরতা ও দুরদর্শিতার সাথে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে কারণ সে ইতিহাস প্রকাশ পেলে যে ভীষণ বিপদ! দেশের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা যে বাঁধাধরা মসৃণ ছকে চলছে সেই ছক তো তাহলে নড়ে যেতে পারে! রাজনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের সম্পদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার আছে বলে যারা হাজার হাজার বছর ধরে মনে করে আসছেন এবং যারা তাদের সেই অধিকারকে ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার হিসাবে সর্বসাধারণের মনে বিশ্বাস বদ্ধমূল করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাদ ও তৃপ্তি উপভোগ করে আসছেন, কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা কোনো বাস্তব সত্য যদি তাদের সেই স্বতঃসিদ্ধ অধিকারকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় তাহলে সেই সত্যকে সর্বসমক্ষে আসতে দেওয়া তো বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার! ইতিহাসবিদরা সেই ভুঁকি নেবেন কেন! যে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা নিয়ে রাষ্ট্রের এত গৌরব, সে গৌরব তো তাহলে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে! সব চেয়ে বড় কথা, তাদের নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাই ইতিহাস তৈরী করতে হয়েছে খুব সতর্কভাবে, চালুনি দিয়ে ছেঁকে, সুবিধা-অসুবিধা বাছাই করে।

১লা জানুয়ারী, ১৮১৮। আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগের কথা। বিশ্ব জুড়ে

সেদিন নববর্ষ উদ্‌যাপনের ব্যস্ততা ও উচ্ছ্বাস। বিশ্ববাসী সেদিন নাচ-গান-আনন্দ-উল-াসে মগ্ন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের পাঁচশ মাহার সেনার কাছে দিনটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম - উত্তেজনায় টানটান - অপমান আর অসম্মানের আগুনে তাদের গরম তাজা রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে। চলছে যুদ্ধযাত্রার অন্তিম পর্যায়ের প্রস্তুতি। কেই বা জানত যে, এই যুদ্ধই হবে ব্রাহ্মণ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর ভাগ্য নিয়ন্তা! এ যুদ্ধ কিন্তু আর পাঁচটা সাধারণ যুদ্ধের মত ছিল না - এ যুদ্ধ ছিল আত্মসম্মান ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ, যুগযুগ ধরে চলে আসা মনুস্মৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর যুদ্ধ।

মহারাষ্ট্রে 'মাহার' জাতি ছিল ভারতের তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিগুলির মধ্যে একটি জাতি। শিক্ষা, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের অধিকার থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বঞ্চিত, চরম বর্ণ-বৈষম্যের শিকার মাহারদের কোন বিশেষ কাজে দক্ষতা অর্জনের বা প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ না থাকায় তাঁদের নির্দিষ্ট কোন বৃত্তি ছিল না। গ্রামের চৌকিদার ও ঝাড়ুদারের কাজ, মৃত জীবজন্তু সরানো ও সেগুলির চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করা, রাজকর্মচারীদের ভৃত্যের কাজ প্রভৃতি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁদের পরিষেবা গ্রামবাসীদের জন্য অপরিহার্য থাকলেও তাঁরা ছিলেন গ্রামে সর্বনিম্ন সামাজিক - মর্যাদাভোগকারী। শিবাজীর শাসনকালে মাহারদের সামাজিক অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন হয়। কূটনৈতিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন মারাঠা ভীর উপলব্ধি করেছিলেন যে, শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠনের জন্য প্রত্যেককে তার যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত স্থান দেওয়া প্রয়োজন। সমাজের সকল সম্প্রদায় ও বর্ণের সেনার সংমিশ্রণে তিনি তার নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। সতর্কদৃষ্টি, নির্ভীক, দৃঢ়চেতা, নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত, সৎ ও অনুগত মাহারদের তিনি দূর্গ পাহারার কাজে নিযুক্ত করেন। পার্বত্য-দূর্গের পাদদেশ থেকে জঙ্গলের দিকে কড়া নজর রাখা এবং শত্রুর আগমন সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা জানানো ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। এই প্রহরীর কাজের অভিজ্ঞতাই হয়তো মাহারদের তাঁদের নিজ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল যা পরবর্তীকালে তাদের ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে যোগদানের উৎসাহ এবং প্রেরণা যুগিয়েছিল।

শুরুতে মহারাষ্ট্রে পেশোয়ারা ছিলেন সম্রাটের উচ্চ মন্ত্রণালয়ের সদস্য। শিবাজী তাঁর আটজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত মন্ত্রীসভা 'অষ্টপ্রধান' এর প্রধান হিসাবে পেশোয়া মোরোপান্ত পিঙ্গলকে নিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে মহারাষ্ট্রে পেশোয়ারা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন এবং বংশানুক্রমে তারা সেই ক্ষমতা ভোগ করতে থাকেন।

উনবিংশ শতকের গোড়ার কথা। মহারাষ্ট্রের শাসনভার তখন শিবাজী পৌত্র শাহুজীর হাতে ন্যস্ত; পেশোয়ারা তখন চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং রাজ্যের শাসনকার্যকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে ফেলেছেন। এই সময় মাহাররা অতি জঘন্য ও কদর্য সামাজিক বৈষম্যের শিকার হন এবং তাদের যাবতীয় উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যায়। পেশোয়াদের অত্যাচারে তাদের জীবনযাপন ভয়াবহ ও চরম শোচনীয় হয়ে ওঠে। পেশোয়ারা মাহার প্রজাদের মার্শাল আইন প্রয়োগ করতে শুরু করেন। পথে চলার সময় তাদের পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া ধূলো আর নিষ্ঠাবান পাছে পথ অশুদ্ধ বা অপবিত্র করে ফেলে সে জন্য

মাহারদের কোমরের পেছনে ঝাড়ু বেঁধে আর গলায় মাটির পাত্র ঝুলিয়ে পথ চলতে বাধ্য করা হত। অস্পৃশ্যতার বিধি কোনও প্রকারে লঙ্ঘিত হলে সেজন্য তাদের চরম দন্ড পেতে হত। সামাজিক অসম্মান ও শারীরিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ মাহারদের মনে বিদ্রোহের আগুন দানা বাঁধতে থাকে।

মাহারদের প্রতি পেশোয়াদের ঘৃণ্য আচরণের পেছনেএকটি ঐতিহাসিক কারণও ছিল। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক নাগবংশীয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে হিন্দু ব্রাহ্মণরা সমাজে তাদের উচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন, উপরন্তু উদ্ধত আচরণের জন্য সম্রাটের ভর্ৎসনারও শিকার হন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পেশোয়ারা নাগবংশীয় মাহারদের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন। একদিকে পেশোয়াদের নিপীড়নে অতিষ্ট মাহাররা তাদের হৃত প্রতিষ্ঠা আর গৌরব ফিরে পাবার জন্য মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে ইংরেজরা ভারতে নিজেদের শাসন কায়েম করতে বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে চার হয়ে গেল। সুঠাম, শক্তিশালী, নির্ভীক, পরাক্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও মানসিক স্থৈর্য্য সম্পন্ন মাহাররা ইংরেজদের নজরে পড়ে গেলেন। মাহারদের জন্য তারা তাদের দেশীয় পদাতিক সেনাবাহিনী 'বম্বে নেটিভ লাইট ইনফ্যান্ট্রি'-এর দরজা খুলে দিল। মাহাররা সেখান থেকে ফৌজি প্রশিক্ষণ লাভ করলেন।

মহারাষ্ট্রে ব্রিটিশরাজ কায়েম করাই ছিল ইংরেজদের লক্ষ্য। তারা পেশোয়াদের আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। এই সংবাদ পৌঁছে গেল দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি মাহার সর্দারের কাছে। সংবাদ পেয়েই মাহার সর্দার পেশোয়াদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সর্দার তাঁদের কাছে আর্জি জানালেন যে, পেশোয়ারা চাইলে মাহার সেনারা তাঁদের হয়েই ইংরেজদের সাথে লড়াই করে তাঁদের মহারাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করতে পারে কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁরা সমাজে তাঁদের ন্যায্য মর্যাদা ও সম্মান ফিরে পেতে চান। কিন্তু দাম্ভিক ও অহংকারী পেশোয়ারা তুচ্ছ মাহার - সর্দারের স্পর্ধাপূর্ণ দাবী নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁকে জানালেন যে, সুঁচের আগায় যেটুকু মাটি ওঠে সেটুকু সামাজিক সম্মানও তাঁরা পাবেন না। তাঁরা যেমন পেশোয়াদের পায়ের ধূলো হয়ে আছে তেমনই থাকবেন। তাদের সামাজিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হবেনা। বর্ণাশ্রম প্রথায় মাহারদের জন্য অস্পৃশ্যতার যে বিধান রয়েছে তা একই রকম অপরিবর্তিত থাকবে। তাদের এই মতামত শুনে মাহার সর্দারের রক্তে আগুন লেগে যায়। তিনিও প্রত্যুত্তরে পেশোয়াদের তার চরম সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। তিনি বললেন যে, মহারাষ্ট্রের মাটিতে তাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। এতদিন ধরে নিজভূমে পরবাসী হয়ে তারা পেশোয়াদের অনেক অত্যাচার সয়েছেন কিন্তু আর নয়, তাঁদের মাটি মায়ের অপমান তাঁরা আর সহ্য করবে না। ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করা কোন পাপ নয়। তাঁরা ইংরেজদের পক্ষ নিয়েই পেশোয়াদের বিরুদ্ধে লড়বেন। এই ছিল মাহার সেনাপতির যুদ্ধ প্রারম্ভিক অন্তিম ঘোষণা। আত্মসম্মানের সাথে বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত মাহাররা যুদ্ধের পথই বেছে নিতে বাধ্য হলেন। মাহার সম্প্রদায়ের প্রতি যুগযুগ ধরে চলে আসা অসম্মান আর অপমানের বদলা নেবার জন্য মাহার সেনারা 'বম্বে নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি'-এর অঙ্গ হয়েই পেশোয়াদের যুদ্ধে আহ্বান করলেন আর সেই সঙ্গে আধুনিক ভারতে সাম্যবাদী সমাজ

স্থাপনের দিকে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ পড়ল। ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর এই মাহার সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি হল, মানুষের সহনশীলতা যখন সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই ক্রান্তির জন্ম হয়।

কোরেগাঁও। মহারাষ্ট্রের পুনা জেলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ভীমা নদীর তীরে একটি ছোট্ট গ্রাম। ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস স্টাটনের নেতৃত্বে 'বম্বে নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি'-এর দু'শ ঘোড়-সওয়ার ও পাঁচশ পদাতিক মাহার সেনা শিরুর থেকে পঁচিশ মাইল পথ অবিশ্রান্ত ভাবে পায়ে হেঁটে ১৮১৮ সালের ১লা জানুয়ারী সকালে কোরেগাঁও এসে পৌঁছালেন। ঐ বারো ঘন্টার সুদীর্ঘ যাত্রাপথে তারা জল পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। স্টটনের ক্লান্ত অনাহারী সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হল পেশোয়াদের আঠাশ হাজারেরও বেশি পদাতিক সেনা ও তিন হাজার অশ্ববাহিনীর। যুদ্ধ শুরু হল। একদিন ও একরাত অবিশ্রান্ত ভাবে চলল এই যুদ্ধ। দেখতে দেখতে মাত্র পাঁচশ মাহার সেনার সামনে পেশোয়াদের বিশাল সেনাবাহিনী ধূলোয় মিশে গেল। সেদিন সারা বিশ্ব লড়াই এর ময়দানে মাহার সেনাদের অসাধারণ ক্ষমতা ও বীরত্বের সাক্ষী হয়ে রইল। মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন, কষ্টসহিষ্ণু, নির্ভীক ও বীর মাহারদের গৌরবে ইতিহাস গৌরবান্বিত হল। যুদ্ধে শহীদ হওয়া মাহার সেনাদের সৌর্য্যগাঁথা বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে রইল।

ব্রিটিশরা তাদের যুদ্ধ জয়ের স্মারক হিসাবে কোরেগাঁওয়ে পঁচাত্তর ফুট দীর্ঘ একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করে। আজও সেই স্তম্ভ মাথা উঁচু করে যুদ্ধে নিহত বাইশজন মাহার সেনার সাহসিকতা ও বীরত্ব সদর্পে ঘোষণা করছে। ডঃ আম্বেদকর প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী কোরেগাঁও-এর ওই বিজয় স্তম্ভে সেই বীর সেনাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে যেতেন।

তিনটি বিশেষ কারণে ভীমা কোরেগাঁওয়ের এই যুদ্ধ ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র তাৎপর্য বহন করে। প্রথমতঃ এই যুদ্ধের অনতিপূর্বে পুনা অভিযানে মহারাজ যশোবন্ত রাও হলকারের মোকাবিলা করতে ব্রিটিশদের বেশ বেগ পেড়ে হয়েছিল। তাই, এত নগন্য সংখ্যক সেনাবল নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পেশোয়াদের সম্মুখীন হবার বিষয়ে তাদের যথেষ্ট উদ্বেগ ও আশঙ্কা ছিল। মাহারদের মনোবল, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্মনিষ্ঠা ও বীরত্বের প্রতি গভীর আস্থাই ছিল এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের একমাত্র সম্বল। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের সমাপ্তির সাথেই পেশোয়া শাসনের অবসান ঘটে। তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল, এই যুদ্ধ ছিল ভারতে দু'হাজার বছরেরও বেশী সময়ের শেকড় বিস্তার করা ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিপীড়িত ও অস্পৃশ্য দলিতগোষ্ঠীর এক শক্তিশালী জেহাদ, যুগযুগ ধরে চলে আসা অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার কঠিন শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার এক চরম দুঃসাহসী প্রচেষ্টা।

পেশোয়া ইংরেজ যুদ্ধের কথা আমরা আমাদের ইতিহাসের পাঠ্যবইতে পাঠ করেছি। কিন্তু সে যুদ্ধের যোদ্ধা নায়ক বীর মাহারদের কথা 'শূন্য পাঠ্যক্রম' হয়েই থেকে গেছে। দেশবাসীদের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদেশীশক্তির সাথে হাত মেলানো হয়তো আজ আমাদের চোখে দেশদ্রোহিতা। আসলে আমাদের সমাজে শিক্ষিত বুদ্দিজীবিরা যখন কোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেন তখন সেই আন্দোলনকে আমরা সমীহ করে 'সংস্কার-আন্দোলন' বলি অথচ এই সমস্যার প্রকৃত শিকার যারা, তারা যখন স্ব মর্যাদা ও নিজ অস্তিত্ব রক্ষার

জন্য প্রতিবাদ করেন বা হিংসার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন তখন তা ঘৃণ্য 'দেশদ্রোহিতা'-রই আখ্যা পায়।

সবশেষে বলতে হয় যে, শুধুমাত্র উপগ্রহ চিত্র দিয়ে সব ঐতিহাসিক ঘটনাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ইতিহাসকে যদি সত্যই সমাজবিজ্ঞান হয়ে উঠতে হয় তবে সমাজের আণুবীক্ষণিক বিশে-ষণ প্রয়োজন। আশার কথা এই, আন্তর্জালের দৌলতে জেন ওয়াই প্রজন্মের পাঠ্যক্রম আজ পাঠ্যপুস্তকের সীমা ছাড়িয়ে অসীমে বিস্তৃত হয়েছে। সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলি আমাদের নিছক আনন্দ দানই করে না, অনেক হারানো তথ্য লুকানো সত্যকে উদঘাটিত করার প্রেষণাও সৃষ্টি করে।

তথ্যসূত্র ঃ

http://www.countercurrents,org/attri010110.htm visited on 04.01.16 at 12.50 pm.

http://www.ambedkar.org/research/The%20Movement.htm visited on 04.01.16 at 13.04 pm.

https://enwikipedia.org/wiki/Battle_of_Koregaon visited on 04.01.16 at 13.24 pm.

https://dr.ambedkarbooks.com/2011/12/30/the-battle-of-bhima-koregaon/ visited on 06.01.16 at 23.28 pm.

https://scroll.in/article/801298/why-lakhs-of-people-celebrate-the-british-victory-ove-the-marath visited on 06.01.16 at 22.12 pm.

http://www.1shodh.com/article/bhima-koregaon-history.php visited on 07.01.16 at 14.33 pm.

গঠনশৈলীর আলোকে ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’

অনিকেত মহাপাত্র

সাহিত্যিক শহিদুল জহির (১৯৫০-২০০৮) বাংলাদেশে মোটামুটি চর্চিত হলেও এ বাংলায় ততটা নয়। কিন্তু তাঁর লেখনী পাঠককে বিস্মিত করে। পূর্ণ মনোযোগ দাবী করে নচেৎ উপন্যাসের গতির সঙ্গে তাল রেখে এগোনো যায় না। তাঁর ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ (১৯৮৮) উপন্যাসটি প্রতিনিধিস্থানীয়। প্রথমেই আমরা আলোকে অরুণ সেন-এর একটি উক্তি তুলে ধরব এই প্রসঙ্গে -

“আরেকজন সমসাময়িক লেখক শহিদুল জহির। তিনি মিলনের ঠিক বিপরীত, অতীব স্বল্পপ্রসূ এবং ঈষৎ দুরাধিগম্য।” (১) এই উক্তি থেকে জহির এর সৃষ্টি প্রবণতার বিষয়টি প্রকাশিত। জহির লিখেছেন অল্প এবং তার মধ্যেই তাঁর সৃষ্টি লাভ করেছে নির্মাণ বিশিষ্টতা। সেই নির্মাণ শৈলীর দ্বারা তিনি হয়ে উঠেছেন ‘ঈষৎ দুরধিগম্য’।

‘সাহিত্যের বাংলাদেশঃ উপন্যাস কবিতা নাটক’ গ্রন্থে শহিদুল জহির-এর ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’উপন্যাসের কথা প্রসঙ্গে অরুণ সেন জানিয়েছেন —

“১৯৮৮-তে প্রকাশিত তাঁর ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ উপন্যাসটিতে পাওয়া যায় স্বাধীনতা পাওয়ার আগের ও পরের পুরোনো ঢাকার গলির ছবি। সেখানে এক কিশোর বড়ো হয় লুঠতরাজ আতঙ্ক আর ভয়ের মধ্য দিয়ে এবং টানা অনুচ্ছেদহীন এই বিবরণ শেষ পর্যন্ত পৌঁছায় এক কুখ্যাত রাজাকারের পাড়ায় পুনঃপ্রবেশে - যে রাজাকার একদিন জনতার রোষে পাড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। এবার সকলের অগোচরে নিঃশব্দে পাড়া থেকে সরে যায় সেই তরুণ কিশোর আসন্ন বিপদের ভয়ে। রাজাকার পাড়ায় ঢোকে আর তরুণ পাড়া ছাড়ে।” (২)

কিশোরটি হল আবদুল মজিদ। আর রাজাকার হল বদু মওলানা। উপন্যাসটির মধ্যে প্রধান গঠন উপাদান হল রাজনীতি; রাজনৈতিক বিষয়, বাতাবরণ বা বাস্তবতা নির্মাণের জন্য ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। যে পরিবর্তিত বাস্তবতায় জীবন বিড়ম্বিত হচ্ছে এবং ত্রস্ত হচ্ছে। আর বাস্তবতার স্তরায়ন আপাতদৃশ্য হলেও আসলে তার কোনো অস্তিত্ব নেই; যেন একটি সরলরেখা, তার মধ্যে কোনো ভাঙ্গন নেই, বক্রতা নেই। এই সরলরৈখিক গঠনের পরিকল্পনার বিষয়টি উপন্যাসটির মধ্যে এক অনুচ্ছেদের নির্মাণের কৌশল থেকে আমরা ধরতে পারি। পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতির সময় যে ভীতি, ত্রাস, অসম্মান, নিপীড়নের অস্তিত্ব ছিল - অনেক প্রচেষ্টা, অনেক রক্তপাতের বিনিময়ে স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, বাঙালি জাতিসত্ত্বা নির্ভর বাংলাদেশ গঠিত হবার পরেও জীবন নিয়ে আবদুল মজিদের মতো সাধারণ বাঙালি ভীতির অবসান হয় না। রাজনৈতিক বাস্তবতায় ‘খানসেনা’ অর্থাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী বদু মওলানা যেমন ধ্বংসাত্মক ও প্রাসঙ্গিক ছিল পূর্ব

পাকিস্তান থাকাকালীন, স্বাধীন বাংলাদেশেও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে সে। ফলে সাধারণ বাঙালির জীবন যেকোন রকম রাজনৈতিক বাস্তবতায় একই থাকে। এই বিষয়টিকে ঔপন্যাসিক নির্দিষ্ট করেছেন একটিমাত্র দীর্ঘ অনুচ্ছেদে সমগ্র উপন্যাসটি গঠন করে।

পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ; এখানকার রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটি একবার দেখবার প্রয়োজন যেহেতু রাজনীতি কিংবা রাজনৈতিক বাতাবরণ উপন্যাসের গঠনের উপাদান হয়ে উঠেছে। ১৯৪৭ খ্রীঃ পূর্ববঙ্গকে নিয়ে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অধিক ছিল তবু পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য ছিল প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার জন্য এবং নিজেদের নিরঙ্কুশ প্রভূত্ব বজায় রাখতে তারা সেনাবাহিনীকে কাজে লাগায়।সেনার দমন পীড়নের সহযোগী হয়ে ওঠে বিহার কিংবা অন্যান্য উত্তর ভারতীয় রাজ্য থেকে যাওয়া মুসলমানেরা। তারাই রাজাকার নামে পরিচিত। ১৯৫৪ খ্রীঃ পাকিস্তানে নির্বাচন হয়েছিল তাতে মুজিবর রহমান এর দলসংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেও ধর্মান্ধ গোষ্ঠী, পাকিস্তানি সেনা, বেনিয়া শ্রেণি জনগণের রায়কে অসম্মান করে। জারি হয় সামরিক শাসন ১৯৫৮ খ্রীঃ। সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দু ও মুক্তমনা বাঙালি মুসলমানদের ধরে ধরে হত্যা করা হয়; চলে গড়পড়তা নারী ধর্ষণ। ১৯৭১ খ্রীঃ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ; ভারতের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়। দেশেই গা ঢাকা দেয় কিংবা অন্যান্য দেশে পালায় পাকিস্তানি সেনার সহযোগী রাজাকাররা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ পরবর্তীকালে তাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমার কথা ঘোষণা করে। সেইসব রাজাকারেরা ফিরে আসে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হবার কিছুকাল পরে ধর্মান্ধ পাকিস্তানপন্থী গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের চক্রান্তে বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবর রহমান নিহত হন। এরশাদ-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আমলে রাজাকার সহ ওইসব গোষ্ঠীগুলি আবার প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বি.এন.পি - জামাত জোটের মন্ত্রীও হয় এরা। পূর্ব পাকিস্তান থাকাকালীন সময়ে যে দাপটের সঙ্গে রাজাকারেরা নিপীড়ন করে বেড়িয়েছে সামান্য কিছুদিন দমে যাবার পর আবার পুরোনো দাপট ফিরে পায় তারা। এটাই সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা।

উপন্যাসটির মধ্যে রাজনীতি আগাগোড়া রয়েছে। তা যেমন উপন্যাসের বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেছে তেমনই গঠনকেও। উপন্যাস নির্মাণের কোনো নির্দিষ্ট ধারা নেই। বিশেষ ফর্মের বাঁধনে একে বাঁধা যায় না। রাজনীতি একটি গুরুগম্ভীর বিষয়। যেমন করে ভ্রমণমূলক উপন্যাসের হালকা চাল, ইতিহাসমূলক উপন্যাসের মধ্যে থাকা ধূসরতার ছায়া ও কল্পনা উপন্যাসের গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে; তেমনই যেহেতু বিষয় হিসাবে রাজনীতি এসেছে ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ উপন্যাসে; বিষয়-গাম্ভীর্য উপন্যাসটিকে প্রবন্ধ সুলভ করে তুলেছে। এই প্রবন্ধ সুলভ নির্শাণ ভঙ্গি আমরা আরও দুটি দিক থেকে বুঝতে পারি। প্রথমত উপন্যাসের নামকরণটি প্রবন্ধের মতো। দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধ সুলভ বিচার নির্ভর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।

আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটির নামকরণ যে প্রবন্ধের মতো তাতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। বিংশ শতাব্দীতে জন-জীবনে রাজনীতির প্রভাব পড়ল বিশেষভাবে কারণ

গণতন্ত্রের এবং ভোটদানের প্রক্রিয়া অধিকাংশ দেশে প্রচলিত হতে শুরু করে। অর্থাৎ রাজনীতিতে সাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ শুরু হয়। তাই উপন্যাসে মানুষের কথা বলতে গিয়ে রাজনীতির বাতাবরণ বা প্রসঙ্গের উত্থাপন করবেন ঔপন্যাসিক। ফলে উপন্যাসের নামকরণেও রাজনীতি চর্চার জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত সাহিত্যিক বা লেখ্য সংরূপ, প্রবন্ধের ছাপ সৃষ্ট হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আলোচক তপোধীর ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন - "..... নামকরণে প্রবন্ধের ধরণ এল যে, এতে বোঝা যাচ্ছে, আখ্যান সর্বগ্রাহী। পাঠককে যেন আগাম সংকেত দেওয়া হলো, এই প্রতিবেদনে বিস্ময়ের প্রচুর উপকরণ থাকবে। কিন্তু যা-ই পরিবেশিত হোক - সবই জীবনের কথা।"

আমরা উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখব প্রবন্ধের মতো যুক্তি সহযোগে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।

"আবদুল মজিদ এখন বরং দেখতে পায়, মানুষ কেউই কিছু ভোলে না এবং বদু মওলানারও এই কথাটি জানা আছে। এই অবস্থায় কয়েকদিনের চিন্তাভাবনার শেষে সে সিদ্ধান্ত নেয় মহল-া ত্যাগ করে যাওয়ার। ..... কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে তার মনে হয়, এটাই একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। প্রথমত, সে চায় না তার মেয়েটি তার বোনের মত বদু মওলানা কিংবা তার ছেলেদের জিঘাংসার শিকার হোক এবং তার মনে হয়, বাস্তবতা এভাবে এগোলে এরকম যে ঘটবে না তা কেউ বলতে পারে না। তার মনে হয়, বদু মওলানা একাত্তর সনের সেই একই রাজনীতির চর্চা করে এবং সে এখনো জানে আবদুল মজিদ এবং তার পরিবার মোমেনার মৃত্যুর এখনো তাকে ঘৃণা করে। তার মনে হয়, এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় বদু মওলানা এবং তার দল সুবিধে করতে পারলে তারা আবদুল মজিদকে ছেড়ে দেবে না এই ঘৃণার জন্য। তবে আবদুল মজিদ এটাও বুঝতে পারে যে, বদু মওলানার সে সুযোগ ঘটলে মহল-ার প্রায় সব লোকই আবার সেই পুরানো চেহারাটা দেখতে পাবে; কিন্তু এই ভয়ে একটি মহল-ার সব অধিবাসী বাড়িঘর বিক্রী করে পালাতে পারে না। তা সত্ত্বেও, আবদুল মজিদ ঠিক করে যে, মহল-ার সব লোকের কি হবে তা নিয়ে চিন্তা করে তার লাভ হবে না, সে প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে চায় এবং কোন সমষ্টিগত প্রচেষ্টার অবর্তমানে সে তা করতে পারে এখনই মহল-া ত্যাগ করে। তার এই চিন্তা ও সিদ্ধান্তের পরিণতিতে ছিয়াশি সনের সাতই জানুয়ারীর দৈনিক ইত্তেফাকে আবদুল মজিদের বাড়ি বিক্রীর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।"(৩)

উপরে উক্ত উপন্যাস অংশের দিকে তাকালে আমরা প্রবন্ধের অংশই মনে করতে পারি একে। যেন প্রাবন্ধিক, জনৈক ব্যক্তি যিনি রাজনৈতিক সন্ত্রাসে ঘরছাড়া হতে চলেছেন বা পূর্ব পুরুষের বসত বাড়ি বিক্রী করে চলে যাচ্ছেন যা এই বাংলায় প্রায়শই হয় - এমন কারোর কথা বলছেন এবং সেই বিষয়টির সূত্রে পত্রিকায় প্রকাশিত বাড়ি বিক্রীর বিজ্ঞাপনের কথাও বলে দিচ্ছেন সাল, তারিখ, পত্রিকার নামসহ।

শহিদুল জহির এর আলোচ্য উপন্যাসের গঠন প্রসঙ্গে সাহিত্যিক দেবেশ রায়-এর প্রতিবেদনধর্মী রচনা সমকাল ও রাজনীতির সঙ্গে দেবেশ রায় আখ্যান মিশিয়ে এক বিশিষ্ট নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করেন। রচনা করের খরার প্রতিবেদন, দাঙ্গার প্রতিবেদন, ইচ্ছামৃত্যু নিয়ে প্রতিবেদন, শিল্পায়ন নিয়ে প্রতিবেদন। তিনি তাঁর প্রতিবেদন সমগ্রের ভূমিকায় জানিয়েছেন —

"আমার এই 'প্রতিবেদন' চিহ্নিত গল্পগুলি লেখা হয়েছে ও বই হয়ে গেছে ১৫ থেকে ২২ বছর আগে। ১৯৯০ থেকে আমার জীবনে গ্রহণ লেগে গিয়েছিল। ছোটভাই ও তার স্ত্রী মারা গেল, বছর দু-একের তফাতে - বিদেশে। নিজেরাই নিজেদের মারল, ওরা। ৮৮-৮৯ তে বৃষ্টি ভাল হয়নি। কাগজে ও বিশেষ করে ম্যাগাজিনগুলোতে, খরার মড়কের খবর বেরোচ্চে, যতটা তথ্য নির্ভর করা সম্ভব, ততটাই প্রামাণি ছবি সহ। বিশেষজ্ঞদের শেখা ও সহজে পাওয়া যাচ্ছিল ৯২-এর শেষ থেকে শুরু হয়ে গেল মুসলমান নিধনের দাঙ্গা - বাবরি মসজিদ নিয়ে। সে দাঙ্গার জায়গা ছিল উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত। বস্তুত সেটা ছিল সর্বভারতীয় রাজনীতির অংশ। (৪)

প্রতিবেদনগুলিতে দেবেশের ব্যক্তিগতের সাথে মিশে গেছে সমকালীনতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত। সেই সূত্রেই রচনাভঙ্গিতে আসে বৈচিত্র্য।

"খরায় জ্বলতে থাকা, দাঙ্গায় পুড়তে থাকা, কর্মহীন, শিল্পীহীনতায় ধুঁকতে থাকা আর জীবনের অর্থহীনতায়, গতিশূন্য, নিশ্চলতার বিভ্রান্তিতে আটকে পড়া গোটা একটা ভারতবর্ষের প্রতিবেদন। প্রতিবেদন কিন্তু দেবেশবাবু লেখার একেবারে শেষ দিকে 'নভেলের ভিতরে' শিরোনামে যে টুকরোটি জুড়ে দিয়েছেন, তাতেই তো আছে - 'নভেলের কৌশল' ঢুকিয়ে প্রতিবেদনের তথ্য বিস্তারবিন্যাস ও যৌক্তিকতার বা প্রামাণিকতার কৌশলে নভেলটিকে আচ্ছা করে ফাঁদতে চান? নভেল ফাঁদা নিয়ে অবশ্য আমি তো মনে করি উনি আজও আমাদের যে কোনও তরুণতম লেখকের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এক সময় আনলেন বৃত্তান্ত, পরে তারই মধ্যে ঢুকে পড়ল 'ঘটে থাকা' সিরিজের লেখাগুলো। তারপর এই প্রতিবেদন; কতভাবে অন্তর্ঘাত ঘটান নভেলের ফর্মে ....."(৫)

বয়সে শহিদুল জহির এর থেকে প্রবীণ দেবেশ রায় উপন্যাসের গঠন নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা করেন। তাঁর সেই মননের ছাপ রয়েছে 'উপন্যাস নিয়ে' এবং 'নতুন ধরণের উপন্যাসের খোঁজে' নামক লিখিত দুটি গ্রন্থে। তিনি ওয়াকিবহাল উপন্যাসের গঠন সংক্রান্ত অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারেও; তা সে যে বাংলাতেই হোক, এপার কিংবা ওপার। তাই শহিদুল জহির যে বছর মারা গেলেন (২০০৮এর ২৩শে মার্চ) সেই বছর 'শোক বাংলা ভাষাভাষীদের পত্রিকা'য় ডিসেম্বর মাসে 'এখনো অপেক্ষাঃ শহিদুল জহিরের মৃত্যু'নামের একটি প্রবন্ধ। এই সময়েও যখন জহির বহু পঠিত নন, তখন সেই ২০০৮-এ দেবেশ রায় তাঁকে নিয়ে লিখছেন। দেবেশ রায়ের প্রতিবেদন সমগ্রের প্রতিবেদনগুলির নামকরণ এবং উপস্থাপনাভঙ্গি জহির এর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'র কথা স্মরণ করায়। আর দুটি রচনারই কেন্দ্রে রয়েছে রাজনীতি কিংবা রাজনৈতিক বিষয়। এই বিষয়ে জহির-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশের রাজনৈতিক আবহ এবং এই সময় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রকাশিত 'একাত্তরের দালালরা কে কোথায়?' পড়ে আমার মনের এমন একটা অবস্থা হয় যে, আমাকে 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' বইটা লিখতে হয়। .... আমার কাছে এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ভাল লাগে নাই। তখন আমি বইটা লিখি। (৬)

উপন্যাসের কথন পরিকল্পনা বর্ণনামূলক; আটচলি-শ পৃষ্ঠার উপন্যাসের অধিকাংশই বর্ণনা। সংলাপ অংশ বড়ই কম। বর্ণনার মধ্যে এক বিস্ময়কর স্রোত রয়েছে যা পাঠককে পরপর সামনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। থামার সুযোগ দেয় না, নদীর স্রোতের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তার একটি নিদর্শন আমরা তুলে ধরব।

"উনিশশ পঁচাশি সনে একদিন লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনের যুবক আবদুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়ে ফট করে ছিঁড়ে যায়। আসলে বস্তুর প্রাণতঞ্চ যদি বৈজ্ঞানীকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে হয়তো বলা যেত যে, তার ডান পায়ের স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতে বস্তুর ব্যর্থতার জন্য নয়, বরং প্রাণের অন্ত র্গত সেই কারণে ছিন্ন হয় যে কারণে এর একটু পর আবদুল মজিদের অস্তিত্ব পুনর্বার ভেঙে পড়তে চায়।"

এ বাংলার কথা সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের লেখায় আমরা এইরকম বর্ণনা প্রাধান্য দেখেছি। এই প্রসঙ্গে কমলকুমারের 'সম্পূর্ণাঙ্গ সার্থক দু'তিনটি রচনার অন্যতম'।(৭) 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরব।

"বিশ্বাস অন্যত্রে, কেন না সম্মুখেই নিম্নের আকাশে তরুণ সূর্যবর্ণ কখনও অচিরাৎ নীল, বুদবুদ সকল, যদৃচ্ছাবশতঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি আর একটি এইরূপে অনেক অনেক - আসন্ন সন্ধ্যায়, ক্রমে নক্ষত্র পরম্পরা যেন দেখা যায় - দূর কোন হরিত ক্ষেত্রের হেমন্তের অপরাহ্ন মন্থনকারী রাখালের বাঁশরীর শুদ্ধ নিখাদে দেহ ধারণ করত সুডৌল দ্যুতিসম্পন্ন ইদানীং উঠানামা করে, এগুলি সুন্দর, উজ্জ্বল, বাবু, অভিমানী আশ্চর্য্য !" (৮)

উপন্যাসের সময়কাল ১৯৭১ থেকে ১৯৮৬ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসের সাত তারিখ। উপন্যাসটির সূচনা বিন্দু হল ১৯৮৫ খ্রীঃ একটি দিন। তারপর ফ্ল্যাশব্যাকের ব্যবহার আসে বর্ণনার মধ্যে। চলে যায় চৌদ্দ বছরপূর্বের ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ লেনে। ছিয়াশি সালের যুবক আবদুল মজিদ তখন কিশোর। ফ্ল্যাশব্যাকে আমরা দেখতে পাই গলির বাসিন্দাদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। মজিদের দিদি মোমেনার ধর্ষণ ও হত্যা, পাকিস্তানি সেনা এবং রাজাকারদের হাতে মহল-ার সাতজনের মৃত্যু, বদু মওলানাদের হিংস্র দাপট। তারপর উপন্যাসে চলে আসে বর্তমান সময় অর্থাৎ ছিয়অশি সালে; যখন আবদুল মজিদ পাড়া ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফ্ল্যাশব্যাকে কখনও এসেছে সুদূর অথীত কখনও বা অপেক্ষাকৃত নিকট অতীত।

উপন্যাসের মধ্যে জাদু বাস্তবতার ধরণটি রয়েছে। চূড়ান্ত অবদমন - বিপন্নতার প্রেক্ষিতে একটি জাতির আকাঙ্খা ও বর্তমান ফুটে ওঠে বা ফুটে উঠতে পারে জাদু বাস্ত বতাধর্মী উপস্থাপন রীতিতে। আলোচক রবীন পাল এই উপন্যাসের জাদুবাস্তবতাধর্মী গঠনশৈলী প্রসঙ্গে জানিয়েছে —

"এবার উত্থাপন করা যাক বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে জাদুবাস্তবতার চর্চার কথা। কেউ কেউ বলেছেন শহিদুল জহিরের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা বাংলাদেশে এই ধারার প্রথম সার্থক উপন্যাস।"(৯)

ঔপন্যাসিক শহিদুল জহির-এর এই করণকৌশল ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল তাও আমরা তাঁর কথা থেকে জানতে পারি। তিনি জানিয়েছিলেন যে, মার্বেজ-এর লেখা

পড়ে এই পদ্ধতি ব্যবহারের ব্যাপারে আগ্রহী হন।

"..... তখন আমি মার্বেজের 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স ইন সলিচিউড' পড়ে ফেলায় তার কাছ থেকে জাদুবাস্তবতার রচনা পদ্ধতিটি নিই। আমার মনে হয় যে, আমি আমার কাহিনী তৈরীতে অনেক দূর পর্যন্ত স্বাধীনতা নিতে পারি, আমার কল্পনাকে সম্ভাব্যতার প্রান্ত পর্যন্ত নিয়া যেতে পারি।"(১০)

আমরা এখন উপন্যাস অংশের জাদু বাস্তবতাধর্মী রচনারীতির একটি দৃষ্টান্ত উলে-খ করব।

"পিতার চোখের সামনে বিনা কারণে খাজা শফিকের প্রাণবিচ্যুত দেহের পতন হলে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গিয়ে আজান দিয়েছিলেন। মহল-াবাসী সকলেই পরে বলে যে, হ্যাঁ তারা আজানের ধ্বনি শুনেছিল। সেই ঝঞ্ঝার সময় যখন দিনের আলো ছিল কৃষ্ণবর্ণ তরলের মত এবং শব্দের জগৎ ছিল পাহাড় ভেঙে পড়ার মত সহস্রখন্ডিত, সেই সময় তারা শুনেছিল লক্ষ্মীবাজারের পলেস্তরা খসা বাড়িগুলোর ছাদ ছুঁয়ে আজানের ধ্বনি গড়িয়ে যেতে। এবং তারা যখন জানতে পারে যে খাজা আহমেদ আলী ছিল সেই ঝঞ্ঝাকালের মুয়াজ্জিম, তারা সকলেই বলে যে, এমন মধুর স্বরে আজান দেয়া তারা ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই .... তারা এ-ও বলে যে, তিনি আজান দেয়া সমাপ্ত করেছিলেন এবং আজানের শেষ স্তবকে দু'বারের জায়গায় তিনি চারবার 'আল-াহ আকবর' বলেছিলেন। কিন্তু মহল-ার লোকেরা যখন খাজা আহমেদ আলীর ছাদে গিয়ে তার মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে এবং জানতে পারে যে, আজানের মাঝখানে তাকে গুলি করা হয় তারা তা মেনে নিতে পারে না। তারা বলে যে তিনি আজানের শেষে চারবার মহল-ার সকলকে বলেছিলেন যে, 'আল-াহই শ্রেষ্ঠ'।"

ভাষারীতির ক্ষেত্রে লেখক মান্য লেখ্য চলিত এবং কথারীতির যথাসম্ভব লেখ্যরূপ - দুই পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। যে কয়েকটি হাতে গোনা সংলাপ রয়েছে তা বঙ্গালি উপভাষায় নির্মিত। যেহেতু উপন্যাসের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ তাই সংলাপে এই ভাষা ব্যবহার উপযুক্ত হয়েছে। আমরা দুটি দৃষ্টান্তের উলে-খ করবো।

১. "বইনের নামে নাম রাকচো, বইনেরে ভুলো নাইকা ?

২. "তুই ব্যাটা গাবগাছালী, তরে পিটাইয়া লাশ বানামু।"

আবার যখনই সম্ভাব্য সংলাপকে বর্ণনায় রূপান্তরিত করেছেন তখন তা হয়ে গেছে মান্য চলিত বাংলা।

"..... সেদিন আজিজ পাঠান তাকে তারর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাঁধের ওপর হাত রেখে বলেছিল যে সময়ে মানুষকে অনেক কিছু ভুলে যেতে হয়, বাস্তবতা অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে।

আমরা দেখেছি একটি মাত্র দীর্ঘ বিবৃতিতে উপন্যাসটি শুরু থেকে শেষ হয়েছে; দীর্ঘ অনুচ্ছেদযুক্ত এই উপন্যাসে দীর্ঘ বাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে অনেক। সেইসব প্রলম্বিত দীর্ঘ বাক্য যা অবশ্যই কিছুটা কৃত্রিম শোনায়। কিন্তু সেই কৃত্রিমতা উপন্যাসটির গঠনশৈলীরই অঙ্গ।

"আবদুল গণির কথা শুনে তারা বুঝতে পারে যে, ইসমাইল হাজামের ক্ষুরে ধার দেয়া দেখানোর জন্যই কেবলমাত্র বদু মওলানা সেদিন তাদেরকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখেছিল কারণ তারা জানতে পারে যে, সেদিন ইসমাইল হাজাম আবুল বাশারের খাতনা করে নাই এবং সেই নাটকের পরবর্তী দিন আসার আগেই সে নিহত হয়।"

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্রষ্টা শহিদুল জহির এর বিশেষ চিন্তন ও পরিকল্পনা ছিল। তাই উপন্যাসে আমরা দেখলাম পরীক্ষামূলক ভাষা ব্যবহার। এই বিষয়ে তাঁর দুটি উক্তি বিশেষ উলে-খযোগ্য।

১. "ভাষা শুধু ব্যবহার নয়, ভাষায় অংশগ্রহণের অধিকার আমার আছে। .... বাংলা ভাষার প্রবহমানতার স্বার্থেই ভাষায় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

২. " আমি কথাসাহিত্যের শুধু সংলাপ না, টেক্সটের ক্ষেত্রেও নতুন বাক্যবিন্যাস ও ভাষা প্রয়োগ করতে চাচ্ছি। .... নদী নদীই থাকে, কিন্তু নদীকে বহমান থাকতে হলে অনেক পানি জোগাড় করতে হবে। .... আমাদের প্রয়োজনেই আমরা এই ভাষাটাকে তৈরি করেছি। আমার মনে হয় যে, এটা আমাদের জীবনের প্রাণবস্তুকে ধারন করতে পারছে।।"(১২)

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে লেখক তাঁর উপন্যাসের ভাষা যে কৃত্রিম তা স্পষ্টই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেই কৃত্রিমতাকে বলতে হবে শৈল্পিক কৃত্রিমতা।

উপন্যাসে জীবন প্রভাবিত হয়েছে, ত্রস্ত হয়েছে। বিড়ম্বিত হয়েছে রাজনৈতিক বাস্তবতার দ্বারা। জীবন-আবদুল মজিদের, তার আপা (দিদি) মোমেনার, শফিকের,খাজা আহমেদ আলির এবং আরও সাতজনের; সেইসঙ্গে বাংলাদেশের বাঙালির। আর রাজনৈতিক বাস্তবতা বারে বারে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে। সূত্রাকারে উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত সেই বাস্তবতাকে আমরা দেখে নেব।

১. ১৯৭১-এর প্রচন্ড অত্যাচারেও আবদুল মজিদ বাড়ি ছাড়েনি; ছাড়ল স্বাধীন বাংলাদেশে।

২. আবদুল মজিদ কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নয় বাংলাদেশে; সংখ্যালঘু হলে অল্পেই বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আক্রান্ত হবার বা নিরাপত্তাহীনতার স্বাভাবিক বোধ থেকে গৃহত্যাগের মানসিকতা আসতে পারত। ফলে এটা আমরা বুঝতে পারি ধর্ম নয় রাজনৈতিক বাস্তবতা এক গভীর সংকট তৈরী করেছিল ওদেশে। প্রকৃতপক্ষে বেশ কয়েকবছর ধরে ইসলাম সম্প্রদায়ভুক্ত মুক্তমনা মানুষেরা বাংলাদেশে একধরণের সংখ্যালঘু হয়ে উঠেছেন।

৩. সংকটটি তীব্র হয় আবদুল গনি নামেমর এক রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ার পর সৃজনহারা কোনো ব্যক্তির ক্রোধের শিকার হয়ে তার মৃত্যু হয়েছিল। পরবর্তীকালে বদু মওলানা প্রকাশ্য সভায় তাকে শহীদ বলে বর্ণনা করে।

৪. রাজনৈতিক বাস্তবতা কিংবা সুবিধাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজিজ পাঠানের মতো মুক্তিযোদ্ধা বদু মওলানার সঙ্গে হাত মেলায়; আর এই পথেই বদু তার পুরানো দাপট ফিরে পেতে থাকে।

ঔপন্যাসিক শহিদুল জহির-এর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসটি বিবৃতিপ্রধান, রাজনৈতিক বাতাবরণ নির্ভর প্রবন্ধশৈলীর ম্যাজিকরিয়ালিজমধর্মী উপন্যাসের

দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত হল। তবে বলা যায় বহুবিধ পরীক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন উপস্যাসিক এই উপন্যাসের কথা অবয়ব নির্মাণে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. অরুণ সেন, সাহিত্যের বাংলাদেশে, কলকাতা এবং মুশায়েরা, ২০১৩, পৃঃ ৪৭।
২. তদেব।
৩. তপোধীর ভট্টাচার্য্য, আখ্যানের সাতকাহন, (প্রবন্ধ নাম - 'শহিদুল জহিরের কথা ভুবন), কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদদ, ২০১৩, পৃঃ ১৩৩।
৪. দেবেশ রায়, প্রতিবেদন ঃ চারটি উপন্যাস একসঙ্গে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭, ভূমিকা।
৫. স্বপন পান্ডা, দেবেশ রায়ের 'প্রতিবেদন' নিয়ে দুই পাঠকের বাক্যবাজি, কলকাতা, বঙ্কু - দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, (অতিথি সম্পাদক - গৌতম সেনগুপ্ত), অগাষ্ট ২০১৪, পৃঃ ২৯১।
৬. ৩ - এর অনুরূপ, পৃঃ ১৩৬।
৭. কমলকুমার মজুমদার, গোলাপ সুন্দরী, কলকাতা, আনন্দ ১৯৮২, ভূমিকাংশ (সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)
৮. তদেব, পৃঃ ২৩।
৯. রবিন পাল, জাদুবাস্তবতা ঃ বাস্তবতার ভিন্ন স্বর (পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা/ সম্পাঃ নবেন্দু সেন), কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০৯, পৃঃ২১০
১০. ৩ -এর অনুরূপ।
১১. তদেব, পৃঃ ১৩৪।
১২. তদেব, পৃঃ ১৩৪।

দিদৃক্ষার আলোয় নতুন মুর্শিদাবাদ

অম্বালিকা সরকার
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) কল্যানী, নদীয়া।

মুর্শিদাবাদ ঃ অঞ্চল - পরিচয়

যেকোন অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যসমূহকে চিহ্নিত করতে হলে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জনবিন্যাসগত পরিচয় গ্রহণ করাটা আবশ্যিক। কেননা, ভাষা নিরালম্ব স্বয়ম্ভু কোনো ব্যাপার নয়। উপরোক্ত সবকিছুকে আশ্রয় করেই একটি অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট রূপলাভ করে। তাহলে সংস্কৃতির কোনো অংশকে স্পর্শগম্য করে তোলার ক্ষেত্রে অঞ্চল বলতে আমরা কী বুঝবো?

'অঞ্চলচর্চার তাত্ত্বিক রূপ-সম্পর্কিত আলোচনায় আলোচক এ বিষয়ে বিস্তৃত ধারণা দিতে চেয়েছেন :

কিন্তু এক্ষেত্রে 'অঞ্চল' বলতে আমর কী বুঝবো? নানাবিধ বিদ্যাচর্চায় অঞ্চল বা রিজিয়ন শব্দটির দেখা মিলবে। ভূ-বিদ্যা ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের আলোচনায় তো বটেই 'অঞ্চল' অভিধাটি খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ভূগোলের নানান উপ-বিদ্যাশৃঙ্খলায়। আঞ্চলিক ভূগোলের পাঠ যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয়।

সাধারণভাবে কয়েকটি স্থান নিয়ে একটি অঞ্চলের প্রকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। দৃশ্যত এটাকে 'ভৌগোলিক অঞ্চল' বলতে হবে। একটি দেশের সীমানার মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির কথা যদি কেউ ভাবেন তবে তাকে বলতে হবে 'রাষ্ট্রনৈতিক অঞ্চল।' আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক সীমানা নিয়ে কেউ যদি অঞ্চলের কল্পনা করেন তবে তাকে নাম দিতে হবে 'প্রশাসনিক অঞ্চল।' শাসনব্যবস্থার সুবিধার কারণেই প্রশাসনিক অঞ্চল বিভাজন (যেমনঃ ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৌজা, পরগণা ইত্যাদি)। কিন্তু এই জাতীয় অঞ্চলের প্রকল্পনায় সেখানকার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধ্যয়ন সম্পূর্ণভাবে করা সম্ভব নয়। কেননা, শুধুমাত্র ভৌগোলিক প্রতিবেশের কিছু সাধারণ সাদৃশ্য গণনীয়মাত্রায় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিতে পারে না। অবশ্যই স্থানসমূহের ভৌগোলিক লগ্নতার সঙ্গে স্থানগুলির মধ্যে স্থিত মানুষের জীবনযাপনের থাকতে হয়। আবার একথাও উলে-খ করতে হবে যে, ভৌগোলিক লগ্নতা সেই অঞ্চলের মানুষের দেহ-গঠন ও স্বভাবের আংশিক সাদৃশ্যের জন্ম দেয়ই। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রশাসনিক অঞ্চল গঠিত হলেও বিভাজন পরিকল্পনায় আঞ্চলিক ভূগোলের একটা ভূমিকা থেকেই যায়।

সুতরাং একটি অঞ্চলের ধারণা করতে গেলে ভূগোল, প্রশাসনিক বিন্যাসসহ একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রকল্পনা গঠন করতে হয়। স্পষ্টতই ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলের অভীপ্সিত অর্থটি বুঝবার জন্য আমাদের প্রচলিত বা আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে যেতে হয়।১ক.

বিষয়টিকে আলোচকস্পষ্ট করেছেন একাধিক রেখাচিত্রের সাহায্যে। যেমনঃ

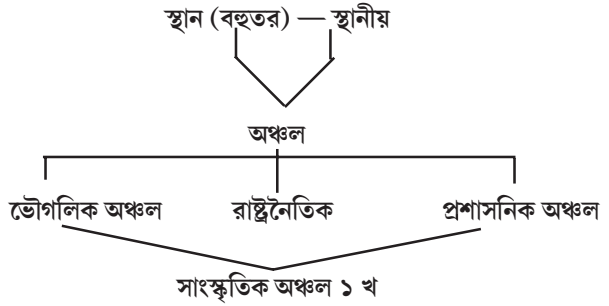

সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে চিহ্নিতকরণের বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য ধরনও তিনি উলে-খ করেছেন। এই ধরণের একটি অবশ্যই ভাষাগত।

মোটামুটিভাবে একটি ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী মানুষের অধিকাংশের নিজস্ব মুখের ভাষা দিয়েই সামাজিক ও মানবিক সম্বন্ধবন্ধন সৃজিত হয়ে ওঠে। সেই অঞ্চলের মানুষের ভাষিক জাতি-পরিচয়ও তার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। মান্য কথ্য নয়, একটি অঞ্চলের ভাষার ঔপন্যাসিক ও বিভাষিক রূপ সেখানকার মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম মাপকাঠি, সন্দেহ নেই। রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে বস্তুত বিজড়িত আছে তার ভৌগোলিক ছাড়াও ভাষিক পরিচয়। এই ধরণটির ক্ষেত্রেও আমরা সাংস্কৃতিক অঞ্চলের আংশিক ধারণা পাই। ১গ. বাংলার প্রাচীন জনপদকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যের নিরিখেই এর ভাষা ব্যবহারের পরিচয় উন্মোচিত হতে পারে। ভাষার দুটি রূপ - একটি কথ্য, অপরটি লেখ্য। লেখ্য ভাষার মধ্যে ব্যক্তি- লেখকের স্টাইলের পরিচয় ছাড়া খুব একটা তারতম্য না থাকলেও অঞ্চলভেদে কথ্যভাষার বৈভিন্ন শুধুমাত্র অঞ্চলভেদেই হয় না, এই পার্থক্য দেখা যায় একই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কথ্যভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়।

ইতিহাসের সাক্ষ্য : তাত্ত্বিক প্রশ্ন

প্রশ্ন উঠতেই পারে : এখানকার কথ্য ভাষার নাগাল পেতে আমরা ইতিহাসকে ব্যবহার করব কেন? সাধারণ কথায় এর সহজ উত্তর যে,, ইতিহাসকে শুধুমাত্র আমরা যদি রাজা - রাজড়া, যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ বলে মনে না করি এবং ইতিহাস যদি হয় কালানুক্রমিক ও পারম্পর্যপূর্ণ বিবরণ তাহলেও সেই বিবরণ নিছক পাথুরে প্রমাণের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারে না। কেননা সর্বত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না কিংবা প্রামাণ্য উপাদান ঐতিহাসিকের নির্দেশ ছাড়া নিজেই কোনো সাধারণ কিছু কেজো সত্য ছাড়া নিহিত সত্যকে প্রকাশ করতে পারে বলে মনে হয় না।

মার্ক ব-ক দেখিয়েছেন যে, কোনো ঘটনাপর্বের সম্ভাব্যতাকে নির্ধারণ করতে গেলে এর সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাকে পরিমাপ করতে হয়। (ইতিহাস লেখকের কাজ, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা ২০০৪, পৃঃ ৭৫) ফলত ঐতিহাসিক সত্যের ক্ষেত্রে

ইতিহাসকারের মতাদর্শগত অবস্থানের একটা বড় ভূমিকা থেকে যায়। সমস্যা এই যে, মতাদর্শগত অবস্থান ছাড়া ইতিহাসের শুষ্ক তথ্য বিশে-ষিত হতে পারে না, আবার ঐতিহাসিকের মধ্যে কাজ করতে থাকা সুক্ষ্ম মানবীয় উপাদানগুলি তাঁকে ক্রমাগত একটা কাঙ্খিত সিদ্ধান্তে র দিকে নিয়ে যায়। সে কারণেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবা সিরাজদৌল-া ইতিহাসবাহিত জনমানসে দেশপ্রেমী ও ভাগ্যহত এবং মীরজাফর নিছক বিশ্বাসহন্তা থেকে যান !

ঐতিহাসিকের মতাদর্শগত অবস্থানের প্রশ্নটির সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই বিজড়িত হয়ে পড়ে ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিকতার প্রসঙ্গটিও। কোনো ইতিহাস লেখক যখন নিজেই নিজের সম্ভাব্যপরতার সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করেন তখনই একদেশদর্শিতা থেকে ইতিহাসপাঠ নিস্কৃতি পেতে পারে। ইতিহাসকার যত রকমের উপাদান ও পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তার মধ্যে - মার্ক ব-ক জানাচ্ছেন :

যথাযথভাবে বললে, একটি ঐতিহাসিক শাখাই হলো ব্যতিক্রম। সেটা হলো ভাষাতত্ত্ব অন্ত ত এমন একটি বিভাগ যার বিবেচ্য বিষয় হলো বিভিন্ন বাষার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। (তদেব, পৃঃ ৭৬)

আমরা আরও এগিয়ে গিয়ে বলতে পারি যে, জনসমাজে প্রচলিত ভাষা বহুলাংশে ইতিহাসের নিহিত সত্যকে বহন করতে সক্ষম। কেননা কথ্যভাষা বা জনসাধারণের ব্যবহারিক জীবনাভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত — নিছক মতাদর্শ বা সম্ভবপরতার দ্বারা চালিত নয়। একথা ঠিকই যে, জনসমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রচুর ভ্রান্তি থাকে। গ্যালিলিওর সিদ্ধান্তকে সহজে সাধারণের যুগবাহিত চিন্তন গ্রহণ করতে পারে না। কিংবা ঈশপের গল্পের তিক্ত সত্যকে সামাজিকেরা সহজে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু জনসমাজের ভুল সিদ্ধান্তগুলির কারণ ইতিহাস সহজেই আবিষ্কার করতে পারে। কেননা ইতিহাসের চোখে এইসব ভুল সিদ্ধান্তগুলি মোটেই কাল্পনিক নয় - এক বিশেষ ঐতিহাসিক কালপর্বের ফসল। সমাজ ভাষাবিজ্ঞান এ কারণেই ঐতিহাসিকের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নের বিষয় :

“উইদাউট লিঙ্গুইস্টিকস্, দেয়ার উড বি নো ওয়ে অব নোয়িং হোয়াট হ্যাপেনড্ ডিউরিং দি পার্টিকুলার পিরিয়ড অব টাইম। (ডোনা’ল্ড এন. টুটেন ও ফার্নান্ডো টেজেডো : দি রিলেশনশিপ বিটুইন হিস্টোরিক্যাল লিঙ্গুইস্টিকস্ অ্যান্ড সোসিও-লিঙ্গুইস্টিকস্)।

আমাদের কাছে সমস্যা এই যে, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস যতটা ভারতীয় ততটা বঙ্গীয় নয়। কথাটির মধ্যে যে কেউ স্ববিরোধ আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার মুর্শিদকুলি খাঁ বা আলিবর্দ্দি - কেউই বাংলার মানুষ নন এবং নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাষ্ট্র শাসনের কেন্দ্র — শাসকের সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মের আওতা থেকে সেখানকার জনসমাজের আত্মরক্ষা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ও মুর্শিদাবাদ কাহিনী পড়লেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানসের বিবর্তনের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একালের লেখক বিদেশী ভাষ্যকারের মতের অনুগমন করেও (ইখতিয়ারউদ্দিন কখতিয়ার খিলজি প্রথম বাংলায় মুসলিম ভাবানুষঙ্গের বিস্তার ঘটান) জানান যে, ১২০৩ খ্রীঃ তুর্কি বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌল-ার পরাজয় পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশো বছরের মধ্যবর্তীকালে মুসলমান সমাজের পত্তন, গঠন ও

বিকাশ সম্পন্ন হয়। (নুরুল আমিন বিশ্বাস : মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানস, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা ২০১১, পৃঃ ৯)

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহসহ বঙ্গভাষী মুসলিম লেখকেরা এ-দেশীয় মুসলমানদের বাঙালি মুসলমান হিসাবে দেখতে ও আত্মপরিচয় দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু নুরুল আমিন দেখিয়েছেন যে, মুর্শিদাবাদে তুর্কি,মধ্যএশিয়া থেকে আগত মুঘল, আফগান, পাঠান, আরব ও পারস্য থেকে আসা সেখ বণিকদের বংশধারা সেভাবে রক্ষিত হয়নি। মুর্শিদাবাদের রাঢ় এলাকায় বহিরাগত মুসলমানদের বসতি স্থাপন শুরু হয় তুর্কি পাঠান মুঘল আমল থেকেই। জঙ্গীপুর, ভরতপুর ও সালারের বহু পরিবার বহিরাগত ও উর্দু ভাষী। মুর্শিদকুলির আমলে পারস্য থেকে বহু পরিবার মুর্শিদাবাদে এসেছেন। ভরতপুর সালার ও লালবাগ ও জঙ্গীপুরে এখনও এঁদের খোঁজ মেলে। উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত ফকিরেরা কৃষ্ণপুরের ফকিরপাড়ায় এবং জঙ্গীপুরের শাহজাদপাড়ায় বসতি করেন। সুতরাং মুর্শিদাবাদের মুসলিম সমাজেও তথাকথিত বর্ণ, আচারবিচার ও অর্থনীতিগত বিভাজন কম নয়। বৃত্তিভিত্তিক ভদ্রেতর মানুষের বিভাজনও মুর্শিদাবাদে যথেষ্ট। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে।

এই অঞ্চলের কথ্যভাষায় ইতিহাসের এসব সত্যের মুদ্রণ অনিবার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এই গবেষণাকল্প নিবন্ধে প্রসঙ্গটির প্রতি যথার্থ সুবিচার করা প্রায় অসম্ভব। এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপনের ইতিহাসকে লক্ষ্য করলে এর কথ্যভাষায় ভৌগোলিক পরিবেম, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত উচ্চারণ পদ্ধতি ধরা পড়ে।

মুর্শিদাবাদ : ইতিহাসের সাক্ষ্য

অষ্টাদশ শতকের বঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক টানাপোড়েনের, উত্থান পতনের সাক্ষী মুর্শিদাবাদ।

ইতিহাসের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, রাষ্ট্রিক ক্রান্তির সেই লগ্নে এই অঞ্চলের গ্রাম ও শহরের বহু মানুষের জীবনহানি ঘটে।১ঘ. মুর্শিদাবাদের কৃষি ও শিল্প ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মুর্শিদাবাদের পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ১৭৪০ খ্রীঃ মারাঠা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে যে আঘাত শুরু হয়েছিল তা পূর্ণ পরিণতি পেল ১৭৭২ খ্রীঃ মধ্যে। এই সময়ের পর থেকেই সমগ্র বঙ্গের সঙ্গে এখানকার দেশজ অর্থনৈতিক কাঠামো ও ধাপে ধাপে ভেঙে পড়তে থাকল এবং ব্রিটিশ প্রভাবিত, প্রবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত এক নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর আত্মপ্রকাশ শুরু হয়। ১ঙ.

ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে সঙ্গত কারণেই মুর্শিদাবাদের ভৌগোলিক পরিসীমা, নামকরণ, প্রশাসনিক সীমারেখার পরিবর্তন, জনসংখ্যা, পেশাবিন্যাস ইত্যাদি নিয়ে স্বল্পপরিসরে আলোচনা করা আবশ্যক।

মুর্শিদাবাদ : সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক তথ্য

প্রশাসনিক বিন্যাস অনুযায়ী বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থান দক্ষিণবঙ্গ বা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ২৩ ডিগ্রি ৪০`৩০``উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪ ডিগ্রি ৫০`২০`` উত্তর ও ৮৭ ডিগ্রি ৪৯`১৭``পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৮ ডিগ্রি ৪৬`পূর্ব

দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। জেলার আয়তন ৫৩২৪ বর্গকিমি।২. ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এ জেলার লোকসংখ্যা ৫৮,৬৪,২৯১ জন। জেলায় মহকুমার সংখ্যা ৫, উন্নয়ণমূলক আছে ২৬টি, নগর সংখ্যা ২৬, পৌরসভা আছে ৭টি।

নামকরণ :

প্রশাসনিক বিন্যাসের সময় জেলার নামকরণ হয়েছে মুর্শিদাবাদ শহরের নাম থেকে। ১৭০৪ সালে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁা প্রাদেশিক রাজস্ব সংগ্রহের কেন্দ্র ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ শহরে স্থানান্তরিত করেন। অবশ্য নগরের পত্তন দীর্ঘকাল আগেই হয়েছিল। বিভিন্ন গ্রন্থে এই নগরের বিভিন্ন নাম দেখা যায়। একটি মতানুসারে হুসেন শাহ আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) নানকপন্থী সন্ন্যাসী মুকসুদন দাস এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর নামেই এই নগরের নাম হয় মুকসুদাবাদ।৩.

এই শহরের উলে-খ মেলে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রচিত ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মান্ড খন্ড অংশেও। সেখানে এই নগরের নাম মোরাসুদাবাদ, যা কোনও এক যবন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তবে বিভিন্ন নাম প্রচলিত থাকলেও মুর্শিদকুলি খাঁ সারা প্রদেশের রাজস্ব কেন্দ্র এখানে স্থানান্তরিত করার আগে দুটি নাম বহুল প্রচলিত ছিল তা হল মুকসুদাবাদ, অপরটি মখসুদাবাদ। শাসনকেন্দ্র এবং স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহের কেন্দ্রস্বরূপ এ শহরের গুরুত্ব ছিল। সর্বোপরি এখানে একটি টাকশাল ছিল। ১৬৭৯ খ্রীঃ মুকসুদাবাদ টাকশালে মুদ্রাঙ্কিত একটি মুদ্রা সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

রিয়াজ-উস-সালাতিন অনুযায়ী মকসুস খান নামে এক বণিক এখানে সরাইখানা তৈরি করেন। এই বণিক ও আইন-ই-আকবরীতে উলে-খিত মকসুস খান একই ব্যক্তি। আকবরের কার্যকালে বাংলার সুবাদার সঈদ খানের ভাই ছিলেন মকজুস খান। পাটনা জেলার হাজিপুরে মকসুস খানের তৈরি পাথরের মসজিদ আছে। ১৭৮৬ খ্রীঃ লেখা সিয়ার-উল-মুতারিণের অনুবাদক রেমন্ডের মতে স্থানটির প্রাচীন নাম 'মুরসুদাবাদ', পরবর্তী নাম 'মকসুসাবাদ' এবং সবশেষে হয় 'মুরশিদাবাদ'।

আবার এও প্রচলিত ইতিহাস যে, ১৭০০ সালে ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলার দেওয়ান এবং মকসুসাবাদের ফৌজদারি নিযুক্ত করেন। পরে মুর্শিদকুলিই ঢাকা থেকে রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্রও মকসুসাবাদে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাকে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলি নাজিম পদাভিষিক্ত হওয়ার পর শহরের নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ এবং মুর্শিদাবাদ নগর হয়ে ওঠে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার রাজধানী। পুরানো নামটিও বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। ১৭৬০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজে মুকসুসাবাদ নামটি দেখা যায়। মুদ্রায় নামাঙ্কণের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে নামকরণের সাল নির্দিষ্ট করা যায়। ১৭০৪ খ্রীঃ 'মুকসুসাবাদ' টাঁকশালে শেষ মুদ্রাঙ্কণ হয় এবং ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে 'মুর্শিদাবাদ' টাঁকশালে প্রথম মুদ্রাঙ্কন হয়।

মুর্শিদাবাদ প্রশাসনিক সীমারেখার পরিবর্তন

মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে এবং দক্ষিণ পূর্বে বর্ধমান এবং নদীয়া জেলা। দক্ষিণ পূর্বের এই অংশে নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের সীমা চিহ্নিত করেছে জলঙ্গী। মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমে, দক্ষিণ পশ্চিমে বীরভূম এবং সাঁওতাল পরগণা জেলার উত্তর এবং উত্তর পূর্বে গঙ্গা এবং পদ্মা মালদহ জেলা এবং বাংলাদেশ। ফলে পার্শ্ববর্তী জেলা, প্রদেশ কিংবা রাজ্যের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রভাব মুর্শিদাবাদের প্রান্তীয় এলাকায় ছড়িে রয়েছে। এছাড়াা ১৭৯৩ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এই জেলার সীমারেখা প্রশাসনিক কারণে বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। 'নবাবী আমলে মুর্শিদা-চাকলার অন্তর্গত ছিল মালদহ-পাবনা-রাজশাহী-নদীয়ার অংশবিশেষ, বগুড়া বীরভূমের একাংশ এবং ভাগলপুর। ইংরেজ আমলে এ জেলার সীমারেখার নানা পরিবর্তন ঘটেছিল।

রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কমিটি অব্ রেভেনিউ গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির পরিবর্তে বোর্ড অব্ রেভেনিউ কাজ শুরু করে ১৭৮৬ সালে। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট স্যার জন শোরের প্রস্তাব মোতাবেক ১৭৮৭ সালের ২৯ মার্চ ক্যালকাটা গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে ফতেসিং পরগণাকে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।৪. বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের জমিদারি সে সময় মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ একই তারিখে (২৯-০৩-১৭৮৭) বীরভূমকে যুক্ত করা হল বিষ্ণুপুরের সঙ্গে।

১৭৯৩ সালের ১১ জানুয়ারি গভর্নর জেনারেল-এর আদেশে —৫

১.পদ্মার পশ্চিমে 'নিজ রাজশাহী'র এলাকা ছিল তার একাংম মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত হল। বাকি মহলগুলি নদীয়ার সঙ্গে যুক্ত হল।

এমনভাবে মহলগুলির পুনর্বিন্যাস করা হল যাতে জেলার সীমানা পদ্মা বা গঙ্গার উভয় তীরে না থাকে। (জেলা বিন্যাসে প্রধান নদীগুলির একটা ভূমিকা থাকে ভাগীরথীর এপারে কলকাতা, ওপারে হাওড়া জেলা। এপারে উত্তর চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া, ওপারে হুগলি জেলা। এপারে মুর্শিদাবাদ, ওপারে মালদহ। বাগের খাল নামক জল বিভাজিকাটি নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগণাকে পৃথক করেছে। এর ব্যতিক্রমও আছে — ভাগীরথীর অপর পারে হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিক কারণে নবদ্বীপ প্রশাসনিকভাবে নদীয়া জেলার মধ্যে থেকে গিয়েছে। কিন্তু ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে অধুনা নবদ্বীপের সঙ্গে বর্ধমান জেলার স্বাভাবিক সংযোগকে স্বীকার করতে হবে। নদী ও নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের নদীজীবন সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন ও যাপনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং একটি অঞ্চলের ধারণা করতে গেলে ভূগোল, প্রশাসনিক বিন্যাসসহ একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রকল্পনা গঠন করতে হয়।৬) ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩ মুর্শিদাবাদের ২৫০টি গ্রাম প্রশাসনিক কারণে যুক্ত করা হল বীরভূমের সঙ্গে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জেলার বর্তমান ভৌগোলিক পরিধির উত্তর পশ্চিমাংশের কিছু এলাকা মুর্শিদাবাদের অন্ত র্ভুক্ত ছিল না। অন্যদিকে সে সময় বীরভূম জেলার সমগ্র রামপুরহাট মহকুমা এবং সদর মহকুমার একটি অংশ মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ছিল। সমকালীন বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় জেলাগুলির মধ্যে সীমানা নির্দেশ নিয়ে সংশয় ছিল। জমির মালিকানা, রাজস্ব আদায়, ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ এসব বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত। তা সত্ত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে

র পর ১৭৯৪ - ৯৭ এ সময়ে কয়েকটি ছোটখাটো রদবদল ছাড়া কোন পরিবর্তন ঘটেনি।
৩. ১৮০৬ সালে মুর্শিদাবাদ জেলাকে বিলোপ করার কথা ভাবা হয়েছিল। এমনকি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা জজের পদ অবলুপ্তও করে দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কালেক্টরশিপ্ বিলোপ করে বীরভূমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। কিন্তু ভাগীরথীর পশ্চিমের বিস্তীর্ণ এলাকা — সাকুলিপুর (নানুর), পাঁচমুণি (বড়এঞা), দুনগ্রাম(দুনিগ্রাম), পলসা, নলহাটি এই থানাগুলিকে বীরভূমের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল। (রেগুলেশন — ১, ১৮০৬)৭.
৪. ১৮০৯ সালে বীরভূমের কালেক্টর-এর পদ অবলুপ্ত হল। বীরভূম যুক্ত হল মুর্শিদাবাদের সঙ্গে এবং একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর (সিউড়ি) ঐ অংশের দায়িত্বে থাকলেন। ঐ বছরই আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য মুর্শিদাবাদের বেশিরভাগ অংশ চলে গেল বীরভূমের জজের হাতে। ১৮২০ সালে আবার বীরভূম স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পায়।
৫. ১৮২৪ সালের ১৭ মার্চ লন্ডন চুক্তির বলে ডাচদের কাছ থেকে কাশিমবাজার সন্নিহিত কালিকাপুর গ্রাম মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।
৬. ১৮৩৪ -এ পলসা থানা এল মুর্শিদাবাদে, কিন্তু ভরতপুর থানা যুক্ত হল বীরভূমে। ১৮৩৯ -এ পলসা থানা আবার যুক্ত হল বীরভূমের সঙ্গে। ১৮৫৪-এ ভরতপুর থানা মুর্শিদাবাদে ফিরে এল। জলঙ্গী ও নওদা থানা যুক্ত হল নদীয়ার সঙ্গে। তৈরি হল করিমপুর মহকুমা।
৭. ৮-৩-১৮৫৪ সালে ভাগলপুর থেকে ও কালিকাপুর ফারাক্কাবাদ থানা মুর্শিদাবাদে এল।
৮. ১৮৫২-৫৫ এ কর্ণেল গ্যাসট্রেলের পরিচালনায় জেলায় জরিপ হয় যা রেভেনিউ সার্ভে নামে পরিচিত। সে সময় জেলায় ছিল উনিশটি থানা — সামশেরগঞ্জ, সুতী, মীর্জাপুর, খামরা(এখন রঘুনাথগঞ্জ), দেওয়ান সরাই (এখন লালগোলা), রাণীতালাস, গোয়াস (বর্তমান হরিহরপাড়া), দৌলতবাজার (দৌলতাবাদ), উত্তর শহর থানা (বর্তমান কান্দী), দক্ষিণ শহর থানা (বর্তমান বেলডাঙা), চায়েনডাঙা (অমৃতকুন্ডের কাছে), কল্যাণগঞ্জ (নবগ্রাম), বদ্রীহাট (বর্তমান সাগরদীঘি), গোকর্ণ, খড়গ্রাম ও ভরতপুর।

প্রশাসনিক এলাকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহের এককগুলি ক্রমশ অবিন্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। গ্যাসট্রেলের প্রতিবেদন অনুসারে প্রথমে বিভাগগুলি ছিল সুসংবদ্ধ । জমি হাত বদলের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিত নানা অসঙ্গতি। একটি পরগণা বা জেলার বাসিন্দা যদি অন্য কোন পরগণা বা জেলার জমির মালিক হয়, তার মূল জমি যে পরগণার সেখানে রাজস্ব তালিকায় নতুন জমিটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে একটি জেলার জমি ঢুকে পড়ে অন্য জেলার রাজস্ব তালিকায়। মুর্শিদাবাদের রাজস্ব তালিকায় দেখা যায় ঢুকে পড়েছে ঢাকা ও চব্বিশ পরগণার জমি।
৯. ১৮৫৫-৫৬, রেভেনিউ সার্ভের পরে দশ হাজারী পরগণা মুর্শিদাবাদ থেকে সাঁওতাল পরগণার সঙ্গে যুক্ত হয়।৮
১০. ১৮৬৩ সালে নদীয়া থেকে বিধুপাড়া,লোকনাথপুর, একডালা নাজিরপুর, আন্দুলবেড়িয়া, ডাকাতিয়াপোতা, বালি প্রভৃতি ৩৪০টি গ্রাম মুর্শিদাবাদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১১. ১৮৭৫ সালে গঙ্গার দক্ষিণতীরে মালদহ জেলার যে গ্রামগুলি ছিল তা মুর্শিদাবাদে এল। গঙ্গা,পদ্মা ও জলঙ্গী হল জেলার যথাক্রমে উত্তর পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব সীমানা। পশ্চিমে বীরভূম থেকে স্বরূপ সিং, শেরপুর ও কুনপুর পরগণার ৩৯টি এবং সাঁওতাল পরগণা জেলার কাকজোল পরগণা থেকে ৭টি গ্রাম মুর্শিদাবাদে যুক্ত হল। এই বিজ্ঞপ্তিতেই মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিটি থানার অধীনস্থ অঞ্চলগুলি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়।
১২. ৩০-১০-১৮৭৬ তারিখে মুর্শিদাবাদের ১৭০টি গ্রাম যুক্ত হল বীরভূমের সঙ্গে।
১৩. ১৮৭৯-এ বড়এঞা থানা বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদে এল। রামপুরহাট ও নলহাটি চলে গেল বীরভূমে। ঐ বছরে সামশেরগঞ্জ, সুতি, রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা, ভগবানগোলা, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর, হরিহরপাড়া, রাণীনগর, বেলডাঙা, ডোমকল, নওদা, জলঙ্গী, নবগ্রাম, কান্দী, খড়গ্রাম, ভরতপুর ও বড়এঞা এই কুড়িটি থানা ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। ঐ বছর থেকে জেলার গঠন ও আয়তন মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। এরপর ১৯২৫ সালে পদ্মার গতিপথের বিচ্যুতির জন্য জেলার পরিধি সামান্য পরিবর্তিত হয়। ঐ বছর ১৫ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তির (৩৫১৪ পি:এন) বলে রাজশাহী জেলার চারটি গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।
১৪. ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়। বাংলা হয় খন্ডিত। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদা ঘোষিত হবার পর মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলেও র‍্যাডক্লিফ রেখা বরাবর পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমানা চিহ্নিত করতে গিয়ে কিন্তু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। র‍্যাডক্লিফের নির্দেশ অনুযায়ী গঙ্গা-পদ্মার মূলস্রোতের ঠিক মাঝখান বরাবর আন্তর্জাতিক সীমানার অবস্থান। কিন্তু কাছে পদ্মানদীতে কয়েকটি চর থাকায় এখানে মধ্যস্রোতের নিশানা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই সংশয় নিরসনের জন্য ১৯৪৯ সালে গঠিত হয় বাগে ট্রাইব্যুনাল। বাগে ট্রাইব্যুনালের আদেশে বলা হয় মাথাভাঙা নদীর মূলস্রোতের মাঝ বরাবর ভারত-পাকিস্তানের সীমানা রেখা। ১৯৪৮ সালের এয়ার ফটোগ্রাফ অনুযায়ী জলঙ্গী গ্রামের থানা ও ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডের দক্ষিণ পশ্চিম বিন্দু অর্থাৎ নদীয়া জেলার উত্তর পূর্ব কোণে গঙ্গানদীর থানার সীমানার উত্তর পর্যন্ত দক্ষিণাভিমুখে তা বয়ে চলে। মাথাভাঙার উৎসবিন্দু থেকে গঙ্গা-পদ্মার মূলস্রোতের মধ্যে যে বিন্দুর সরলরৈখিক দূরত্ব সব থেকে কম হবে, সেই বিন্দুটি হবে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমানার দক্ষিণ পূর্ব বিন্দু। এই বিন্দু থেকে গঙ্গা-পদ্মার মূলস্রোতের মাঝ বরাবর ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমানা নির্দিষ্ট হবে। বাগে ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী চর শরন্দাজপুর ও পার্শ্ববর্তী একটি চরের কিয়দংশ মুর্শিদাবাদ তথা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকাংশ চর এলাকা চলে যায় সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে। এই হল বর্তমান মুর্শিদাবাদের গঠন।

পেশাবৈচিত্র্যের আভাস :

পেশা ও বৃত্তিবিন্যাসের বর্তমান এই পরিসংখ্যান তখনই জীবন্ত হয়ে ওঠে যখন আমরা

দেখি যে, এই অঞ্চলের হিন্দু জনগোষ্ঠীর পেশাগত জীবনের সঙ্গে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বৃত্তির ভিত্তিগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সামাজিক সত্যের দিকে আমাদের মনোযোগ নির্দেশ করে। কাঁসা, মিষ্টান্ন কিংবা শঙ্খশিল্পে যেমন হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য তেমনই মুসলিম জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। নুরুল আমিন বিশ্বাস পূর্বোক্ত গ্রন্থে তার একটি বিশ্বস্ত ছবি তুলে ধরেছেন। —তাঁকে অনুসরণ করে আমরা মুর্শিদাবাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের বিচিত্র পেশা পরিচয়ের একটা ধারণা পেতে পারি।

হিন্দু জনগোষ্ঠীর মতো অধিকাংশ মুসলিমই কৃষিজীবী ও নিতান্ত দরিদ্র। এই অঞ্চলে বহুসংখ্যক বিহারি মুসলমান এসে বসবাস শুরু করেন এঁরা জাতে জোলা বা আনসারি মোমিন তাঁতি। জঙ্গীপুরের বরজ, মহম্মদপুর, রঘুনাথপুর, বাঁধের ধার, মির্ধাপাড়া, ফুলবাড়ি, অরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান, বেলডাঙা ইত্যাদি স্থানে এই জোলাদের দেখা যায়। আমিন জানাচ্ছেন যে, খোট্টা বা খোট্টাই নামে এঁদের নিজস্ব এক ভাষা আছে। আমাদের অনুমান — খোট্টাই পুরোপুরি মুখের ভাষা। হরিহরপাড়ার তরতীপুরে থাকেন বেদেরা। লালবাগে মুসলিম সাফাইকর্মীর দেখা মেলে। এঁদের অধিকাংশ এখন চর্মকারের কাজ করেন। হরিহরপাড়ার গঙ্গাধারিতে মুসলিম চাঁইরা বাস করেন। কান্দির হিজলে বাস করেন মুসলিম নিকিরি সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁদের পেশা মাছ ও শুটকি মাছের ব্যবসা। ধুলিয়ান, ভগবানগোলা, জঙ্গীপুর ও আখেরিগঞ্জে বেশ কিছু মুসলিম পরিবার মাছের ব্যবসা করতো। হরিহরপাড়ার স্বরূপপুরে, ডোমকলের ভাতশালায় বাস করেন লাহাড়ি সম্প্রদায়। এঁদের জাত ব্যবসা লাক্ষার ব্যবসা। সাগরদিঘির বালিয়াতে বাস করেন আবদাল সম্প্রদায় — এঁরা গোরু, মোষ,ছাগলকে খাসি করেন। লালবাগের মেহনারা ধাই এবং হাম্বেলা। এঁদের পুরুষেরা ঘোড়ার পায়ে নাল পরানোর কাজ করেন। বহরমপুরের খর্সাডাঙা, হরিহরপাড়ার দস্তুরপাড়া, নওদার ডাঙাপাড়ার ভরোরা সম্প্রদায়ের মুসলিমরা বাসনের ফেরিওয়ালার কাজ করেন। সুতী এবং দোগাছির শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীর পেশা বিয়ের নাচ, গান ও কাপ করা। কান্দি মহকুমার গোকর্ণ, পাঁচথুপী, দক্ষিণখন্ড, গোলাহাট, কাঁতুরহাট, ছাতিনাকান্দি, বসোয়া বিষ্ণুপুরে পটুয়া সম্প্রদায় বাস করেন। এঁরা অনেকেই সাপুড়েগিরি করে, বাঁদর নাটিয়ে, ভালুক নাচিয়ে, পাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এঁদের অনেকে আবার পট আঁকেন, পট খেলান। রঘুনাথগঞ্জের আবদাল সম্প্রদায় চাষবাসের সঙ্গে ঘুঁটে বিক্রি করেন।

মুর্শিদাবাদের বহুমানুষ হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মকেই আচরণের মধ্যে দিয়ে পালন করেন। লালবাগের কুমীরদহ ও ধরমপুরে মুসলমান কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বাস দেখা যায়। পটুয়া, সাপুড়ে, বেদে, লালবেগি এবং আবদাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা উভয় ধর্মকেই মান্য করে চলেন। হরিহরপাড়ার খামারমাটি, জামনাবাদ, শঙ্করপুর, তরতীপুর, ডোমকলের কুমারপুর, বেলডাঙার রতনপুর, ব্যাধবেড়িয়াতে বহু দাফালি পরিবার বাস করেন। এঁরা পাঁচপীর ও মানিকপীরের উপাসক। এঁরা একদিল পীরের গানের প্রবর্তক।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের মুখের ভাষায় এই বিচিত্র পেশা ও ধর্মাচরণের গভীর প্রভাব পড়েছে। পেশাগত ভাষা বা প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়াও এই বিমিশ্র জনসমাজের ভাষা ব্যবহারে সীমাহীন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। বহুজনের মিলিত প্রয়াস এবং বিস্তৃত পরিসর

ছাড়া তার পরিচয় উদ্ধার করা দুঃসাধ্য সন্দেহ নেই। আমরা সংক্ষিপ্ত সময় ও পরিসরে তার কিছু অগোছালো নমুনা হাজির করতে পারি মাত্র।

তথ্যসূত্র ঃ

১. মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার: ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জেলাশাসক ও সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ,নভেম্বর, ২০০৩, পৃঃ ১।

১ক. শতঞ্জীব রাহা: অঞ্চলচর্চার তত্ত্ববিশ্ব (প্রকাশিতব্য), আজকের প্রতিভাস, পৃঃ ১২-১৩।

১খ. তদেব।

১গ. তদেব, পৃঃ ১৮।

১ঘ. মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১।

২. মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার: ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জেলাশাসক ও সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ, পৃঃ ১।

৩. তদেব, পৃঃ ৩।

৪. তদেব, পৃঃ ৩।

৫. তদেব, পৃঃ ৩।

৬. শতঞ্জীব রাহা: পূর্বোক্ত , পৃঃ ১৯।

৭. মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার, পৃঃ ৩।

৮. তদেব, পৃঃ ৪।

ভারত ইসরায়েল সম্পর্কে নতুন মোড়

ডঃ সিরাজুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ (রানাঘাট কলেজ) নদীয়া।

জন্মের প্রায় সাথে সাথে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দান করলেও ভারত পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছির প্রায় ৪২ বছর পর। ভারতের প্রথম দিকের ইসরায়েল নীতি ছিল 'না শত্রু না মিত্র'। ভারতের নীতি ছিল আরবপন্থী কিন্তু ভারত নানা বিষয়ে আরব দেশগুলির কাছ থেকে যথাযথ সমর্থন না পেয়ে কূটনৈতিক নীতিতে পরিবর্তন করে বাস্তবমূখী বিদেশনীতি অনুসরণ শুরু করে। ভারতের ইসরায়েল নীতিতে নতুন মোড় এল ১৯৯২ সালে, পি.ভি.নরসীমা রাওয়ের আমলে।

ভারত ইসরায়েল সম্পর্ক দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায় ১৯৫০-১৯৯২ এবং দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৯২ এর পরবর্তীকাল। প্রথম পর্বে, ভারতের ইসরায়েল নীতি হল ধারাবাহিকতার নিদর্শন যা কিছুটা আদর্শবাদ দ্বারা চালিত আর দ্বিতীয় পর্ব হল পরিবর্তনের যুগ যা কঠোর বাস্তববাদী নীতি দ্বারা প্রভাবিত। প্রথম পর্যায় পরিচালিত হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দদের দ্বারা যারা স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকবাদের বিরোধী। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকবাদ থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর এবং দরিদ্র দেশগুলিকে নিয়ে তৈরি করেছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ছিলেন বিদেশনীতির রূপকার। ইসরায়েলকে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে সামিল করা হয়নি কেননা তাকে সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ হিসাবেই দেখা হত। ভারত এবং ইসরায়েল দুটি দেশই স্বাধীনতা লাভ করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে এক বছরের ব্যবধানে। দুটি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য হল ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে কোন প্রশ্নচিহ্ন নেই। আর ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের বৈধতাকে স্বীকৃতি দেয়নি অনেক দেশ।

ভারত ও ইসরায়েল উভয়ই গণতান্ত্রিক দেশ। তবুও ভারতের সাথে অনেক বিষয়ে ইসরায়েলের তুলনা চলে না। আকারে আয়তনে জনসংখ্যায় ইসরায়েল ভারতের নিরিখে নগন্য। ২০১১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১২৫ কোটি আর ইসরায়েলের মাত্র ৭৮ লাখ। আয়তন বা জনসংখ্যা যে আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তারের মাপকাঠি হতে পারে না ইসরায়েল তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বিশ্ব রাজনীতির এখনও যারা নিয়ন্ত্রক সেই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইসরায়েলের প্রভাব অতিমাত্রায় বেশি। ইহুদিরা অবশ্য তাদের কর্মকান্ড দ্বারা বিশ্বের সমীহ আদায় করে নিয়েছে। ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বর্তমানে সকলেই আগ্রহী। সুতরাং ভারত ব্যতিক্রম হয় কি করে? ভারতও তাই ইসরায়েলের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছে।

ইসরায়েল রাষ্ট্রটি তৈরি হয়েছে প্যালেস্টাইনকে দ্বিখন্ডিত করে ধর্মের ভিত্তিতে। জিওলবাদ হল এই রাষ্ট্রের প্রাণ। দেশ গঠনে ধর্ম কখনও ভিত্তি হতে পারে না এমনটাই ছিল ভারতীয় নেতাদের বিশেষত প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর অভিমত। ভারত

দ্বিখন্ডিত হয়েছিল ধর্মকে ভিত্তি করে। তাই একটা আদর্শগত অবস্থান থেকেই ভারত উসরায়েলকে সমর্থনে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানকল্পে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৪৭ এর মে মাসে ইউনাইটেড নেশনস্ স্পেশাল কমিটি অন প্যালেস্টাইন গঠন করেছিল। ভারত তখনও স্বাধীন হয়নি তবুও এই কমিটির ১১জন সদস্যের অন্যতম ছিল ভারত। কমিটির ৮ সদস্য প্যালেস্টাইনকে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে ভাগ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। ভারত, ইরান ও যুগোশে-াভিয়া এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মতপ্রকাশ করেছিল। ভারত ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়েছিল। সেই সুবাদে ১৯৪৮ এর মে মাসে ইসরায়েল রাষ্ট্র তৈরি হয়। ভারত সঙ্গে সঙ্গে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়নি। এই বিষয়ে ভারত তার স্বাধীনতার আগের নীতিই অনুসরণ করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা পালেস্টাইনে ইহুদিদের চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিল। ১৯৩৬ সালে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি এক বিবৃতিতে জানিয়ে ছিল কংগ্রেস ইউরোপে ইহুদিদের দুর্ভোগের প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু ব্রিটিশ সমরাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা করছে তা নিন্দাজনক। কমিটি বিশ্বাস করে যে আরব ও ইহুদিরা প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করবে যেখানে ইহুদিদের জন্য যথেষ্ট সাংবিধানিক সুরক্ষা থাকবে। মহাত্মা গান্ধী হরিজন পত্রিকায় লিখেছিলেন " ইহুদিদের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে... আমি তাদের উপর বহু বছরের অত্যাচার সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু আমার সহানুভূতি আমাকে ন্যায় বিচারের প্রয়োজন সম্পর্কে অন্ধ করেনি। আমার কাছে ইহুদিদের জাতীয় স্বদেশভূমি গঠনের জন্য কান্নার কোন আবেদন নেই ... অন্য বহু মানুষের ন্যায় তারা কেন যে দেশ তাদের খাদ্য বাসস্থান দিয়েছে সেই দেশকে নিজেদের স্বদেশভূমি করে নেয় না। ঠিক যে অর্থে ইংল্যান্ড ইংরেজদের, ফ্রান্স ফরাসিদের ঠিক সেই অর্থে প্যালেস্টাইন আরবদের।

ভারত ইসরায়েলকে প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে স্বীকৃতি না দিলেও ইহুদি রাষ্ট্রদের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করত না। প্রথম দিকে এর স্থায়িত্ব নিয়ে হয়ত ভারতের সন্দেহ ছিল। "নূতন একটি দেশের সবে জন্ম হয়েছে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে" - এই ছিল প্রধানমন্ত্রীর অভিমত। এরপর ইসরায়েল রাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকলে ভারতের অবস্থানও ইতিবাচক হতে থাকে। এই রাষ্ট্র জন্মের কয়েকমাস পরে নেহেরু বলেন, "ইসরায়েল রাষ্ট্রের ন্যায় কাজকর্ম করছে।" আরও কয়েকমাস পর বলেন, "ইসরায়েলের স্বীকৃতিদান অনন্তকাল পিছিয়ে দেওয়া যাবে না এবং ভারত সরকার এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষপাতী।" আরও কয়েকমাস পর বলেন "ইসরায়েল রাষ্ট্র একটি ঘটনা যা আমরা স্বীকার করি।" ১৯৪৮ এর মে মাস থেকে ১৯৫০ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেহেরুর এই চারটি বিবৃতি প্রমাণ করে যে ভারতের ইসরায়েল নীতি ধাপে ধাপে স্পষ্টতর হয়েছিল। ১৯৫০ এর ১৮ই সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দান করে। এর কারণ ব্যাখ্যা করে সরকারি বললেন, "গত দুবছর ধরে ইসরায়েল টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে।" তাই স্বীকৃতি দান।

স্বীকৃতি দিলেও প্রথম পর্বে ভারতের নীতিতে ইসরায়েল বিরোধিতার ছাপ স্পষ্ট।

ভারত ধারাবাহিকভাবে সমর্থন করেছিল আরব দেশ ও প্যালেস্টাইনকে। ১৯৫৬ সুয়েজ খাল জাতীয়করণ নিয়ে বিতর্কে ইসরায়েল দ্বারা মিশর আক্রমণ এবং পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইঙ্গ-ফরাসি জোটের সাথে হাত মিলানোর নিন্দা করে ভারত। এই ঘটনার অন্যতম কারণ ছিল ভারত দ্বারা ইসরায়েল এর সাথে পূর্ণ কূটনৈতিক স্থাপন না করা। নেহেরুর মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে ভারত আর বেশি আরবপন্থী নীতি অবলম্বন করেছিল। ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেও পূর্বতন নীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই সময় রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইসরায়েল ভারতে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য সাহায্য পাঠিয়েছিল কিন্তু ভারত তা রাজনৈতিক কারণে গ্রহণে অস্বীকার করেছিল। সাংস্কৃতিক আদান প্রদানও হ্রাস পেয়েছিল। ইসরায়েলের ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা এর অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হয় নি যদিও এর পরিচালক ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জুবিন মেহতা।

১৯৬৭ এর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ভারত আরবদের পক্ষ নিয়েছিল। এই যুদ্ধের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছিল ভারত। ১৯৭৩ সালের আরব ইসরায়েল যুদ্ধে ভারত ইসরায়েলকে নিন্দা করে এবং সমর্থন করেছিল মিশর ও সিরিয়াকে। ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার গঠিত হলে অনেকে ভেবেছিল ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতিতে নিশ্চিত পরিবর্তন আসবে কিন্তু বিদেশ মন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সেই আশায় জল ঢেলে ঘোষণা করলেন পশ্চিম এশিয়া নীতিতে এখনই বদলের সম্ভাবনা নেই আর এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না। ১৯৭৯ সালে মিশর ও ইসরায়েলের মধ্যে শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হলে ইসরায়েল আশা করেছিল ভারতের নীতির পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু তা হয়নি। ইন্দিরা সরকার ইসরায়েলকে সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্র বলে মনে করত। ১৯৮২ তে ইসরায়েল লেবানন দখল করলে বোম্বের ইসরায়েল মিশনের মর্যাদার অবনমন ঘটানো হয় এবং একই বছরে অনুষ্ঠিত দিলি- এশিয়ান গেমসে ইসরায়েলি ক্রিয়াবিদদের যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। রাজীব গান্ধীর আমলেও (১৯৮১৯৮৯) এই ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ পড়েনি। এর আগেও ভারত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপিত অনেক ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিল। ১৯৭৪ পি এল ও কে পর্যবেক্ষণকারী দেশের মর্যাদা দেওয়ার নীতিকে ভারত সমর্থন করেছিল এবং ১৯৭৫ পি এল ও কে প্যালেস্টাইনের জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি স্বীকৃতি দিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ক্রিয়া বয়কট ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ সালে জিওনবাদকে বর্ণবিদ্বেষ এর সাথে সমতুল করে রাষ্ট্রসংঘে যে ৩৩৭৯ রেজুলিউশন পাশ করা হয়। ভারত তার সপক্ষে ভোট দিয়েছিল।

ভারতের আরবদের সমর্থনের পিছনে ছিল একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আদর্শ অন্যদিকে ছিল ইসলামিক প্রশ্নটি। আরবদের আন্দোলনকে ভারত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে ভাবত অন্যদিকে ইহুদিদেরস্বদেশভূমি গঠনের উদ্যোগকে দেখেছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ রূপে। ভারতে বিরাট মুসলিম জনসংখ্যা এবং তাদের সমধর্মী আরবদের সাথে একাত্মবোধের কথা ভারতকে ভাবতে হয়েছিল। নেহেরুর আমলে শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন মধ্যপ্রাচ্য নীতি তৈরিতে মূল কারিগর।

তিনি নেহেরুকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ইসরায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করলে মুসলিম সম্প্রদায় এবং আরব দেশগুলি অসন্তুষ্ট হতে পারে। মাইকেল ব্রেচার, নেহেরুর জীবনীকার, এমনও বলেছেন যে," আজাদ যতদিন রাজনীতিতে সক্রিয় থাকবেন ততদিন ভারতের মধ্যপ্রাচ্য নীতি বদলাবে না।" ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরবদেশগুলি থেকে খনিজতেল আমদানির ওপর নির্ভরতা ইসরায়েল নীতি রচনায় প্রভাব ফেলেছিল। পাকিস্তানের কূটনৈতিক প্রভাব স্বধর্মী আরব দেশগুলির ওপর আটকানোর বাসনাও প্রভাব ফেলেছির এই নীতি প্রণয়নে। নেহেরুর আমলে অনুসৃত সীমাবদ্ধ ইসরায়েল নীতিতে পরবর্তীকালেও বিশেষ হেরফের হয়নি।

ভারত ইসরায়েল সম্পর্কের দ্বিতীয় পর্বটা হল পরিবর্তনের যুগ। আরবদের নীতির কারণেই ভারতের ইসরায়েল নীতিতে পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৬২ তে ভারত-চিন যুদ্ধে আরবদের প্রতিক্রিয়ায় ভারত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আবার পাকিস্তান কেন্দ্রিক বিষয়ে আরব দেশগুলি সর্বদা ভারত বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীর বিষয়ক এক রেজিউলেশনে মিশর ভোটদানে বিরত থাকে আর অন্য দেশগুলি পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। ১৯৬৫ তে দ্বিতীয় ভারত পাক যুদ্ধে মিশর বাদে অন্য কোন আরব দেশ ভারতের পাশে থাকেনি। সৌদি আরব ও জর্ডন পাকিস্তানকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিয়েছির আর ইরান ও তুরস্ক সামরিক সাহায্যদান করেছিল পাকিস্তানকে। ভারতের আরবপন্থী নীতি অব্যাহত থাকলেও আরবদের ভারত নীতি অনেক সময় ছিল হতশাব্যঞ্জক। ১৯৭১ এর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে মিশর, আলজেরিয়া ও সিরিয়া নিরপেক্ষ ছিল। কুয়েত, সৌদি আরব ও জর্ডন ভারতের নিন্দা করেছিল। লিবিয়ার নেতা কর্নেল গাদ্দাফি ভারতের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বর্ণ সিংহ আরবদের প্রতিক্রিয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে বিরোধিতার পর্বেও ১৯৬২, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ এর যুদ্ধসমূহে ভারতকে যীমিত আকারে সমরাস্ত্র সরবরাহ করেছিল ইসরায়েল।

ধারাবাহিকতার পর্বেও ভারতের আরবপন্থী নীতি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল অনেক সময়। দেশের অভ্যন্তরে একদল রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির একাংশ ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দাবী জানিয়েছিল। হিন্দু মহাসভা, স্বতন্ত্র পার্টি, সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি, ভারতীয় জনসংঘ, প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি বিভিন্ন সময়ে সরকারের ইসরায়েল নীতির সমালোচনা করেছিল। একদল বুদ্ধিজীবী ১৯৬০ এর দশক থেকেই ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকে সমর্থন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন কবি ও জাতীয়তাবাদী নেত্রী সরোজিনী নাইডু, সাংবাদিক ও লেখক খুশবন্ত সিংহ, ফ্রাঙ্ক মোরেস, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার প্রমুখ। এদের অনেকে যুক্ত ছিলেন ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড অব ইসরায়েল নামে একটি সংস্থার সাথে। এদের সমর্থন ইসরায়েলে প্রশংসিত হয়েছিল যদিও ভারতের বিদেশনীতি নির্ধারণে তাদের কোন প্রভাব ছিল না।

ভারতের অভ্যন্তরে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দাবী ক্রমশ জোরাল হতে থাকে। অনেকেই অভিযোগ করেন ইসরায়েলের প্রতি প্রকাশ্য বিরোধিতার কারণে ভারত মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি ঘটেনি। মার্কিন কংগ্রেসের অনেক ইহুদি সদস্য যারা ভারতের

সমর্থক ছিলেন কিন্তু ভারতের ইসরায়েল নীতির কারণে তারা ভারতের থেকে দূরে ছিলেন। ওয়াশিংটনে এই ইহুদি লবির সহযোগিতায় ভারত ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করে। ১৯৮৭ সালে AIPAC (American Israel Public Affairs Committe) আমেরিকা কর্তৃক পাকিস্তানকে AWACS বিক্রির প্রস্তাব আটকে দিয়েছিল। ভারত খুশি হয়ে ক্রিয়া বয়কট তুলে নেয় এবং ক্ষমতার পরিসর বাড়ানো হয় ইসরায়েলের বোম্বে মিশনের। কাশ্মীর প্রশ্নে ইসরায়েল লবির সহযোগিতাকে দরকারি মনে হল। কাশ্মীর নিয়ে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশনের বারংবার পাকিস্তানের সমর্থনে রেজিউলেশন পাশ ভারতকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ইসরায়েল তাস খেলতে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ বেড়েছিল সরকারের ওপর। ভারতের স্বার্থের সাথে জড়িত এমন বহু বিষয়ে আরবদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতিতে পরিবর্তনের দাবি ওঠে। আরবপন্থী নীতির বদলে ইসরায়েলপন্থী নীতি গ্রহণের দাবি ক্রমশ জোরাল হয়।

এই পরির্তনের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং আভ্যন্তরীণ অনুখূল পরিস্থিতিতে। বিজেপির উত্থান ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দাবী জোরাল হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান, এক মেরুর বিশ্বের উদ্ভব, ১৯৯২ সালে মাদ্রিদে আরব ইসরায়েল শান্তি বৈঠক, ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরনের আকাঙ্খা, পশ্চিমের সাথে বিশেষত মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের কাছ থেকে উচ্চ প্রযুক্তি লাভের ইচ্ছা, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ, ইসরায়েলের সামরিক সাহায্য লাভ, জোট নিরপেক্ষ নীতির অসারতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ ভারতের ইসরায়েল নীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তারপর দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। সামরিক ও বেসামরিক বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে। ভারত বর্তমানে ইসরায়েলের সামরিক অস্ত্রের সর্ববৃহৎ ক্রেতা।

এইরূপ অনুকূল পরিস্থিতিতে ১৯৯২ সালের ২৯শে জানুয়ারি ভারত ইসরায়েল পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্ক স্বাভাবিককরণকে কেউ কেউ দেখেছেন যুগান্তকারী পরিবর্তন হিসাবে। সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অন্যতম ফল হল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি। ১৯৯২ সালের ২০০ মিলিয়ন বাণিজ্যের পরিমাণ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বেড়ে হয়েছে ৬ বিলিয়ন। দ্বিতীয় ফল হল সামরিক সহযোগিতা ও সমরবাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল। ১৯৬২,১৯৬৫ এবং ১৯৭১ এর সীমিত সামরিক সহায়তা আরও সম্ভাবনা তৈরি করেছে। আর একটি সুক্ষ্ম রাজনৈতিক পরিবর্তন হল ভারত আর রাষ্ট্রসংঘে আনিত ইসরায়েল বিরোধী প্রস্তাবে নির্বিচারে সায় দেয় না। অনেক বিশে-ষক ভারতের এই নতুন ইসরায়েল নীতিকে ঠান্ডা লড়াই উত্তর যুগের বাস্তবসম্মত বিদেশনীতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। আদর্শবাদ থেকে এই বাস্তববাদী নীতিতে উত্তরণ হল ভারতীয় কূটনীতির পরিণত মনস্কতার পরিচায়ক।

সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার আর একটি ফল হল সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতায় পারস্পরিক সহযোগিতা। সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার একমাসের মধ্যেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শারদ পাওয়ার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে সন্ত্রাসবাদ দমনে ইসরায়েলি সহায়তাকে ভারতের কাজে লাগবে

এবং ভারত সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে ইসরায়েলি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতা ভারতের পক্ষে উপকারী হবে। উচ্চপদস্থ মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের সফর বেড়েছে। নরসিমা সরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অর্জুন সিংহ ১৯৯৪ সালের জুন মাসে ইসরায়েল সফর করেন। তার সফর উলে-খযোগ্য কেননা তিনি ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের প্রবল বিরোধী ছিলেন। ১৯৯৩ সালের মে মাসে ইসরায়েলের বিদেশ মন্ত্রী সিমন পেরেজ ভারত সফর করেন এবং প্রকাশ্যে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেন। ১৯৯৬ এর ডিসেম্বর , ১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে ইসরায়েলের রাষ্ট্রপতি এজার ওয়েজম্যান ভারত সফর করেন। এন ডি এ সরকারের আমলে (১৯৯৮-২০০৪) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এল কে আদবানি ২০০০ সালে ইসরায়েল সফর করেন। তার লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যশবন্ত সিংহ ইসরায়েল সফর করেন। এই সফরকালে তিনি ঘোষণা করেন যে ইসরায়েল হল একমাত্র দেশ যে পাকিস্তান সমর্থিত সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতকে সাহায্য করেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পাকিস্তানের নিন্দায় সরব নয় কিংবা ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসেননি কিন্তু ইসরায়েল হল একমাত্র দেশ যে এই সন্ত্রাস মোকাবিলায় ভারতকে উচ্চপ্রযুক্তি দিতে প্রস্তুত। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল ২০০৩ সালে ভারত সফর করেন। সারনের সম্মানে দেওয়া ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী মন্তব্য করেছিলেন যে উভয়দেশ সন্ত্রাসের শিকার এবং সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ে একে অপরের শরিক। উভয় দেশের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্তাদের পারস্পরিক সফর লেগেই আছে।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ পি এ সরকারের আমলে (২০০৪-২০১৪) পূর্বতন এন ডি এ (ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্স) জমানার রাজনৈতিক হাঁক ডাক কিছুটা হ্রাস পায়। যদিও মূল ইসরায়েল নীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উচ্চপর্যায়ের সফর অব্যাহত থাকে। ২০০৬ সালে কৃষি মন্ত্রী শারদ পাওয়ার, বাণিজ্য মন্ত্রী কমাল নাথ এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কপিল সিব্বল ইসরায়েল সফর করেন। ২০১২ সালে বিদেশ মন্ত্রী এস এম কৃষ্ণা ইসরায়েল সফরে যাকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছিলেন। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তাকে স্বাগত জানান। নরেন্দ্র মোদীও ইহুদিদের হানুখা উৎসবের সময় ট্যুইটারে হিব্রু ভাষায় শুভেচ্ছা জানান। নেতানিয়াহু প্রত্যুত্তর দেন হিন্দিতে। ঐ বছরেই ইসরায়েলের সীমান্ত ব্যবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ইসরায়েল সফর করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। এসবই হল দুই দেশের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার নজির। সংবাদে প্রকাশ ভারত রাষ্ট্রসংঘে প্যালেস্টাইনের প্রতি যে সমর্থন এতকাল দিয়ে আসছিল তা প্রত্যাহার করে নিতে পারে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা অর্থনীতির পক্ষে ভারতের বাজার খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইসরায়েলের সমর বাহিনী আমেরিকান সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত এবং তা ইসরায়েলকে সাহায্য বাবদ দেওয়া হয়। যার অন্য অর্থ ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী ইসরায়েলের সমরাস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলি থেকে স্বল্প মাত্রায় অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে। তাই এই কোম্পানীগুলিকে বৈদিশিক বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম সমরাস্ত্র

ক্রেতা হিসাবে ইসরায়েলের প্রধান বাজার হয়ে উঠেছে। দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বেড়েছে ঠিকই কিন্তু ভারতের অন্য অনেক দেশের তুলনায় তা নগন্য। ভারতের প্রথম দশটি বাণিজ্যিক অংশীদারের মধ্যে ইসরায়েল নেই। ইউ এ ই (United Arab Emirates) ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। সৌদি আরবের সাথে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩৯.৪ বিলিয়ন ডলার এবং ইরানের সাথে ১৪ বিলিয়ন ডলার সেখানে ইসরায়েলের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪.৫২ বিলিয়ন ডলার। ইসরায়েলের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত গুরুত্বপূর্ণ কেননা ২০১৪ সালে ভারত ছিল এশিয়ার ইসরায়েলের তৃতীয় বৃহত্তম এবং সামগ্রিকভাবে দশম বাণিজ্যিক অংশীদার। ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের নিরিখে ইসরায়েলের স্থান অতিনগন্য। এপ্রিল ২০০০ সাল থেকে অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের তালিকায় ইসরায়েলের স্থান ৪৩ তম আর বিনিয়োগের পরিমাণ হল ৫৫.৩২ মিলিয়ন ডলার। সুতরাং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের নিরিখে ইসরায়েল আরবদেশগুলির তুলনায় বেশি গুরুত্ব পেতে পারে কি?

সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে দুই দেশের সম্পর্কের বিবর্তনের ধারায় যা লক্ষণীয় তা হল এশিয়ায় গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্যে ইসরায়েলের ভারতের ন্যায় উদীয়মান দেশকে বেশি দরকার। আর ভারতের দিক থেকে ইসরায়েল নীতি অনেক বেশি সামরিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা পরিচালিত। ইসরায়েল যেভাবে সংখ্যালঘু আরবদের প্রতি এবং দখলীকৃত ভূখন্ডে প্যালেস্টিনিয়দের প্রতি যে আচরণ করে ভারত নিশ্চয় তা সমর্থন করেনা। কিন্তু তা প্রকাশ্যে বলতে কুণ্ঠিত। সাম্প্রতিককালে অবশ্য ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ যারা পাশ্চাত্য জীবন দর্শনে বিশ্বাসী তারা আরবদেশগুলির সাথে সম্পর্ক চায় না। তারা ইসরায়েলপন্থী নীতি গ্রহণের স্বপক্ষে। তাদের বিশ্বাস ইসরায়েলের সংখ্যালঘু নীতি ভারতের অনুকরণ করা উচিত। দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও মুসলিম দেশগুলির সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের বিরোধী। এরা প্যালেস্টাইনকে সমর্থন করা 'তৃতীয় বিশ্ববাদ' বলে মনে করে। তাই ইসরায়েল তার সমস্ত দমন পীড়ন নীতি সত্ত্বেও উদীয়মান ভারতে আজ স্বাগত। দীর্ঘমেয়াদীতে ভারতের স্বার্থ আরবদেশগুলির সাথে সুসম্পর্কের মধ্যেই নিহিত বলে যারা বিশ্বাস করে তারা আজ পিছনের সারিতে।

১. লিস্ট অব কান্ট্রিস বাই পপুলেশন্স, http://simple.m.wikipedia.org.

২. জিয়ন হল জেরুজালেমের একটি বাইবেলীয় নাম। ইহুদিরা রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর নির্বাসিত হয়েছিলেন। নির্বাসনে বসবাসের সময় তারা সর্বদা জেরুজালেমের কথা মনে রাখত এবং প্রত্যহ প্রার্থনার সময় বলতেন পরের বছরে জেরুজালেম। এটি হল ধর্মীয় জিয়নবাদ। তবে উনবিংশ শতকে থিয়োডোর হার্জেল নামে এক জার্মান ইহুদি এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তিনি The Jewish State (১৮৯৬) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন যেখানে তিনি লিখেছেন যে ইহুদি সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ

হল প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জাতীয় স্বদেশভূমি গঠন। এই লক্ষ্য অর্জনে ইহুদিরা যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেছিল তাই জিয়নবাদ নামে পরিচিত।

৩. এ. জি. এন্ড এস. জি. জাইদি, দ্য এন্সাইক্লপেদিয়া অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ভলিউম ৮, নয়াদিলি-, ১৯৭৭, পৃঃ ৪৭৮।

৪. রাজেন্দ্র অভয়াঙ্কর, দ্য ইভুলিউশন এন্ড ফিউচার অব ইন্ডিয়া ইসরায়েল রিলেশন্স। www.tau.ac.il / humanities/abraham/india-israel.pdf, পৃঃ ৭

৫. কে পি মিশ্র, ইন্ডিয়ান পলিসি অব রিকগনিশন অব স্টেটস এন্ড গভর্নমেন্টস, দ্য অ্যামেরিকান জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল, ভলিউম ৫৫ নং ২, এপ্রিল ১৯৬১, পৃঃ ৪০৬, এইচটিটিপি // ডবলুডবলুডবলু.

৬. তদেব, পৃঃ ৪০৬ - ৪০৭

৭. তদেব, পৃঃ ৪০৮

৮। নিকলাস ব-ারেল, দ্য রেভিলিউশন অব ইন্দিয়া'স ইসরায়েল পলিসি কনটিনিউয়িটি, চেনজ এন্ড কম্প্রোমাইজ সিঞ্চ ১৯২২, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস,নয়াদিলি-, ২০১৫, পৃঃ ১২৪-১২৯.

৯. আর্থার জি রুবিনফ, নরমালাইজেশন অব ইন্দিয়া - ইসরায়েল রিলেশন্স ষ্টীলবর্ণ ফর ফরটি ইয়ার্স, এশিয়ান সার্ভে, ভলিউম ৩৫, নং ৫, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৯৩.

১০. তদেব, পৃঃ ৪৯৪

১১. তদেব

১২. আর্থার জি রুবিনফ, প্রাগোক্ত, পৃঃ ৫০২

১৩. জোসেফ হাদিস, ইন্দ-ইসরায়েল রিলেশনস, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার কোয়াটারলি, ভলিউম ২৯, নং ২, ২০০২, পৃঃ ১০১

১৪. আর্থার জি রুবিনফ, প্রাগোক্ত, পৃঃ ৫০২

১৫. চীনের পর ভারত হল দ্বিতীয় অ আরব দেশ যে পি এল ও কে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এ বিষয়ে সরকারি বিবৃতি হিন্দুস্থান টাইমস, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৫.

১৬. আর্থার জি রুবিনফ, প্রাগোক্ত, পৃঃ ৫০২

১৭. ব-ারেল, প্রাগোক্ত, পৃঃ ১৯৫.

১৮. মাইকেল বে-চার, ইন্ডিয়া'স ফরেন পলিসি অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন, নিউইয়র্ক ইনস্টিটিউট অব প্যাসিফিক রিলেশন্স, ১৯৫৭, পৃঃ ১৪

১৯. আর কে শ্রীবাস্তভ, ইন্ডিয়া-ইসরায়েল রিলেশনস, দ্য জার্নাল অব পলিটিকাল সায়েন্স, ভলিউম ৩১, নং ৩, ১৯৭০, পৃঃ ২৪৪-২৪৫.

২০. আর্থার জি রুবিনফ, প্রাগোক্ত, পৃঃ ৪৯৪

২১. ব-ারেল, প্রাগোক্ত, পৃঃ ১৫৭.

২২. আর্থার জি রুবিনফ, প্রাগোক্ত, পৃঃ ৪৯৯.

২৩. তদেব

২৪. রাজেন্দ্র অভয়াঙ্কর, দ্য ইভুলিউশন এন্ড ফিউচার অব ইন্ডিয়া ইসরায়েল রিলেশন্স।

www.tau.ac.il / humanities/abraham/india-israel.pdf, পৃঃ ১১, এফ্রেম ইনবার, দ্য ইন্ডিয়া-ইসরায়েলি আঁতাত, www.biu.ac.il >Besa>Inbar
২৫. বারেল, প্রাগোক্ত, পৃঃ ১৫৯-১৬২, ১৬৭-১৭২.
২৬. বারেল, প্রাগোক্ত, পৃঃ ১৫৮-১৫৯
২৭. আর্থার জি রুবিনফ, প্রাগোক্ত, পৃঃ ৫০৩.
২৮. তদেব
২৯. দ্য হিন্দু বিসনেস লাইন। ৭ জুলাই ২০১৩.
৩০.টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২
৩১. ইন্ডিয়া টুডে, ১৯ জুন, ১৯৯৩
৩২. বারেল, প্রাগোক্ত, পৃঃ ২৯০
৩৩. শমির হাসান, ইভুলিউশন অব ইন্ডিয়া'স প্যালেস্টাইন পলিসিঃ এ ফল ফ্রম দ্য হাইটস? সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট, ভলিউম ৩৬, নং ১/২, ২০০৮, পৃঃ ৮৯
৩৪. দ্য হিন্দু, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৩
৩৫. ইন্ডিয়া ইসরায়েল রিলেশন্স, উইকিপিডিয়া.কম
৩৬. তদেব
৩৭.তদেব
৩৮.তদেব
৩৯. দ্য হিন্দু, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৪
৪০. উর্বশী সরকার, ইজ ইন্ডিয়া'স ট্রেড উইথ ইসরায়েল সিগ্নিফিকান্ত এনাফ টু জেটিশনিং ইটস সাপোর্ট ফর প্যালেস্টাইন? ১৭ অক্টোবর, ২০১৫, ডবলুডবলুডবলু. এসসিআরওএলএল.ইন(www.scroll.in)
৪১. তদেব।

পলি-ভাবনার প্রেক্ষিতে সমাজকর্মী রবীন্দ্রনাথ

ডঃ সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

" .... গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না, যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। ... গ্রামে গ্রামে আজ মানুষের এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড় দরকার শিক্ষার সাম্য।" 'কালান্তর'-এ, রবীন্দ্রনাথের পলি-ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে।

ভারতবর্ষ গ্রাম প্রধান দেশ। তাই গ্রামজীবনের সমস্যা সমগ্র দেশের সমস্যা। দেশের উন্নতির সোপান বিস্তৃত হয়ে আছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে 'স্বদেশী সমাজ', 'সভাপতির অভিভাষণ', 'পাবনা সম্মিলনী' প্রভৃতি নানা বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে দেশসেবার কাজে নিয়োজিত হয়ে গ্রাম্য মানুষের উন্নয়ণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে অনুরোধ করেছেন। জমিদারী দেখাশোনার জন্য তিনি দীর্ঘদিন শিলাইদহে ছিলেন। তখনি পলি- উন্নয়নের ভাবনা তাঁর মধ্যে এসেছিল। তাঁর ভাষায় - 'দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। পলি-কে বাইরে থেকে দেখে পূর্ণ করার কৃত্রিম অপচেষ্টার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর পলি-উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল কথা গ্রামবাসীর আত্মশক্তির উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা। সদা জাগ্রত সচেতন আত্মা কর্তৃত্বকে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি বলেছেন। যে শক্তি নিজেকে জানে, নিজেকে চেনে, সামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ করে, সার্থক করে - সেইই হল আত্মশক্তি। রবীন্দ্রনাথের পলি-উন্নয়ণের মূল চাবিকাঠি সমবায় ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থায় 'পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না, মিলিয়া বড়ো হইবে। কর্মশ্রমকে মিলিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেছিলেন, ভারতবর্ষের জীবিকা যদি সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভারতে সভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। সমবায়ের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পলি-বাসীর কাছে এমন একটি যোগের ক্ষেত্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেখানে প্রতিটি মানুষের শক্তি প্রতিটি মানুষকে শক্তিমান করে তোলে।

কৃষির উন্নতির জন্য যন্ত্রশিল্পের ব্যবহারের তিনি বিপক্ষে ছিলেন না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের শ্রম লাঘব হয় এবং অর্থনৈতিক সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পায় - এই সত্যে বিশ্বাসী কবিগুরু সেই কারণেই গান্ধিজির চরকা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। 'চাষের উৎকর্ষ উদ্ভাবনের দ্বারা চাষির উদ্যমকে ষোলো আনা খাটাবার চেষ্টা না করে তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়।'

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালীন কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষকদের অর্থনীতির মূল ভিত্তিকে পোক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি শুরু করলেন হাতে কলমে

কাজ। কুঠিবাড়ির বাগানের একদিকে নানারকম ফুলের গাছ ও সংলগ্ন জমিতে চিনেবাদাম, আলু, মটরশুটি, কপি ইত্যাদি চাষের ব্যবস্থা করলেন। একদল তরুণ দায়িত্ব নিল এই ফসল ফলানোর। অন্যভাবেও শুরু হল নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। আমেরিকা থেকে ভূট্টার বীজ ও মাদ্রাজি ধান আনিয়ে লাগানো ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। বন্ধুবর দ্বিজেন্দ্রলালের সহায়তায় আলু চাষও শুরু করেছিলেন। তিনি নিজে এই চাষে আশানুরূপ ফল না পেলেও , পরবর্তীকালে অনেক চাষিরা প্রচুর ফলন পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, চাষের কাজে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষিত মানুষদেরই প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। সেই ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দিতেই ১৯০৬ খ্রীঃ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালেন কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যায় পারদর্শী করে আনতে। এক বছর পর জামাতা নগেন্দ্রনাথকেও বিদেশে পাঠান একই উদ্দেশ্যে। এ থেকেই বোঝা যায় কৃষিবিদ্যার প্রতি, রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র কৃষকদের কী আন্তরিক ছিলেন তিনি। পুত্র বা জামাতাকে ব্যারিষ্টারি বা দর্শন-সাহিত্য পড়তে না পাঠিয়ে, কৃষিবিদ্যা পড়তে পাঠানো সেই আন্তরিকতারই পরিচায়ক। জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখা একটা চিঠির কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলে কবিগুরুর মনোভাব আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। তিনি লিখেছিলেন —

'তোমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ। ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্ন গ্রাস কিছু পরিমাণে যদি বাড়িয়ে দিতে পার, তাহলে এই ক্ষতিপূরণ হয়ে মনে সান্ত্বনা পাব; মনে রেখ জমিদারির টাকা চাষের টাকা এবং চাষিরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করছে — নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটেই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে।' [পলি-প্রকৃতি (গ্রন্থ পরিচয় অংশ), ১২ কার্তিক ১৩১৪, পৃষ্ঠা - ২৩০]

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ব্যাচেলার্স অব সায়েন্স' ডিগ্রি নিয়ে রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন ১৯০৯ খ্রীঃ। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় গঠন কল্পে ব্যাপৃত তবুও শিলাইদহের কুঠি সংলগ্ন ৮০ বিঘা জমিতে ফার্ম তৈরি করে দিলেন। সেখানে হাতে কলমে কাজ শুরু হল। মাটি পরীক্ষা ও সার তৈরির গবেষণাগার, পাম্পের সাহায্যে জলসেচ এবং আমেরিকা থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনানো হল। পরাধীন দেশে কৃষির ইতিহাসে এ এক বিপ-ব।

কৃষকদের একটা বড় সমস্যা ছিল মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ। এই ঋণ তাদের টেনে নিয়ে যেত সর্বনাশের দোরগোড়ায়। তাদের রক্ষা করার কথা ভেবেই কবি সমবায় ভিত্তিতে কৃষি ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ কবির উদ্যোগে স্থাপিত হল পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক। সামান্য সুদে কৃষকদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা হল। কিন্তু চাহিদার তুলনায় সঙ্গতি ছিল কম। ১৯১৩ খ্রীঃ নোবেল পুরস্কারের লক্ষাধিক টাকা কবি পতিসর ব্যাঙ্কেই জমা রেখেছিলেন। কৃষিব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এই শব্দগুলি এখন পরিচিত হলেও তখন তা ছিল ভাবনারও অতীত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - '..... রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সমবায় শক্তি জাগরুক

করিবার কথা ভাবিতেছিলেন ও সামান্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন বাংলাদেশে সরকারি কো-অপারেটিভ আন্দোলন হয় নাই। ' (রবীন্দ্রজীবনী - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খন্ড, তয় সংস্করণ, পৃঃ ১৪৫)

আধুনিক প্রযুক্তিতে কৃষির উন্নয়ণের মাধ্যমে পলি-গঠন যেমন রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ছিল, তেমনি তিনি বিশ্বাস করতেন পলি-মানুষের দৈন্য ঘোচাবার অন্যতম প্রধান উপায় শিক্ষা। সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে বিশ্বের সব মানুষের সঙ্গে তাদের যোগ ঘটিয়ে দিতে হবে। কারণ, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের মনটা গ্রাম্য এবং একঘরে হয়ে আছে। তাদেরকে সর্ব-মানবের জাতে তুলে গৌরব দিতে হবে। তবে এই শিক্ষার আলো নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে। অনুগ্রহ বা অনুকম্পা করে নয়। এদের মনকে পেতে হবে, তাদের সঙ্গে মিলতে হবে।

১৯১৫ খ্রীঃ ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র 'হিতসাধন মন্ডলী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহিত করেন। রবীন্দ্রনাথ 'হিতসাধন মন্ডলী'র পক্ষ থেকে পলি-র উন্নতির জন্য একটি কর্মসূচি রচনা করেন। এই কর্মসূচি প্রকাশের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের পলি-ভাবনার স্বরূপটি প্রকাশ পায়। ১) নিরক্ষরদের কিছু কিছু লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখানো। ২) ছোটো ছোটো ক্লাস ও পুস্তিকা প্রচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাযত্ন সম্পর্কে শিক্ষাদান ও ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, নানা ধরণের অজীর্ণ উদরাময় রোগ প্রভৃতি প্রতিরোধের জন্য সমবেত চেষ্টা। ৩) শিশু মৃত্যু নিবারণের উপায় নির্ধারণ ও ব্যবস্থা অবলম্বন। ৪) গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা। ৫) গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকেদের কাছে এর উপকারিতা প্রদর্শন। ৫) দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময় দুঃস্থদের বিবিধ সাহায্য দান। ১৮৯০ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে (শিলাইদহ, পতিসর ও সাজাদপুর) এবং ১৯২২ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত বীরভূমে রবীন্দ্রনাথ পলি- -পুনর্গঠনে যুক্ত ছিলেন। খাজনা বাকি পড়লে প্রজাদের জমি যাতে মহাজনের হাতে চলে না যায় তার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটা ব্যবস্থা রেখেছিলেন। যার জমি তার দখলে রেখে, ফসলের অর্ধেক থেকে কিস্তিতে বকেয়া খাজনার জমা ওয়াশিল করে নেওয়া। আমলাদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ পরগণাগুলিকে কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন।

বর্তমানে চাষি বা অন্যান্য বৃত্তির স্বার্থে গ্রামোন্নয়নে যে সমবায় আন্দোলন ও সমবায় সংগঠনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তার পথিকৃৎ। হস্তশিল্প-প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনের মধ্য দিয়ে মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার কর্মকান্ড আজ চারিদিকে চলছে। এ কাজের সূচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর সাহায্যে। তাঁত, বাটিক, কাটিং-টেলারিং, সূচীশিল্প প্রভৃতিতে প্রশিক্ষিত হয়ে মেয়েরা যাতে সংসারে আয় বাড়াতে পারে তার জন্য মেয়েদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কৃষিবিদ এলমহার্স্ট -এর বিশেষ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীনিকেতন গঠনকল্পে এল্‌মহার্স্ট-এর অসামান্য অবদান রয়েছে। ১৯১২ খ্রীঃ শান্তিনিকেতনের কিছুটা দূরে সুরুল গ্রামে অবস্থিত একটি কুঠিবাড়ি রবীন্দ্রনাথ কিনেছিলেন রায়পুরের জমিদার কর্ণেল নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের কাছ থেকে। আশেপাশের

জঙ্গল পরিষ্কার করে এই বাড়িতেই পলি- পুনর্গঠনের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন কবি। এই পর্বে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ, জামাতা নগেন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের শিক্ষক সন্তোষ মিত্র প্রমুখের মাধ্যমে প্রাথমিক কাজ শুরু হলেও মূল কাজটি করেছিলেন এল্‌মহার্স্ট কিন্তু এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল অন্তত দশ বছর। এলমহার্স্ট তার অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একপ্রকার জোর করেই ভারতবর্ষে চলে আসেন ১৯২১ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে। ১৯২২ এর ৬ ফেব্রুয়ারী তিনি সুরুলে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। পরবর্তী তার নামকরণ করা হয়েছিল পলি-সংগঠন কেন্দ্র বা Institute of Rural Reconstruction । প্রথম এটি ছিল সুরুল সমিতিরই অধীনে। পরে ১৯২৩-এ চলে আসে শ্রীনিকেতন সমিতির মধ্যে। এই পর্বে কালীমোহন ঘোষও হয়ে উঠেছিলেন কবির বিশেষ সহযোগী, যিনি ১৯০৭ খ্রীঃ শান্তিনিকেতনে এসে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এলমহার্স্ট এবং তার স্ত্রী ডরোথি স্ট্রেইট যেমন হাতে কলমে কাজ করেছিলেন তেমনি আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেছিলেন। 'শ্রীনিকেতন' নামক এই কর্মকেন্দ্রের কর্মনীতি কী হবে কবি তা আগেই লিখেছিলেন — ' The object of Sriniketan is to bring back of life in its completeness into the villages making themself reliant and self-respectful acquinted with the cultural tradition of their own country andd competant to make an efficient use of modern resources for the improvement of their physical, intellectual and economic conditions.' (শ্রীনিকেতনের গোড়ার কথা - সত্যদাস চক্রবর্তী, পৃঃ ১৯)। পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনের কর্মপদ্ধতিকে প্রধানত আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল তা থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় এখানে উলে-খ করা হল ঃ

* I win the friendship and attention of villagers and cultivators by taken a real interest in all that concerns their life and welfare and by making a lively effort to assist them in solving their most pressing problems; I take the problems of the village and the field to the classroom for study and discussion and to the experimental farm for solution.

মাত্র তিনটি গ্রামকে নিয়ে শ্রীনিকেতনের আদিপর্বের কাজ শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই কর্মকান্ড বিস্তৃত হয়েছিল ৮৫টি গ্রামে, যার আয়তন ছিল প্রায় ষাট বর্গমাইল। মূলতঃ তিনটি এলাকায় ভাগ করে ফেলা হয়েছিল এলাকা। সুসংহত ও নিবিড় এলাকা রূপে চিহ্নিত গ্রামগুলিতে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলির ওপর বেশি নজর দেওয়া হত। সম্প্রসারিত এলাকায় কোনো বিশেষ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দুই এলাকার মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতেন। আর প্রান্তবর্তী এলাকায় শ্রীনিকেতনের কর্মীরা অবস্মাৎ হানা দিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে তাদের অভিজ্ঞতার শরিক হতেন।

শ্রীনিকেতনের সমাজকর্মীদের কবি চারভাগে ভাগ করেছিলেন। সুসংহত ও সম্প্রসারিত এলাকায় যারা তৃণমূলস্তরে কাজ করতেন তাদের বলা হত গ্রামকর্মী। কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে গঠিত সংসদের দায়িত্বে ছিলেন কেন্দ্রকর্মী। আর এক কর্মবাহিনী ছিল আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ। আর চতুর্থ ভাগে ছিলেন গ্রামীণ সহযোগী নেতৃত্ব। বহুমূখী কর্মযজ্ঞকে কবি এইভাবে বিস্ত ারলাভ ঘটাতে চেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত কর্মীদের নিয়ে সভা করতেন কবি স্বয়ং সেখানে তাঁর বক্তৃতা এবং গ্রামীণ পুনর্গঠন বিষয়ক লেখাগুলি কর্মীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করত। শ্রীনিকেতনের সুবিশাল কর্মকান্ড একটি সারণির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হল, যার মধ্য দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাবে।

শ্রীনিকেতনের ক্ষেত্র ও বিষয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঃ

ক্ষেত্র	বিষয়	কর্মপরিকল্পনা ও প্রয়োগ
অর্থনৈতিক	কৃষি	ক) পরীক্ষা-নিরীক্ষা
		খ) প্রশিক্ষণ
		গ) কৃষি সম্প্রসারণ
		ঘ) গো-পালন
		ঙ) মুরগীপালন
		চ) মাছচাষ
		ছ) মৌমাছি পালন
	গ্রামীণ শিক্ষা	ক) বয়ন
		খ) চামড়া পাকা করার কাজ
		গ) চর্মশিল্প
		ঘ) দারুশিল্প
		ঙ) মৃৎশিল্প
		চ) গালার কাজ
		ছ) বই বাঁধানো
		জ) হাতে তৈরি কাগজ
		ঝ) বাঁশ ও বেতের কাজ
		ঞ) বাটিক ও অন্যান্য কারুশিল্প
		ট) মেশিন শপ ও পাওয়ার হাউস
	সমবায়	ক) পলি- উন্নয়ন সমিতি
		খ) সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি
		গ) ধর্মগোলা

		ঘ) কৃষি ঋণদান সমিতি
		ঙ) সেচ সমবায়
		চ) সমবায় মৎস্যচাষ সমিতি
		ছ) সমবায় বয়ন সমিতি
		জ) বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক
সামাজিক শিক্ষা		ক) শিক্ষাসত্র
		খ) প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়
		গ) শিক্ষাচর্চা
		ঘ) লোকশিক্ষা সংসদ
		ঙ) বয়স্ক শিক্ষা
		চ) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার
		ছ) শিক্ষাশিবির
		জ) ব্রতীবালক সংগঠন
		ঝ) গ্রামীণ বিবাদের নিষ্পত্তি
	স্বাস্থ্য	ক) জনস্বাস্থ্য সমীক্ষা
		খ) ক্লিনিক
		গ) সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি
		ঘ) ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরি
		ঙ) কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র
	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ	ক) গ্রামসমীক্ষা
		খ) ধান্য গবেষণা
		গ) ভূমি সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণা
		ঘ) স্বাস্থ্য সমস্যাা বিষয়ক গবেষণা
গ্রামীণ উৎসব উদ্‌যাপন ও সম্মীলন		ক) শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্‌যাপন
		খ) হলকর্ষণ উৎসব
		গ) শিল্পোৎসব

(সৌজন্যেঃ সার্ধ-শতবর্ষ রবীন্দ্রস্মরণ সংখ্যা,২০১৫)

গ্রামীণ মানুষদের সংগঠিত করে, তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই গ্রামীণ সমস্যার মোকাবিলার ব্যবস্থা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একদল বিশেষজ্ঞও রাখা হয়েছিল যারা মূল চর্চাকেন্দ্রে থেকে বিশেষ সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করবে এবং বিশে-ষণ করে তার সমাধানসূত্র গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে দেবে। এইভাবে একটি সুসংহত পরিকল্পনা

পলি-র সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য উপহার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বিগত একশো বছর ধরে বর্তমান ভারতবর্ষের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় রবীন্দ্রভাবনার সুনির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে। শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের কাছে একটি বার্তা রেখে গেছেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম পরিকল্পনার দলিলে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির উপর একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে যেসব উৎসের কথা বলা হয়েছে, তাতে শ্রীনিকেতনের উলে-খ নেই। অথচ পলি-বাসীর যে অগ্রগমন আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার শেকড় নিহিত আছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই।

আজিও সে এ মনে

সুশীল সরকার

মোড়টা ঘুরতেই লোকটা হঠাৎ গাড়ীর সামনে এসে পড়লো। ব্রেক কষার আগেই ধাক্কাটা গিয়ে লাগলো লোকটার বুকে। ছিটকে গিয়ে লাগলো ড্রেনের পাশে লাইটপোস্টে। গাড়ী থেকে নামার আগেই পথচারীরা লোকটিকে নর্দমা থেকে টেনে তুললো। দু'কানের পাশ থেকে এবং নাককান দিয়ে তখনো থাক থাক রক্ত ঝরে পড়ছে। চোখ'দুটো স্থির। দেখেই বুঝলাম সব শেষ। তবু ভয়ে চুপ করে আছি। সন্ধ্যা আগত। বিদায়ী সূর্যের ক্ষীণ আলোয় লোকটিকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ বিদ্যুৎ বাতিগুলি জ্বলে উঠলো। সেই আলোয় লোকটিকে সবাই ভালোভাবে দেখছিল। সবার মুখে একটিই কথা - কে এই লোকটি? স্থানীয় দোকানদারদের মধ্যে দু'একজন বললেন - বেশ কিছু দিন হল লোকটিকে এই মৌলালী মোড়েই ঘোরাফেরা করতে দেখি। তবে লোকটা যে প্রকৃতস্থ নয় তা দেখেই বোঝা যায়। মনে হয় গ্রাম থেকে এসেছে। লোকটির কথা শোনা মাত্র তার স্ত্রী মিতা ভিড় ঠেলে ওর কাছে গিয়ে এক দৃষ্টে দেখতে লাগলো। মিতা এতক্ষণ আমার পাশে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফিরে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, এখন কী হবে? আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে বললে - মনে হয় লোকটা পাগল টাগলই হবে ... তাই না? বললাম, চেহারা দেখেতো তাই-ই মনে হচ্ছে।

মুখে একরাশ দাড়ি। একমাথা উস্কো খুস্কো চুল। পরনে শতছিন্ন জামা প্যান্ট। এতটাই মলিন যে, রং চেনা যাচ্ছে না। জামার নীচে দিয়ে জরাজীর্ণ শরীরটা দেখা যাচ্ছে। তবু চেহারাটায় সম্ভ্রান্তের ছাপ আছে। মনে হয় কোন ভালো ফ্যামিলির ছেলে। এমন সময় একটি পুলিশ থামলো ভিড়ের পাশে। চারজন সাদা পোষাকের পুলিশ ভিড় ঠেলে লোকটির কাছে গেলেন। একজন পুলিশ জিজ্ঞেস করলেন - গাড়ি কার? আমি ভীতস্বরে বললাম, স্যার আমার। আমার নাম ধাম গাড়ির নাম্বার সব ডাইরিতে লিখে নিলেন। লোকটির পরিচয় জানবার জন্য স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন হদিশ পেলেন না। একজন পুলিশ লোকটির পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু কাগজপত্র বের করলেন। কাগজের ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে এলো একটি ফটো। না, কোন পুরুষের ফটো নয়। ফটোটি একটি সুন্দরী অল্প বয়সী মেয়ের। দেখলে মনে হয় যেন সদ্য তোলা। তারপর বের হল একটি সোনার আংটি। তার উপর ইংরাজিতে লেখা একটি অক্ষর M। ফটোটা সবাই দেখছে কিন্তু কোন হদিশ পাচ্ছে না। আমি দূরে দাঁড়িয়ে কৃতকর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করছি। আমার স্ত্রী হঠাৎ দেখি ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে পুলিশকে বলছে, স্যার, ফটোটা আংটিটা কি দেখতে পারি? ও সিওর সিওর, এই নিন, বলেই একজন পুলিশ ফটো এবং আংটিটা মিতার হাতে দিল। আমি চেয়ে দেখি, ও বড়ো বড়ো করে চোখ করে একবার ফটোর দিকে এবং একবার আংটিটার দিকে তাকাচ্ছে আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছে। পুলিশ বলে উঠলেন - ম্যাডাম, আপনি লোকটিকে চেনেন নাকি? কোন কথার জবাব না দিয়ে ও 'অনিমেষ'

বলে চিৎকার করে সেন্সলেস হয়ে পড়লো। পথচারীরা এবং পুলিশ ধরাধরি করে পাশে এ.আর.এস. হসপিটালে নিয়ে ভর্তি করে দিল। ডাক্তারবাবু বললেন, হঠাৎ শক পেয়ে এমন হয়েছে। দু'দিন রেস্ট নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। দু'দিন পর হসপিটাল থেকে মিতাকে বাড়ি নিয়ে এলাম। ডাক্তারবাবু বললেন, ওর মনের ওপর চাপ পড়ে এমন কোন কথা বলবেন না। ডাক্তারবাবুর উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছি, কিন্তু আমার হৃদয় এক অসহ্য যন্ত্রণায় সর্বদা তোলপাড় করে। নিজের মনকে প্রশ্ন করি - কে এই অনিমেষ ? কি সম্পর্ক মিতার সাথে ওর? কেন ও অজ্ঞান হয়ে গেল? এমন হাজারো প্রশ্ন আমাকে পাগল করে তুললো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই রহস্যের মূল উদঘাটন আমাকে করতেই হবে।

বেশ কিছুদিন হয়ে গেল মিতা অনেকটা স্বাভাবিক, সুস্থ। তবু আড়ে আবডাল থেকে চেয়ে দেখি কেমন যেন উদাস উদাস ভাব, নির্লিপ্ত। খোলা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, ডাকলে চমকে ওঠে। পরক্ষণে দু'একটি মামুলি জিজ্ঞাসা - কী অফিস ছুটি হয়ে গেল, কখন এলে? তারপর কাপড় সামলাতে সামলাতে বলে - পোষাক ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে এসো, আমি চা করছি। একই বিছানায় দুজন। মনে হয়, দুই অপরিচিত ব্যক্তির ষ্টেশানে সহাবস্থান। আমি বুঝতে পারি মিতা এক অব্যক্ত অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে দিনাতিপাত করে। কিন্তু কেন ও আমাকে সব বলতে পারে না। সারাদিন রাত আমিও এক অসহনীয় চাপা যন্ত্রণা নিয়ে যন্ত্রের মত বেঁচে আছি। খাই দাই অফিস করি, নেহাত না হলে নয় তাই।

পৌষ মাস। শনিবার। শীতের সকাল। একে শীত তার উপর মেঘলা আকাশ। হিমেল হাওয়া। বিশ্রী লাগছে। চান না করেই অফিসে ছুটলাম। শনিবারের অফিস। তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। মানসিক অশান্তি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার মানসিকতাই ছিল না। সোজা বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ী ঢুকে দেখি, এ কী! এ কোন মিতাকে দেখছি! এ যে সম্পূর্ণ আলাদা মিতা। কে বলবে কদিন ধরে ওর মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে চলেছে। স্বাভাবিক বললে ভুল হবে। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। হাসিখুশি ভাব। ঘরটা ছিমছাম করে সাজানো গোছানো। ফুলদানিতে নানা রং এর ফুল। মুখে কথার ফুলঝুরি। ভাবছি কোনো স্মরণীয় দিনটিন না তো? স্মরণীয় দিনের কথা বলতে আমাদের বিবাহ বার্ষিকীর কথা মনে হল। কিন্তু না সে তো ২৪ শে ফাল্গুন। আজতো বিশে পৌষ। অনেক দিন পর মিতা নানা আইটেম রান্না করে আমাকে বসিয়ে খাওয়ালো। খাওয়া শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে বেডরুমে গিয়ে খাটের একপাশে হেলান দিয়ে বসে বালিশটা কোলের ওপর রেখে সিগারেটটা ধরিয়েছি এমন সময় মিতা শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে আমার গা ঘেঁষে বসল। আমি অনেক দিন পর ওর কোমল শরীরের উষ্ণ পরশ অনুভব করছি। ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললাম - কী ব্যাপার তুমি খেলে না যে? - খিদে নেই পরে খাবোক্ষণ। —ইত্যবসরে রিমোট নিয়ে টিভি অন করতেই মিতা আমার হাত থেকে রিমোটটা কেড়ে টিভিটা বন্ধ করে দিল। বললাম এটা কী হল? ও আমার কথার কোন উত্তর দিল না। ঘর নিস্তব্ধ। দেখি ও দুহাত দিয়ে বেডসীটের সুতো ছিঁড়ছে। মুখটা মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভাবলাম কী যেন বলবে। নীরবতা ভেঙে ও জিজ্ঞাসা করলো - এই সেদিন পুলিশ তোমার গাড়ির নাম্বার নামাধাম লিখে নিল, কোন খোঁজ নিয়েছো। বললাম আমার কলিগ রমেনের মামা

ক্যালকাটা পুলিশের বড় অফিসার। উনি ব্যাপারটা দেখছেন। তাছাড়া ঐ লোকটা একটা বাউন্ডুলে পাগল । তিনকুলে কেউ আছে বলে মনে হয় না। কিছু টাকা যাবে তাছাড়া আর কী হবে। তা এতদিন পর হঠাৎ এ কথা। — না এমনি। বুঝলাম মিতার মনে ওই লোকটার কথা এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। বেলা তিনটে প্রায়। বিকেলে মেঘলা দিয়া আরো ঘনঘোর হয়ে এলো। হাওয়ার তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। আমার শীত শীত করছে দেখে ও একটা কম্বল নিয়ে আমার গায়ে টেনে দিতে দিতে বললে, তুমি খুব চিন্তা করছ তাই না? আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে? জ্বলন্ত সিগারেটটা তখনও আমার হাতেই ছিল। সুখটানটা দিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিলাম। ধোঁয়ার কুন্ডলী ছাড়তে ছাড়তে বালিশটা বুকের নিয়ে উঠে বসলাম। বললাম হঠাৎ এসব কথা কেন? মিতা শান্তভাবে আমার হাতদুটি চেপে ধরে বললে - আমি জানি, আমি সব বুঝি, আমি তোমার সাথে অনেক অভিনয় করেছি। আমি আজ ধরা পড়ে গেছি প্রশান্ত বাবু। বিশ্বাস করো আমি আর তোমার সাথে অভিনয় করবো না। আমি লাফিয়ে উঠে বলি কিসের অভিনয়? কার সাথে অভিনয়? কেন অভিনয়? মিতা শান্তভাবে বলল - চিৎকার করোনা, চুপ করে শুধু শোনো। যে প্রশ্নের ঝড় তোমার হৃদয়কে দুমড়ে মুচড়ে চুরমার করে দিচ্ছে - সে প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়ে যাবে। আমি সত্যিই তোমাকে বলব - কে ওই অনিমেষ? আমার সাথে ওর কি সম্পর্ক? আমি সব বলব তোমাকে। আর লুকোচুরি করে কি লাভ? একটা ম্-ান হাসি ওর ঠোঁটের ফাঁকে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। আমি ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছি আর ও অনর্গল বলে চলেছে -

তখন আমার বয়স, ১৫ বছর। ক্লাস টেন এ উঠেছি। সবেমাত্র রেজাল্ট আউট হয়েছে। জানুয়ারী মাসের ৮/৯ তারিখ হবে। পড়াশুনা ভালভাবে শুরু হয়নি। টিফিনের পরে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। চিত্রা বলল - আমাদের বাড়ী হয়ে চল। তোকে একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। আমি বললাম - কার সাথে? ও বলল - চল দেখতে পাবি। তা বল না কে এসেছে তোদের বাড়ী? ছেলে না মেয়ে? কি হলে তোর ভাল হয়? - আমার ভালোর সাথে পরিচয়ের সম্পর্ক কি? চিত্রা বলে - দেখলেই বুঝতে পারবি।

— আমি এবার চিত্রাকে বলি - আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি - বলনা, কে এসেছে তোদের বাড়ী?

— আমার বাবার এক বন্ধু ছিলেন। চার বছর হল মারা গেছেন। বাড়ী বর্ডারের কাছে বয়ড়া গ্রামে। ওখানে কাকিমা ছেলে মেয়েকে নিয়ে থাকেন। অনিমেষদা খুব মেরিটোরিয়াস, এইচ.এস এ স্টার পেয়ে পাশ করেছে। ইংলিশে অনার্স নিয়ে হাবড়া কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমাদের বাড়ী থেকে পড়াশুনা করবে।

— ভালোই তো, তোর সব সাবজেক্ট অনিমেষদা দেখিয়ে দেবে। কথা বলতে বলতে চিত্রাদের বাড়ী এসে হাজির হলাম। চিত্রা আমার শুধু ক্লাসমেটই নয়। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই ক্লাস ওয়ান থেকে একসাথে পড়াশুনা করে আসছি। চিত্রাদের বাড়ী যেমন আমার অবাধ যাতায়াত, তেমনি চিত্রারও আমার বাড়ী অবাধ যাতায়াত। দুজনের হরিহরআত্মা।

চিত্রার ঘরে ঢুকে দেখি - একটি ছেলে বসে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে।

— চিত্রা বললো - অনিমেষদা, মিতা। আমার খুব ভালো বন্ধু। একসাথে পড়ি। তোমার কাছেও ও কিন্তু পড়তে আসবে - বলে চিত্রা আমাকে বলল - তোরা কথা বল, আমি আসছি। চিত্রা বাথরুমে গেল। আমি অনিমেষদার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। অনিমেষদা প্রথম থেকেই চুপ করে বসে ছিল। কয়েকটি বার শুধু চোখাচোখিই হল। কথা আর হলো না। কি দিয়ে শুরু করব তা ভাবতে ভাবতে চিত্রা এসে গেল। আমি চিত্রাকে বললাম — আজ চলিরে - পরে আসবো। বলেই দ্রুত বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। মনের মধ্যে কত কথার ঝড় বয়ে চলেছে। প্রথম দেখাতেই আমার দেহ মনে একটা বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে গেল। কেন এমন হল? এই দু'চোখ দিয়ে তো কত মানুষকে দেখি, কই এমন হয়না তো! মনের মধ্যে কেবল একটিই নাম ঘুরপাক খাচ্ছে - অনিমেষদা, অনিমেষদা, অনিমেষদা।

নানারকম ছল ছুঁতোয় আমি এখন প্রায়ই চিত্রাদের বাড়ী আসি। আমি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা মিলিটারীতে চাকুরী করেন। বছরের অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাইরে থাকেন। মা আমার কোন ব্যাপারেই বাধা দেয় না। বিশেষ করে চিত্রাদের বাড়ী। নিয়মিত আমি আর চিত্রা সন্ধ্যার সময় অনিমেষদার কাছে পড়ি। অনিমেষদা সব সাবজেক্টেই ভালো। তার কাছে ইংরাজি,অঙ্ক, বিজ্ঞান সবই পড়ি। রাতে পড়া শেষ হলে অনিমেষদা আমাকে প্রতিদিন বাড়ীতে পৌঁছে দেয়। নির্জন নিরালা আঁধারে দুটি প্রাণী পাশাপাশি ১৫ মিনিটের পথ ১ঘন্টা ধরে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে মনে হত বলি - 'এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত তুমি বলতো? এ'ভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলল দুটি তৃষিত হৃদয়ের নৈকট্যিক আসঙ্গকামিতা। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, সবেতেই আমি অনিমেষদাকে খুঁজে পেতাম। ওর সান্নিধ্য আমাকে এক স্বর্গীয় অনুভব দিত। একদিন যদি না দেখতাম, বড় নিঃসঙ্গ লাগত। অনিমেষদাও আমার অভাব দারুণভাবে অনুভব করত। - ভাবলাম, এর নামই ভালবাসা, প্রেম, মহব্বত। এর জন্যই মানুষ বহু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। মানব জীবনের এখানেই স্বার্থকতা। ভালোবাসাহীন প্রেমহীন হৃদয় ধূসর বালুকাময় মরুভূমি। সবুজের সেখানে কোন স্থান নেই। কবিতার কাব্যধারা - শিল্পীর ক্যানভাসে সপ্তরং এর তুলির টান, সে তো প্রেমেরই সৌন্দর্য্য। সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে আমাদের প্রেম অসীমের দিকে ধাবিত হল। আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পিয়ালী নদী। ছোট্ট নদী। তবে বারো মাসই জল থাকে। এই নদীতেই গ্রামের লোক স্নান করে, সাঁতার কাটে। আমি ও চিত্রা এই নদীতে মাঝে মাঝে স্নান করি। সাঁতার কাটি। কত জ্যোৎস্না রাতে যখন সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন তখন আকাশের চাঁদ আর সবুজ কোমল দুর্ভার উপর আমি ও অনিমেষদা পরস্পর উষ্ণ সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা। আমাদের চাওয়া পাওয়া মেলামেশা সবই চলত চিত্রার অগোচরে। চিত্রার বাবার খুবই আশা, অনিমেষের সাথে চিত্রার বিয়ে দেবে। বি.এ অনার্স পাশ করার পরই চিত্রার বাবা অনিমেষের মা'র কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাবে মনোস্থির করেই রেখেছে। চিত্রা আর আমি হাবড়া গার্লস স্কুল থেকে এইচ.এস পরীক্ষা দিয়েছি। অনিমেষদার পরীক্ষা শেষ। এখন তিনজনই বাড়িতে থাকি। অঢেল সময়। তিনে মিলে ঘুরতে বের হই। চিত্রার বাবা পোষ্টমাষ্টার। বাড়ীতেই পোষ্টঅফিস, একদিন তিনজন ঘুরে বাড়ী ফিরতেই চিত্রার বাবা শশীকান্তবাবু অনিমেষকে ডেকে বললেন

তোমার মায়ের চিঠি। চিঠিটা খুলতে খুলতে অনিমেষ বাটীর পিছনে আমগাছতলায় চলে গেল। আমি গিয়ে দেখি - চিঠি হাতে নিয়ে অনিমেষদা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। - বললাম, কোন খারাপ সংবাদ? - কোন উত্তর না দিয়ে চিঠিটা আমার হাতে দিলে বলল - পড়ে দেখ।

চিঠি পড়ে বুঝলাম - অনিমেষের কাকা বোম্বের কোন এক বেসরকারী অফিসের বড় অফিসার। অফিসে কয়েকজন লোক নেবে। অনিমেষকে নিয়ে উনি আগামী রবিবার বোম্বে পাড়ি দেবেন। শুক্রবারের মধ্যে বাড়ী যেতে লিখেছে। চিঠি পড়েই আমার বুকের মধ্যে ধপাস করে ওঠে। আমি নীরবে চিঠিটা অনিমেষের হাতে দিয়ে তড়িৎগতিতে বাড়ী চলে গেলাম। সন্ধ্যার পর থেকে আমি বিছানায় শুয়েই আছি। কোন কিছুই ভালো লাগছে না। কখন যে রাত ৯টা বেজেছে জানিই না। হঠাৎ দেখি - মায়ের ঠান্ডা হাতের স্নেহস্পর্শ আমার কপালে। চোখ মেলে তাকাতেই মা বলল - কিরে শরীর খারাপ? না না শরীর খারাপ না। ভালো লাগছে না। বলল আই উঠে আই। হাতে মুখে জল দে। আমি ভাত বাড়ছি বলে মা বাইরে এসে বলে, কি ব্যাপার, নবীন কখন এলে? মায়ের মুখে নবীন খুড়োর নাম শুনে বুঝতে পারি। অনিমেষ পাঠিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে বলি - খুড়ো ভিতরে এসো। খুড়ো ভিতরে এসে আমার হাতে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বলে, আজ আর বসব না মামনি, চলি। নবীন খুড়ো চিত্রাদের বাড়ির কাজের লোক। খুব ভালো। অনিমেষের ঘরেই থাকে। দুজনে ভারী ভাব। মাঝে মধ্যেই খুড়ো আমাদের নানাভাবে হেল্প করে। চিরকুটে লেখা আছে — পরশুদিন সকাল ১০টায় বাড়ী যাচ্ছি। কাল রাত ন'টায় নদীর ঘাটে বকুল তলায় তোমার অপেক্ষায় থাকব। কথা আছে। ঠিক ন'টায়। ভুল হয়না যেন। ইতি অনি। চিরকুট পেয়ে আমি ভেবে পারছিনা কি করবো? হাসবো না কাঁদবো। এক সুখের যন্ত্রণায় আমার হৃদয় তোলপাড় করতে লাগল। পরের দিন শুক্রবার রাত ন'টা। পিয়ালী নদীর ঘাট। নীল আকাশে এক খন্ড চাঁদ। বড়ই মলিন। তারই আবছা আলো এসে পড়েছে পিয়ালীর মৃদু তঙ্গোয়িত বুকের উপর। চারদিকে শুনসান। বাঁধানো বকুল গাছ তলায় একটি ছায়া মূর্তি। বড় আপনজন। মুহূর্তে পৌঁছে গেলাম বকুল গাছের গাঢ় অন্ধকারের বুকে। প্রায় পাঁচ মিনিট নিরব নিথর। হঠাৎ মৌনতা ভঙ্গ করে অনিমেষ বলে ওঠে - কী ব্যাপার কথা বলছ না কেন? পি-জ কিছু বলো। ওর দুটি বাহু আমাকে আবদ্ধ করে বলে। ডার্লিং তুমিই শুধু কষ্ট পাচ্ছ, আমি পাচ্ছি না? বিলিভ মি, আই লাভ ইউ,আই লাভ ইউ,আই লাভ ইউ ফ্রম দা কোর অফ মাই হার্ট। জীবন মানে শুধুই সুখের স্নিগ্ধ বাসন্তীক সমীরণ নয়। জীবন মানে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। সূর্যের তীব্র দহন চাঁদের মোলায়েম সুষমা। এই সব কিছুর মতই তুমি আমার কাছে সত্য। কোন ঝড়ঝঞ্ঝা সাইক্লোন কিছুই তোমাকে আমার কাছ থেকে আলাদা করতে পারবে না। বোম্বে গিয়ে চাকরিটার কনফার্মেশান করেই আমি ছ'মাসের মধ্যে তোমাকে নিয়ে বোম্বে পাড়ি দেব। বেকার জীবনে স্বপ্ন দেখা যায়। ঘর বাঁধা যায় না। আর সে ঘর হয় নরক যন্ত্রণার। বাস্তব বড় কঠিন। আমরা সুখের লাগিয়া বাঁধিব ঘর। আর মাত্র ছ'মাস অপেক্ষা। —আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর কথা শুনে চলেছি। কখন যে নিজেকে ওর কাছে উজাড় করে সঁপে দিয়েছি বুঝতেই পারিনি। — হঠাৎ অনিমেষ বলে চল ফেরা যাক, রাত হয়েছে। — আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে আমার সদ্য তোলা একটি ফটো ওর

পকেটে ঢুকিয়ে দিই। আমার আঙ্গুলের সোনার আংটিটা অনিমেষেন আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করি। অনিমেষ আমাকে জড়িয়ে ধরে ওর সোহাগের কোমল স্পর্শে আমার দেহ মন ভরিয়ে তোলে। যাওয়ার আগে আমার গা ছুঁয়ে শপথ করে বলে প্রতি সপ্তাহে একটি করে চিঠি লিখবো। ভুল হবেনা দেখো।

ছয় মাস অতিবাহিত। অনিমেষের কোন চিঠিপত্রের হদিশ পেলাম না। রাগে দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। বাবা ছুটিতে বাড়ী এসে আমার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগল। আমি বিয়েতে বাঁধ সাধলাম। অবশেষে মরিয়া হয়ে বললাম, অনিমেষকে ছাড়া আমি কাউকে বিয়ে করব না। কোন ফল হল না। বরঞ্চ আরো উল্টো হল। একদিন চিত্রা মাকে এসে বলল - যে বাঙালী কোম্পানীতে অনিমেষ জয়েন্ট করেছে সে কোম্পানীর ম্যানেজারের একমাত্র মেয়েকে নাকি সে বিয়ে করেছে। কথাটা শুনে আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু বাবা যখন বলল খোঁজ নিয়ে দেখেছে - কথাটা যথার্থ তখন আমি আর ধৈর্য্য রাখতে পারিনি। রাগে দুঃখে ভেবেছিলাম নিজেকে শেষ করেই দেব, পরক্ষণেই মনে হলো - না, চরম প্রতিশোধ নেব। শেষ পর্যন্ত বাবার ইচ্ছাকে মেনে নিলাম। তার বন্ধুর একমাত্র পুত্র প্রশান্ত রায়ের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল। এতদিনের সুখের স্বপ্ন তাসের ঘরের মত চুরমার হয়ে গেল। শুরু হল সবুজ বনবীথিকায় দাবানলের দহন। আভিজাত্যের চরম শিখরে উঠেও মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারলাম না অনিমেষকে। তুলতে পারলাম না ওর ছবি আমার হৃদয় হতে। পেয়ে হারানোর কি যন্ত্রণা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলাম। এই বিয়ে মন থেকে মেনে নিতে পারিনি কিন্তু ভাগ্যকে মেনে নিয়ে মানিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। পারিনি। বারবার চেষ্টা করেও হেরে গেছি। অবাধ্য মনটা বড় বেইমানী করে। বড় যন্ত্রণা দেয়। বড় ব্যথা দেয়। বিয়ের চার মাস পর বাপের বাড়ীতে এলাম। এর মধ্যে চিত্রারও বিয়ে হয়ে গেছে। মন মানসিকতা ভালো না থাকার জন্য ওর বিয়েতে আসতে পারিনি। চিত্রা এখন কালনায় শ্বশুরবাড়ীতে। ওর খোঁজ খবর নেবার জন্য ওদের বাড়ীতে গেলাম। আমি আর চিত্রা যে ঘরটায় বসতাম সেই ঘরের খাটের উপর বসতে দিয়ে চিত্রার মা চা করতে রান্না ঘরে গেল। আমি দেখি খাটের তোষকটা বেশ কিছুটা উঁচু। তোষকটা উল্টাতেই দেখি ২৪/২৫টা খাম। প্রত্যেকটির উপরে আমার নাম। খামগুলোর প্রত্যেকটি মুখ খোলা। খামগুলি শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে দ্রুত বাড়ী ফিরে এলাম। চিঠিগুলি যত পড়ি তত আমি এক অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণায় হিম হয়ে যাই। শেষ চিঠিতে লিখেছে — কুড়ি হাজার টাকা মাসে বেতন। শহরের উপকণ্ঠে একটি বাসা ভাড়া নিয়েছি। কাছেই সমুদ্র। মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। ঘর সাজাবার দায়িত্ব কিন্তু তোমার। ২৪শে ফাল্গুন তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি। ২৬শে সোজা বোম্বে। প্রতীক্ষার নেই প্রয়োজন। এই ২৪ তারিখই ছিল আমাদের বিয়ের দিন। চিত্রা আমাদের এই ভালোবাসাকে কখনই সুনজরে দেখেনি। কিন্তু ও যে আমার সাথে এত বড় বেইমানী করবে আমি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

বিয়ের পাঁচ বছর পর চিত্রাদের পুকুরঘাটে অনিমেষের বোন শিপ্রার সাথে দেখা। কেমন আছো জিজ্ঞাসা করতেই ও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বললে মিতাদি, দাদার কোন খোঁজ নেই। ঐ যে সেবার বোম্বে থেকে এসেই তোমাদের এখানে এল, তারপর থেকে দাদা

আর বাড়ী ফিরে যায়নি। দাদা যে কোথায় হারিয়ে গেল কেউ বলতে পারে না। মা কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেছে। আমি কোনরকমে প্রাইভেট টিউশানি করে সংসার চালাই। আমাদের কত আশা ছিল দাদার উপর। সব শেষ। মোটা মাইনের চাকরীও পেয়েছিল। লোকে বলে দাদা নাকি আর বেঁচে নেই। মা বলে ও একদিন না একদিন ফিরে আসবেই। মিতাদি তোমার বিশ্বাস হয়! দাদা মারা গেছে? তুমি কি বলতে পার মিতাদি দাদা কেন এমন হয়ে গেল? মুহূর্তের মধ্যে আমি পাথর হয়ে গেলাম। চোখ বুজে আমি মনে মনে বললাম, হে ভগবান, এ তুমি কি করলে? এই পাপ চোখের বাঁধ ভেঙে কখন যে দু'কুল প-াবিত হয়ে পৃথিবী ঝাপসা হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। এরমধ্যে শিপ্রা বলে ওঠে, মিতাদি তুমি তো নানা জায়গায় যাও, একটু খোঁজ করে দেখোনা? মা বলে, দাদা কোলকাতাই কোথাও আছে।

-তাই প্রশান্তবাবু ,তুমি যখন কোলকাতায় বেড়াতে যাওয়ার জন্য আমাকে বললে, তখন আমি আর অমত করিনি। আমি জানি, অনিমেষকে খোঁজার জন্য এ এক সুবর্ণ সুযোগ। অনিমেষকে দেখা পাওয়া আমার একান্ত দরকার। তাই গাড়ীতে তোমার পাশে বসেও আমার দুটি চোখ অনিমেষের অন্বেষণে সদা ব্যস্ত ছিল। আমার মন বলছিল অনিমেষের সাথে আমার দেখা হবেই। এখন প্রশান্তবাবু বুঝতে পারছ - অনিমেষ আমার কে? কি সম্পর্ক তার সাথে আমার? আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি। আমি ঠগ, প্রবঞ্চক। প্রতিনিয়ত তোমার সাথে আমি অভিনয় করেছি। তুমি দেহটাকে লুঠ করেছো কিন্তু মনের ঘরে মণিকাঞ্চনের হদিশ তুমি পাওনি। এ দ্বিচারিতা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও প্র-শা-ন্ত-বা-বু।

কথাটা শে হতে না হতেই মিতা হঠাৎ মুখ থুবড়ে মেঝের উপর পড়ল। প্রশান্ত বাবু ভাবলেন, সেদিনের মত শক পেয়ে সেন্সলেস হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি হসপিটালে নেওয়া হল। ডাঃ বোস পরীক্ষা করে বললেন, এ জ্ঞান আর ফিরবে না। পটাসিয়াম সায়ানাইড্ খেয়েছে।

বহুকৌণিক বিশে-ষণের আলোয় সুধীর দত্তের 'তাঁবু মই ও শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছ' (আনন্দ পুরস্কার ১৪২২ প্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ)

জয় চক্রবর্ত্তী

১৪২২ বঙ্গাব্দে 'আনন্দ জয়ী' কাব্যগ্রন্থ, সুধীর দত্তের "তাঁবু মই ও শ্রেষ্ঠকবিতাগুচ্ছ"। কাব্যগ্রন্থ, নাকি শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন - এই রকম একটা প্রাথমিক ভ্রম তৈরী হয় কাব্যগ্রন্থের শিরোনামের মধ্য দিয়েই। যদিও সেই ভ্রম ক্ষণস্থায়ী। তারপর একে একে উদ্ঘাটিত হয় যাপিত সময় ও সময়হীনতার এক একটি পৃষ্ঠা। তবে তার অক্ষর মালার তাৎপর্য উদ্ধার যথেষ্টই আয়াস সাধ্য। সাহিত্য তাত্ত্বিক রোলাঁ বার্ত সাহিত্যকে Lisible বা পাঠস্বভাবী এবং Scriptible বা লেখস্বভাবী এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন। সুধীর দত্তের এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় সেইগুলি Scriptible বা লেখস্বভাবী শ্রেণিরই অন্তর্গত। এই ধরণের পাঠকৃতির পাঠ গ্রহণ কালে পাঠক নিজেকে নিষ্ক্রিয় উপভোক্তা বানিয়ে রাখতে পারেন না। পাঠোদ্ধারের নান্দনিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন এবং সাহিত্যের কৃৎকৌশল, ভাষার বিশেষ ব্যবহার তাঁর অভিনিবেশের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তারসঙ্গে অনেক বৌদ্ধিক পরিশ্রম করে এই জাতীয় সাহিত্যের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। সুধীর দত্তের "তাঁবু মই ও শ্রেষ্ঠকবিতাগুচ্ছ"র কবিতাগুলিও যেন ঠিক তাই। দীক্ষিত পাঠক ব্যতীত এর প্রকৃত রসাস্বাদন খুব একটা সহজ সাধ্য নয়। সর্বোপরি Plurality of meaning বা অনেকার্থকতা উত্তরাধুনিক সাহিত্য সৃজনের যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য; তাকে পূর্ণরূপে আত্মস্থ করেই নির্মিত হয়েছে এই কাব্য গ্রন্থের ভাবনাকায়াগুলি। পাঠকের তথাকথিত প্রত্যাশিত বা কাঙ্খিত সাংকেতিক বয়ানকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে সাংকেতিক অভিনবত্বের প্রকাশে সুধীর দত্তের এই কাব্যের কবিতাগুলি যেন এক নতুন অভিজ্ঞতার আস্বাদন।

"তাঁবু মই"এর কবিতাগুলির পরতে পরতে ছাড়িয়ে রয়েছে বেদ, উপনিষদ থেকে শুরু করে ব্রহ্মবাদ, বৌদ্ধ শূন্যবাদ, গ্রীক পুরাণ, খ্রীষ্টিয় পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ইত্যাদির একাধিক অনুষঙ্গ। কিন্তু তা নিছক আধ্যাত্মিক অবগাহনের নয়। তাতে কোনরকম Typical ধূপ ধুনোর গন্ধ লেগে নেই। বরং আত্ম উন্মোচন, আত্ম বিশে-ষণ এবং আত্ম অতিক্রমের এক মহাগাঁথা যেন গ্রথিত হয়ে গেছে অনুষঙ্গগুলির নির্মাণ-বিনির্মাণের আলো-আঁধারি খেলায়।

সুধীর দত্তের "তাঁবু মই" এর আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে 'আনন্দ বাজার' কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে কবি জয় গোস্বামী বলেছেন " .... ওঁর কবিতা সংকেতধর্মী, সংবাদধর্মী নয়।" কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাঙ্কেতিকতার পাশাপাশি সংবাদ পাঠের বাচনিক ভঙ্গিটিকেও Technically কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছেন কবি। যেমন - 'একটি আত্মহত্যা' কবিতার সূচনাতেই কবি লিখছেন - "আকাশ

এখন অংশত মেঘলা/অর্ধনমিত পতাকার নিচে পাঠ করা হবে শোক প্রস্তাব/ লোকশ্রুতি, তিনি আত্মহত্যাই করেছিলেন/ যদিও বহু তত্ত্ব তলাশের পর/ কোনও মর্গে তার লাশ পাওয়া যায়নি।" যদিও এই বক্তব্য কেবলমাত্র সংবাদ প্রদানের সংকীর্ণ ঘেরাটোপেই সীমাবদ্ধ নয়। শুধুমাত্র বাইরের ভঙ্গিটুকুই একজন সংবাদ পাঠকের। 'জাদু বাক্স' কবিতাটির শেষাংশেও এই একই শৈলী অনুসরণ করেছেন কবি। সেখানে তিনি লিখছেন -"পাথরের সেই পবিত্র পুঁথি খুলে/ মেট্রো স্টেশনে গতকাল পাঠ হল তা থেকে কয়েকটি পৃষ্ঠা/জানা গেল না দেবতা ও মানব-সভ্যতার মিসিংলিঙ্ক;/যদিও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে/ মানুষের গঠনতন্ত্রে এক আশ্চর্য সূক্ষ্মতায়/ প্রতিস্থাপন করা আছে পশুদের অন্ডকোষ ও দেবতাদের লিঙ্গশরীর।"

সময় চেতনা সুধীর দত্তের এই কাব্যের কবিতাগুলিতে যেন এক দৃশ্যমান পরিসরের মধ্যে খেলা করে। অতীত ও ভবিষ্যতের যে রূপকল্প কিব নির্মাণ করেন সেগুলিকে যেন Mentally visual করা যায়। 'তাঁবু মই ও শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছ' নামে নাম কবিতাটিতেই কবি লিখেছেন - "সময় ও তার প্রসরণ যখন আমার মস্তিষ্ক কেন্দ্র পাগলা ঘন্টি বাজায়/সুদূর অতীত ও ভবিষ্যৎ গুটিয়ে আসে এক বিন্দুতে ..." এখানে সময়কে যেন রাবারের ব্যান্ডের মতো অতীত ও ভবিষ্যতের দুই মেরুতে টেনে ধরে, পরমুহূর্তেই ছেড়ে দিয়ে আবার একই অবস্থানে নিয়ে এসেছেন কবি। সময়ের এই সচলতা আবার কোন কবিতায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন -"এসো, চিৎকার করি' কবিতায় দেখি, "আমরা অচল সূর্য ঘড়ির নীচে আঁক কাটছি।" এই সময় চেতনার সূত্র ধরেই অদ্ভুত এক আশ্চর্য অস্তিবাদী ঘ্রাণ এসে পড়ে তাঁর কবিতায়। তাইতো 'জলদর্চি হে বিশুদ্ধ মেঘ' কবিতায় কবি বলেন- "তুমি তো সকলই জানো, কীভাবে মানুষ/ বুড়োয় অকালে আর ডাই করে, বাঁধানো দাঁতের নীচে/ জিভ আগলে গালগল্প করে।"

জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার তাঁর "Being and Time (1927) গ্রন্থে অস্তিবাদী ভাবনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মানব জন্ম এক অনৈচ্ছিক ও ইচ্ছার উর্দ্ধে থাকা নিক্ষেপ প্রক্রিয়া। তাই অস্তিত্বের কেন্দ্রে বিরাজ করে এক 'নিক্ষিপ্ততা' বা 'throwness ' এর চিরস্থায়ী উপলব্ধি। এই একই ভাবনার কাব্যিক প্রতিফলন দেখা যায় সুধীর দত্তের 'তথাগত এবং আমি' কবিতায়। যেখানে কবি লিখছেন - "বোঁটা থেকে অকস্মাৎ খসে পড়া আমি কোন ফলও নই।" সময়ের পাশাপাশি আবার Space বা স্থানিক চেতনাও সুধীর দত্তের কবিতায় এক পরিধিহীন বিস্তৃতিলাভ করেছে। এই Space এর বিস্তার লক্ষ্য করা যায় 'আমি সে-ই' কবিতাটির বক্তব্যে, যেখানে কবি বলছেন - "আকাশের দিকে মুখ তুলে একটি কুকুর থেকে থেকে কাঁদছে/ আর সেই কান্না/ আব্রহ্মভুবনালে-াক পাক খেতে খেতে কুয়াশার মতো চুঁইয়ে নামছে ঘাসমাটিতে/ যেন বা আকাশের দুয়ার খুলে/দেবতারা ছড়িয়ে দিচ্ছেন শোক ও পঞ্চশস্য।"

কবির এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে মৃত্যুচেতনাও এসেছে এক আশ্চর্য নান্দনিক ভঙ্গিমায়। তা কখনও ঘুম চোখে পলকহীন মাছের মতো তাকিয়ে থাকা, আবার কখনও

"চোখ খুলে ঘুমানো/তাকিয়ে আছি অপলক/মণিতে ছবি নেই।" কখনও আবার তাঁর মৃত্যুবোধের মধ্যেও জড়িয়ে থাকে জীবনের রসভাষ্য। 'তীর্থ' কবিতায় কবি বলেন- "বুড়োগাছ/ জরা ব্যাধি মৃত্যুকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হেসে ওঠে।" কবির দৃষ্টিতে "মৃত্যু এক স্বপ্নহীন ঘুম।" তবে এই ঘুম ভেঙে চেতনার মৃত্যু থেকে জাগরণের স্বপ্নও দেখেন কবি। 'তাদের চৈতন্য খাই' কবিতায় তাই তাঁর নির্মোক বিহীন ঘোষণা- "প্রাজ্ঞ বুড়োদের সামনে উরু চাপড়ে যুবতীকে; দেখি/ধ্বংস অবশেষ থেকে মানুষ একটিবার বেঁচে ওঠে কিনা!" এই কবিই আবার 'জীবনের বাড়ি' কবিতায় এসে লেখেন - "মৃত্যু ভেঙে দেয় রূপটান এবং মুক্ত করে জীবন।"

সুদীর দত্তের এই 'তাঁবু মই'এর কবিতাগুলি শুধুমাত্র তাত্ত্বিকতার মানস রসায়ন নয়। কল্পনার উর্দ্ধলোকচারী হয়েও তা ছুঁয়ে যায় Contemporary বাস্তবতাকে। তাইতো তাঁর 'হত্যার মধুর দৃশ্যে'র সেলিম জোনাকি ফেরি করে গড়িয়া, গড়ের মাঠ, শোভা বাজার ও নলবন ঘুরে। 'শ্যামলকান্তির পাঠঘর' এ ছান্দোগ্য শ্রুতির সঙ্গে পাঠ্যবস্তু হয়ে ওঠে নেতাই কান্ড ও লালমাটির কথা। চপ্পলবাহনা দেবীর স্পার্ষদ রণযাত্রায় তুর্য ধ্বনি, গালবাদ্য এবং খোল খঞ্জনির আওয়াজও এড়িয়ে যায়না কবির স্পর্শকাতর শ্রবণেন্দ্রিয়। 'সূর্য ঘড়ির নীচে' তে আবার সুটিয়ার বরুণ বিশ্বাসের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে মিলিয়ে দেন কবি। নন্দন চত্বরে পালিত হয় শব্দদের জন্মদিন কিংবা দিব্যচোখ দিয়ে কবি দেখাতে চান আদি গঙ্গা কিভাবে বয়ে যাচ্ছে মানুষের মুত্র, বিষ্ঠা ও মা কালীর চক্ষুজল নিয়ে। সরকারী সাইকেল, বার্ধক্যভাতা আর স্বাস্থ্যবীমার খিলমন্ত্রে মূক হয়ে থাকা আদার ব্যাপারীর কানে জাহাজের খবর পৌঁছে দিয়ে কবি বলেন- "খিলের ও তো ফাঁক আছে/দিই দিব্য চোখ, তাঁহে দেখো।" কবি বাস্তবচারী বলেই তো ঋষি সৌভরি কর্তৃক জলবালাদের ধর্ষণের সূত্রে এসে যায় শ্যাওলা ও গর্ত ভরা কামদুনির ইতিবৃত্ত কিংবা 'দেবতা লিখিত কাব্যে'র পাতায় তিন দশক পরেও লেগে থাকে বিজন সেতুর মুখে আনন্দ মার্গী হত্যা কান্ডের পেট্রোল দগ্ধানো ক্ষত দাগ।

'তাঁবু মই ও শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছের কবিতায় 'শব্দ' সত্ত্বার বহুমাত্রিক বিন্যাস:
কবি সুধীর দত্তের 'তাঁবু মই ও শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছে'র প্রায় বহুসংখ্যক কবিতায় 'শব্দ' তার অস্তিত্ব নিয়ে নানা ভাবে নানা আঙ্গিকে নানান রূপক উপমায় উপস্থিত রয়েছে। বিজ্ঞান বলে শব্দ একপ্রকার শক্তি। শক্তি যখন, তখন সেই শক্তির রূপান্তরও আছে। তার রূপ আছে বলেই না রূপান্তর আছে। শব্দ শক্তির সেই রূপান্তরিত বহু বিচিত্র রূপের অনুভূতি সুধীর দত্তের কবিতাকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। কাব্যগ্রন্থটির প্রথম কবিতা 'হত্যার মধুর দৃশ্য' তে কোনো এক সেলিম এর উদ্দেশ্যে কবি বলেন - "কোন সাত সকালে তাকে/ শব্দরা তাড়ির মতো গিলে খায়" - শব্দ যেন এখানে এক মাদকী সত্ত্বা। তবে শব্দ যেমন মানুষকে খায়, তেমনি মানুষও শব্দকে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় নচিকেতার গানের কথা - "সব ভুলে গিয়ে চেটে পুটে খাই / বিসমিল-র পাগলা সানাই।" আবার 'শ্যামল কান্তির পাঠঘর' কবিতাটিতে কবি লিখেছেন - "এখানে ছান্দোগ্যশ্রুতি

পাঠ হয়/ অন্তেবাসী তরুণ কবিরা শব্দের গহন থেকে তুলে নেয় একেক ঝলক।"- ছান্দোগ্য উপনিষদের বাণী যেন ঝরনার জলের মতো সঞ্চিত হয় কোনো গুহায় বা গিরি কন্দরে। 'দেবতা লিখি কাব্য' তে বাঁশবনে ডোমের মতো কানা কবির অক্ষর বৃত্ত ভেঙে পয়ার রচনার প্রয়াসকে কবি দেখেছেন মাত্রাছাড়া, অমানবিক ভাবে দ্যু-স্থান থেকে শব্দদের স্বতঃস্ফূর্ত উপচে পড়ার মতো করে। শুধু মাত্র শব্দের গন্ডি নয়, শব্দ থেকে যাত্রা শুরু করে অনুচ্চারিত নৈঃশব্দ মন্থনের পথে যাত্রা কবির। তাইতো 'যেন - বা-উদান পথে বানরি পাড়ায়' কবিতায় তিনি লেখেন - ".... আরো কৃশ অধিক ধারালো শব্দগণ/ মুঞ্জ থেকে ঈষিকার মতো জেগে ওঠে/এবং না বলা কথা কথাদের অতিক্রম করে।" - মথিত নৈঃশব্দের ব্যঞ্জনাই যেন এখানে শব্দের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। 'ঘুমের ভিতর জেগে থাকা' কবিতাটির শেষ পংক্তিতে শব্দের পতনকে কবি উপমিত করেন শিশির বিন্দুর পতনের সঙ্গে এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে দেন ঝিঁ ঝিঁ পোকার সবিরাম ও একটানা ধ্বনিকে। 'জল দর্চি হে বিশুদ্ধ মেঘ' কবিতায় কবি লিখছেন - "আমাদের কথা নেই, বার্তা আছে; সে ভাষা বাতাসে/শঙ্খ ঘোষের মতো কলরোলহীন ভেসে থাকে।" এও তো এক ধরণের শাব্দিক বা বাচিক অভিজ্ঞানকে অতিক্রম করে ইঙ্গিতময় নিঃশব্দের অভিমুখে যাত্রা। এই করিতারই অন্তিম স্তবকে এসে আবার যখন কবি বলেন - "অর্চিস্মতী হে মেঘ ডম্বরু/হানো বজ্র,ত্বক ফেঁড়ে আড়মোড়া ভাঙুক শব্দ,তার/ গোড়ে রাখি রক্ত জবা" - তখন মনে হয় ইঙ্গিতময় ভাষা মুদ্রার নৈঃশব্দ জগৎ থেকে 'বার্তা' আবার ফিরে এসেছে শরীরী অস্তিত্ব ময় শাব্দিক 'কথা'র জগতে। আর সেই অনুষঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায় কাল ও কালীর এক মহাজাগতিক আধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা। কবি চেতনায় 'শব্দ' যেন এক সজীব সত্ত্বা। তাইতো শব্দ থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে বাতাস ভেজার শব্দও শুনতে পান কবি তাঁর 'এলিজি' কবিতায়। শব্দের মধ্যে আবার সুরের ও অনুভূতি খুঁজে পান কবি। তাইতো 'ও যদি হঠাৎই' কবিতায় কবি বলেন -"মাটির বেহালা থেকে/ কী যেন পাকিয়ে তুলছ - জলশব্দ হাওয়া ও আগুন!" আবার ন'দা কবিতার শেষে দেখা যায় - "....শব্দদের ত্বক ফেঁড়ে/ নেমে আসতে থাকে সাত সাতটি নদী ও তাদের জলধ্বনি।" 'বিশুদ্ধ পাগল' কবিতায় 'শব্দগুলি' উপমিত হয় উড়ুক্কু মাছের উপমায়। এ যেন এক পরাবাস্তব শিল্প সুষমা। শব্দ যে শুধু মৌখিক বা যান্ত্রিক সৃজন নয়, তার আদি উৎস যে বোধ ও বোধির আরও গভীরে। 'ডানা ভাঙা দেবতার মতো' কবিতায় তাই উঠে আসে এক অন্য বচন - "আর ঈশ্বর মাতালদের ভালোবাসেন/ কারণ তাদের কোনো শব্দই জিভ থেকে উচ্চারিত হয় না।" 'ফুলে ছাওয়া নাশপাতি গাছ' কবিতায় কবি লিখছেন - "ছুঁই ছুঁই করেও শব্দরা ফিরে এসেছে পৃথিবীর শেষ মুড়া থেকে/ আমি তাদের বারবার গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি চূড়ার দিকে।" - শব্দরা এখানে যেন অ্যালবেয়ার ক্যামুর 'দ্য মিথ্ অব সিসিফাসে'র সেই পাথর যাকে বহমান অস্তিত্বের নিরন্তর যাত্রায় বারংবার চূড়ার দিকে ঠেলে তোলাই যেন কবির চিরদিনের কর্মপ্রবাহ। তাইতো অস্তিত্বের প্রবাহকে সচল রাখতে, শব্দের গায়ে যাতে শ্যাওলা না ধরতে পারে, তাই কবির এই অন্তহীন প্রয়াস। এই একই

প্রয়াস শুধু কবির নয়, দেবতাদেরও। **'ঈশ্বর কোটি কবি'** কবিতাটির অন্তিম পংক্তিতে কবি তাই লেখেন - **"শব্দের ভিতর আড়মোড়া ভাঙছেন দেবতারা/ তারা আমাদের পৌঁছে দেবেন/ কথা পারের দোর গোড়ায়।"** শব্দ যেন কবির কাছে এক নিরাপদ গোপন আশ্রয়, যার কাছে রেখে যাওয়া যায় গোপন জবানবন্দী, এমনই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন কবি তাঁর **'রেতোধা এক অক্ষর পুরুষ'** কবিতায়। শব্দের রূপান্তরকে এক একটি আশ্চর্য বাক্ বিন্যাসে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন কবি। **'আন কথারা'** কবিতার অন্তিম পংক্তিতে তাইতো তিনি লেখেন - **"শব্দ আর সেই সব পুড়ে যাওয়া কথাদের ছাই/বিশুদ্ধ জল হয়ে উবে যায় অপমন্ডলে।"** তেমনি **'পশ্যন্তি ভূমি থেকে'** কবিতায় বলেছেন শব্দদের গোপনে শুয়ে থাকা অক্ষরের কথা।

কবি যে সত্যের পূজারি, সত্যের প্রকাশে তার অস্ত্র হল শব্দ। তাই **"শব্দদের গায়ে লেগে থাকা মিথ্যাগুলিকে আলগা করতে/কবি তার খেত জুড়ে চিত্রকল্পের চাষ করেন।"** বলে জানিয়েছেন কবি সুধীর দত্ত তাঁর **'কবির নির্বিকল্প সমাধি'** কবিতাটিতে। কিন্তু কবির ক্ষেতে ফলা সেইসব চিত্রকল্প পাপড়ি মেলতে মেলতে বলে - **"বাক্য মিথ্যা, শব্দ মিথ্যা/ মিথ্যা তার রূপ সমূহ।'** বৌদ্ধ শূন্যবাদের এক কাব্য সুষমা যেন এখানে উঠে এসেছে শব্দের ক্রিয়াশীলতাকে আশ্রয় করে। তাই শেষে কবি বলেন - **"কবি যখন নিশছিদ্র তৈলধারার মতো/সর্ব-মিথ্যার ধ্যানে একদিন নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন/ শব্দগর্ভ থেকে অবিরত উচ্চারিত হয় শূন্যতা।"** আবার **'সোম-পাত্র'** কবিতায় দেখা যায় শব্দ যেন কবির আত্মার আত্মীয়। ঐকান্তিক অনুভূতির অবলম্বন। তাইতো মধুদাদার সঙ্গে দেখা না হলেও রেশম পোকাদের পাতা চিবানোর মৃদু শব্দের ভিতর দাদা'র অস্তিত্বের সুপরিচিত ঘ্রাণই অনুভব করেন কবি। আবার বয়ঃসন্ধি পার হওয়া প্রথম যৌবনের বুকের আগুন হৃদয়ে অনুভব করেন বিলি-র আঁচড়ানোর অনৈসর্গিক শব্দে। ককনও বা কবি দেখেন শব্দেরা মধুমেহ রোগে আক্রান্ত। তাই তাদের দ্বারা বয়ন করা যায়নি কোনো গ্রন্থিবিহীন সংগীত। গভীর সমুদ্রে তিমি শিকারে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে তারা। কিন্তু শজারুর দল যেমন মানকচুর মূল খুঁড়ে খেয়ে চলে যায়, আর মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকে ঝাঁকড়া মাথা মানকচু গাছ; তেমনি কবিও চেয়েছিলেন বস্তুদের শূন্য খুঁড়ে নিয়ে আকাশের গায়ে তারাদের মতো শব্দদের গেঁথে দিতে।

'কূট দীক্ষা' কবিতায় শব্দকে স্বাবলম্বী দেখবার স্বপ্ন দেখেন কবি। তিনি বলেন **"শব্দগুলি স্বরবর্ণের মতো নিজেদের পায়ে দাঁড়াক/ এবং হয়ে উঠুক এক একটা রণ-পা/ যেন সুখী গৃহস্থেরা তাঁদের ভয় পায়।"** এই কবিতারই শেষে **'শব্দ'** নিয়ে আসে এক অনন্ত অসীমের ব্যঞ্জনা। দেবলোকের আশ্চর্য স্থপতির ন্যায় কুঁদে কুঁদে প্রতিটি শব্দের ভিতর কবি নির্মাণ করতে বলেন আকাশ, আর তারসঙ্গে ভাববাচ্যে জানাতে বলেন পরোক্ষ কামনা - **'আলো হোক'**। **'কোয়ান্টাম লাফ'** কবিতায় আবার দেখা যায় কবির শব্দ সৃজন লীলাকে অভ্যাসবশত শব্দ গমন রূপে আখ্যায়িত করেন তিনি। **'বৃক্ষ ইব স্তব্ধতা'** কবিতায় খাটিয়ার চারপাশে প্রদক্ষিণরত মৃত্যু আমাদের ছুঁয়ে ফেলবার আগে কবি ডাক দেন শব্দদের ত্বক ফেঁড়ে চুপ ঘরে ঢুকে পড়তে এবং ঝাঁকিয়ে দিতে গাছের

মতো তাদের স্তব্ধতাকে। এই ঝাঁকুনি যেন মৃত্যুর বিপরীতে জীবনেরই এক ইঙ্গিতবাহী গূঢ় ব্যঞ্জনা। **'জাদু বাক্স'** নামে কবিতাটিতে শব্দ'কে আশ্রয় করে কবি এক Magical Realism বা জাদু বাস্তবতার জগৎ নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। তাইতো চোঙ লাগানো বায়োস্কোপের ফুটো দিয়ে একই সঙ্গে শোনা গেছে দশমুন্ড রাবণের হাসি, জেনারেল ডায়ারের গুলি ছোঁড়ার শব্দ এবং হস্তিনার রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের বর্বর উল-াস ও আর্ত চিৎকার। মহাকাব্যিক ইতিহাসের সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসকে শুধু মাত্র শব্দের বহুমুখী সঞ্চরণে এভাবেই এক সূত্রে গেঁথে দেন কবি। তাইতো 'আত্মচরিত' কবিতাটিতেও দেখা যায় শব্দদের মধ্যেই তিনি শুনতে পান পৌরাণিক আদিকল্প অশ্বের হ্রেষা ও খুরধ্বনি।

কবি চেয়েছিলেন **'শব্দ'**রা অমল বিমল কমল ও ইন্দ্রজিৎদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলুক আর ধাপার মাঠে প্রাতঃভ্রমণ করতে করতে সভ্যতার পুরীস ও পয়ঃ প্রণালির উপর একটি শ্বেতপত্র রচনা করুক। তাঁর **'শব্দ'**রা বশিষ্ঠ স্যারের কাছে নিয়মিত কৌমুদী ও ধাতু পাঠ করে, আবার সদা সচেতন **'মা-পক্ষীর মতো'** জেগে থাকে প্রতি কল্পে প্রতিক্ষণ। **'আজ শব্দদের জন্মদিন'** কবিতায় দেখি **'শব্দ'** এসেছে মার্কসবাদের প্রতিকল্প হয়ে। Idealism-কে পরাজিত করে Marxism-এর উত্থানকে বর্ণনা করতে কবি লেখেন - **"হেগেলকে পথে বসিয়ে, এটা ঠিক যে / প্রাউট ও ম্যানিফেস্টো নিয়ে শব্দরা একদিন/ঠান্ডা কফিতে চুমুক দিতে দিতে বিস্তর ঢেউ তুলেছে।"** আবার পরক্ষণেই এই Communism-এর প্রায়গিক অন্তঃসার শূন্যতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কবি বলেন - **"কিন্তু রাতের অন্ধকারে নিকেশ হয়ে যাওয়া তরুণ যুবকদের উদ্দেশ্যে/ এরা কী একটিও মোমবাতি উৎসর্গ করেছে?"** এই কবিতারই অন্য অংশে এসে কবি বলেন - **"চুরুট টানতে টানতে বিজন সেতুর উপর/শিশু ও মহিলা শ্রমিকদের দিকে স্তালিন ছুঁড়ে দেন/ এক একটি দেশলাই কাঠি/কিন্তু সেই আগুনে শব্দদের আত্মা পোড়েনি/কারণ আত্মা অদাহ্য।"** এক চমৎকার দার্শনিক সাযুজ্জে **'শব্দ'**দের সূত্রেই আবার গাঁথা হয়ে যায় নাস্তিক্যবাদী Communism আর ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের Spirituality। একেবারে শেষে ছিলার মতো টানটান নন্দন চত্বরে পালিত হয় শব্দদের জন্মদিন। কবি বলেন - **"শব্দরা একটু ভিজুক। সামনে দেবী পক্ষ ...."।**

সুধীর দত্তের কবিচেতনায় - **'শব্দ'** শুধুমাত্র সত্য বা মিথ্যার Extrimity 'র ধারক নয়। তা কখনও বা অর্ধসত্যের মোহজাল। তাইতো **'তৃতীয় লোচন'** কবিতায় কবি লেখেন - **"ভুই ফোর শব্দরা/অর্ধসত্যের আলো/ চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।"** গোটা কাব্যগ্রন্থটি জুড়ে কবি চেতনায় শব্দ ও নৈঃশব্দের এক অদ্ভুত টানা পোড়েন চোখে পড়ে। 'ব্রহ্ম' কবিতায় কবি বলছেন - **"হে বাক্ নিঃশব্দ হও/দেখছ না, কুপিত বায়ু পিত্তদোষ/নাভি লিঙ্গ গুহ্য পথে চক্রাকারে ঘোরে।"** এই কাব্যের শেষ কবিতা **'জীবনের বাড়ি'**তে এসে বন কলমীর বেড়া ডিঙিয়ে যাত্রার জন্য পা বাড়াতেই লুতা তন্তুতে পা আটকে যাওয়ার মুহূর্তে কবি অনুভব করেন - **"রুদ্রাক্ষের মতো শব্দদের ডগ্ ফাটে এবং আদিত্যবর্ণের অক্ষরগুলি/ জড়ো হয় আমার চারপাশে..।"** তারপর

বনিখেত ফরেষ্ট বাংলোর টিনের ছাদে বৃষ্টির পতন শব্দে কবি শুনতে পান- **"যেন - বা রবিশঙ্করের কামেশ্বরী।" আর সব শেষে কবি আশা রাখেন - "লাল পেড়ে কাপড় ও পাম্প সু পরে/ শব্দরা হেঁটে যাবে ভাবমুখে / মশলার বটুয়া হাতে জীবনের বাড়ি।"**

সুধীর দত্তের **'তাবুমই'**-এর কবিতাগুলিতে **'কবি'** সত্ত্বা একটি পৃথক জাগ্রত অবস্থান নিয়ে হাজির হয়েছে, যে নাটকীয় ভাবে হঠাৎই ঢুকে পড়ে কবিতার মূল বিন্যাসের পরিধিতে। সেই **'কবি'** কখনও মাটি চাপা অভিমানী, কখনও নিষেধ সত্ত্বেও দরজা ঠেলে ঢুকে পড়া ধূর্ত, আবার কখনও বা অশীতিপর রোগজর্জর। **'বিশুদ্ধ পাগল'** কবিতায় সুধীর লেখেন - **"কবিরা সেয়ানা অতি - বিশুদ্ধ পাগল!" 'যোগ ভ্রষ্ঠ'**তে আবার দেখা যায় - **"উড়ে যাচ্ছে যোগ ভ্রষ্ঠ, ছিন্ন এক কবি।"** সুধীরের এই **'কবি'** কারের অধীন হয়েও আবার কালাতীত। তাই তো তিনি লেখেন **"যখন অন্ধকারে আবৃত ছিল অন্ধকার/আর সে আঁধারে যা আছে তা-ও ছিল না, যা নেই/ তাও ছিল না। এমন কী আকাশও ছিল না আকাশে/ ছিলেন কেবল রেতোধার এক অক্ষর পুরুষ - কবি।"** এই কবির কথার ফেনা বুড়ির সুতোর মতো কখনও বা উড়তে থাকে মেঘে মেঘে অভ্যাসবশত শব্দ গমনে।

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতার উপমাগুলিও বেশ Contemporary, তা যেন জীবনের দৈনন্দিনতাকে ছুঁয়ে যায়। **'জীবনের বাড়ি'**তে কবি লেখেন - **"গামছা নিংরানোর মতো বুকের তলা থেকে মুচরে তোরে/এক একটি নিষিদ্ধ কবিতা।" 'মা পক্ষীর মতো'** কবিতায় আমরা পাই থ্যাতলানো ব্যাঙের মতো লজ্জা ঘৃণা ও ভয়েরর উপমা, যা আবার কিছুটা জীবনানন্দীয় Style এরই অনুরণন। **'একটি আত্মহত্যা'** কবিতায় মহাকবির অলিখিত কাব্যের সাদা পৃষ্ঠাগুলি উপমিত হয় কেভিন কার্টারের চলচ্চিত্রের দৃশ্য কাব্যময়তার সঙ্গে। 'ফুলে ছাওয়া নাশপাতি গাছ' কবিতায় আবার নিতম্বে হাত রাখতেই পর-নারীরা হয়ে ওঠে দরবারি কানাড়া। 'সাঁঝবাতি ও আচার্য স্বয়ং' এ কবি লেখেন "গুডরিক চায়ের মতো/ এখন তোমাকে ঢের রোস্টেড লাগে।" আবার 'স্টিনা' নামের আঁটোসাঁটো বাঁধন কবির চোখে উপমিত হয় ক্যাপ্রির নীচ থেকে গোড়ালি অবধি দৈহিক গঠনের সঙ্গে।

'তাঁবুমই' এর কবিতাগুলির শব্দবন্ধে বেশ এক ধরণের বৈপরীত্যের নান্দনিকতাও প্রকাশিত। যেমন - **'হত্যার মধুর দৃশ্য', 'নান্দনিক নিষ্ঠুরতা'** কিংবা **'তোপধ্বনি'** কবিতায় - **"বাড়ন্ত মিথ্যার পাশে সত্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে"** ইত্যাদি বাকবন্ধ গুলি বৈপরীত্যের সৌন্দর্য্যকেই ব্যাখ্যায়িত করে।

সবশেষে বলা যায় আজকের উত্তর আধুনিক কাব্যভাবনায় বাংলা কবিতার যে নিত্যনতুন dimension উঠে আসছে, সেই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে কবি সুধীর দত্তের এই **'তাঁবুমই ও শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছের'** কবিতাগুলি যেন বাংলা কবিতার আরও এক নতুন সংরূপ উন্মোচন করে দেয়। আমাদের মনোজগতে অবিরাম প্রবাহিত যে চিন্তা স্রোত বা stream of consciousness, তা যে কোন নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয় না; তা যে চলার পথেই নিত্য নতুন প্রবাহ খাত তৈরী করতে অগ্রসর হয়, সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন এই

কাব্যগ্রন্থে কবি সুধীর দত্ত। আমাদের অর্ধচেতন বা sub conscioustrace মনের অলিগলিতে বোধ্য ও দুর্বোধ্য ভাবনার যে নিরন্তর লুকোচুরি খেলা চলছে, সেই খেলার গোপন আস্তানা গুলিকেও যে দক্ষতায় সাধন করে দেখিয়েছেন কবি। তাঁর কয়েকটি কবিতা পাঠেরপর কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই জাতীয় শব্দ বা শব্দবন্ধের পুনরুক্তি ও অতিপ্রয়োগ কখনও কিছুটা মোনোটোনাস লাগে, যদিও ভাবনাগত বৈচিত্রে সেই জায়গাটি পরমুহূর্তেই স্বাভাবিক হয়ে যায়। আসলে প্রত্যেক দেবতার নিজস্ব প্রিয় ফুলের মতো প্রত্যেক কবিরও স্বতন্ত্র কিছু ঝোঁক, কিছু প্রবণতা বা শব্দ, উপমা প্রয়োগের কিছু নির্দিষ্ট Style রয়েছে; যা তাঁর নিজস্বতারই পরিচায়ক। সেই selfness এর জায়গাগুলিকে অভিনিবেশ পূর্ণ পাঠে কবি সুধীরের এই কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যেও চিহ্নিত করা যায়। সাহিত্যের ঐতিহাসিক সমালোচনা তত্ত্বের ধারায় হিপোলাইত তেইন যে race বা উত্তরাধিকারের কথা বলেছেন, সেই দিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় কবি সুধীর দত্তের এই নব্য কাব্য প্রবণতার সঞ্চরণ বা সংবহন হয়তো আমরা উত্তর প্রজন্মের পরবর্তী বাংলা কবিতার কবিদের মধ্যেও ভবিষ্যতে সংবাহিত রূপে দেখতে পাবো।

গ্রন্থঋণ ঃ—

ক) ডঃ অভিজিৎ মজুমদার; শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব; তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬; দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট; কোলঃ ৭৩

খ) গৌতম চক্রবর্তী; চপ্পল বাহনা পুরানোর কবিকে আনন্দ - অর্ঘ্য (প্রতিবেদন) আনন্দ বাজার পত্রিকা; ১৪ই এপ্রিল ২০১৬ সংখ্যা।

গ) জীবেন্দ্র সিংহ রায়; আধুনিক কবিতার মানচিত্র; দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট; কোলঃ ৭৩

ঘ) তপোধীর ভট্টাচার্য্য; রোলাঁ বার্ত, তাঁর পাঠকৃতি; অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর।

ঙ) নবেন্দু সেন (সম্পাঃ): পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা (রত্নাবলী)।

চ) সুধীর দত্ত : তাঁবু মই ও শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছ; দ্বিতীয় সংস্করণ (২০১৬); আদম; ষ্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড; কৃষ্ণনগর; নদীয়া - ৭৪১১০১.

আলোর পরশ

নন্দদুলাল কর্মকার

শ্যামাপ্রসাদ মলি-ক সাধারণ একজন খেটে খাওয়া মানুষ নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কানাইপুর বাজারে ছোট একটা মুদিখানা দোকান করেন। পাঁচজনের সংসার, স্ত্রী কমলাবালা, দুই ছেলে এবং একটি মেয়ে। বড়ো ছেলে রমাপ্রসাদ লেখাপড়ায় খুবই ভালো ছাত্র, ছোট ছেলে উমাপ্রসাদ মাত্র স্কুলে যাওয়া আসা শুরু করেছে। সকলের ছোট মেয়েটি, শ্যামাপ্রসাদবাবু নাম রেখেছেন চন্দনা। মেয়েটি যেন সত্যই চন্দনা পাখির মতন কথা বলে । সামান্য ছোট ব্যবসা করে যা উপার্জন হয় শ্যামাপ্রসাদ বাবুর পাঁচজনের সংসার চালানোই খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। শহরের মহাজনেরা মুদিখানার মালপত্র শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে টাকা ছাড়াই দিয়ে থাকেন, শ্যামাপ্রসাদ মাল বিক্রি করে সপ্তাহান্তে শহরে গিয়ে মহাজনদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়ে আবার নতুন মাল নিয়ে আসেন। এইভাবে চলতে চলতে ছেলেমেয়েরা বড়ো হতে থাকে। তাদের লেখাপড়ার খরচ ও সংসার খরচ সবই বাড়তে থাকে। শ্যামাপ্রসাদ দু'একজন বন্ধুর নিকট থেকে কিছু টাকা ধারও করেছে। কিন্তু যাদের নিকট থেকে টাকা ধার করেছে তাদের টাকা ফেরত দিতে অনেককেই পারেনি। অনেকে পাওনা টাকা না পেয়ে শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে অনেক কটুক্তিও করেছে। শ্যামাপ্রসাদ সকলকে একটি কথাই বলেছে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন আমি কিছুদিন পরে আপনাদের টাকা দিয়ে দেব। কেউ কেউ বলেছে - শ্যামাপ্রসাদ ওই টাকা তোমার আর দিতে হবে না। বড়ছেলে রমাপ্রসাদের উপরে খুবই ভরসা রাখে শ্যামাপ্রসাদ। স্ত্রী কমলাকে মাঝে মাঝে শ্যামাপ্রসাদ বলেও আমাদের এই কষ্ট থাকবে না। আজ না হোক কাল ভগবান আমাদের এই অভাব থেকে উদ্ধার করবেনই তুমি দেখে নিও। কমলাবালাও স্বামীর কথায় সায় দেয়। ইতিমধ্যে রমাপ্রসাদ ডাকে মা, কলেজের সময় হয়ে যাচ্ছে খেতে দাও, এই রমাপ্রসাদের উপরে বাবা মা দুজনেরই খুব ভরসা। বাড়িতে এখনো বিদ্যুতের সংযোগ নিতে পারেনি, রমাপ্রসাদ রাতে হ্যারিকেনের আলোতেই রাত জেগে পড়ে। স্কুলে যখন ছিল পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য মাষ্টার মহাশয়গণ সকলেই ভালোবাসতেন। শিক্ষক দেবতোষবাবু রমাপ্রসাদকে বিনা পারিশ্রমিকেই পড়াতেন। এখনও তিনি কলেজের পড়াও পড়ান এবং অনেক সময় বই খাতা কলম নিজেই কিনে দেন। ছোট ছেলেও লেখাপড়ায় ভালো, এইরকমভাবে চলছে শ্যামাপ্রসাদের সংসার। ইতিমধ্যে রমাপ্রসাদ কলেজের পড়া শেষ করেছে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। আরও বড় হবার স্বপ্ন দেখছে এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইছে কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ গ্রামের পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া করেছিল কলকাতায় ছেলেকে নিয়ে যাবার যোগ্যতা শ্যামাপ্রসাদের নেই। তাই দেবতোষ বাবুকে বলেছে স্যার আপনি যদি দয়া করে রমাপ্রসাদকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে বড় কলেজে ভর্তি করে দেয়। দেবতোষবাবুর বয়স হয়েছে শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন সেও অনেক বৎসর হয়ে গেল। অশক্ত শরীর চোখ দুটোই অপারেশন হয়েছে, নিজের ছেলে হয়নি, একটি মেয়ে ছিল বিবাহ দিয়েছেন

জামাইয়ের চাকরি স্থানে ছত্তিশগড়ে থাকতে হয়। বছরে একবার আসে। দেবতোষবাবুর নিকটে স্কুলে ছাত্ররাই নিজের ছেলে মেয়ের মতন। তাই রমাপ্রসাদকে নিয়ে কলকাতায় যেতে রাজি হলেন। দেবতোষ বাবু রমাপ্রসাদকে নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন, অধ্যক্ষ শ্যামরকান্তি মুখার্জীর সাথে দেখা করলেন। অধ্যক্ষ দেবতোষবাবুর পূর্ব পরিচিত ছিলেন তাছাড়া রমাপ্রসাদের মাধ্যমিক থেকে ধারাবাহিকতা দেখে,স্বত প্রণোদিত হয়ে ইংরাজীতে এম.এ তে ভর্তি করে নিলেন। রমাপ্রসাদ যেমন লেখাপড়ায় মেধাবী ছাত্র তেমনি দেখতেও সুন্দর সুপুরুষ। বাড়ি থেকে যাওয়া আসা করে লেখাপড়া করা খুবই কষ্টকারক। আসা যাওয়াতেই অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে তাই হষ্টেলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিলেন অধ্যক্ষ শ্যামলকান্তিবাবু। অবশ্য থাকা খাওয়ার জন্য টাকা লাগবে,শ্যামাপ্রসাদ খুব খুশি হলেন। কিন্তু হষ্টেলের খরচের টাকা জমা দিতে হবে শ্যামাপ্রসাদের মাথায় ভীষণ ভারী বোঝার মতন তবুও রমাপ্রসাদ বড় হবে, পাশ করে বড়ো চাকরী পাবে এই আনন্দে শ্যামাপ্রসাদ সমস্ত কষ্ট ভুলে গেলেন। ছোট ছেলে উমাপ্রসাদ মাধ্যমিক পাশ করেছে - উমাপ্রসাদ বাবার কষ্ট লাঘব করবার জন্য লেখাপড়ায় ইতি করে বাবার দোকানে এসে বাবাকে সাহায্য করতে লেগেছে, উদ্দেশ্য দাদা ভালো চাকরী পেলে আমাদের সকলের আর কোন কষ্ট থাকবে না। রমাপ্রসাদ প্রতি সপ্তাহে চিঠি লেখে বাবা মা ভাই বোনের খোঁজখবর রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুত্ব হয়েছে সহপাঠিনী মাধুরীর সাথে। মাঝে মাঝে মাধুরী রমাপ্রসাদকে নিজেদের গাড়িতে চড়িয়ে বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছে। বাবা ডাক্তার জয়নত সান্যাল রমাপ্রসাদের সাথে কথা বলে খুবই আনন্দ পান বলেন মাঝে মাঝে এসো বাবা, তোমার সাথে কথা বলতে খুব ভালো লাগে। রমাপ্রসাদ মাঝে মাঝে যায় মাধুরীর সাথে, কলকাতায় আর তো কোন পরিচিত কেউ নেই। আগামী ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার রমাপ্রসাদ মনোস্থির করেছে কানাইপুরে যাবে, মা-বাবা-ভাই-বোনটিকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। শনিবার বিকেলবেলা গেলে রবি, সোম দুইদিন বাড়িতে সকলের সাথে থাকতে পারবে। মঙ্গলবার সকালে এসে ক্লাস করতে পারবে। এইকথা মাধুরীকে বলতে মাধুরীর মুখখানা গোমরা হয়ে গেল অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে কি আপনি কোন কিছু বলবেন? কি বলবো আপনি আপনার বাবা,মা,ভাই,বোনকে দেখতে যাবেন আমাকে কেন বলবেন? হ্যাঁ বা না বলার আপনি কে? না মানে কাকাবাবুকে বলবেন আমি বুধবারে আপনাদের বাড়ি যাব। আমি কেন বলতে যাব? আপনার প্রয়োজন আপনি যান বলে আসুন গিয়ে। রমাপ্রসাদ মেধাবী ছাত্র মাধুরীর এই কথাগুলো যে মাধুরীর মনের কথা নয় রমাপ্রসাদের বুঝতে বাকি রইলো না। রমাপ্রসাদ তবুও বলে আপনি এত রেগে আছেন ঠিক দুটোদিন মাত্র বাবা, মা, ভাই, বোনটিকে দেখতে যাবো মাত্র। এই শহর কলকাতায় আমার আপনার অর্থাৎ সহপাঠী গণ ছাড়া আর তো কোন আপনজন নেই ফিরে এসে আপনাদের সাথেই মিলে মিশে থাকতে হবে আমার জায়গায় আপনি হলেও হয়তো অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না। এতক্ষণে মাধুরীর মন একটু নরম হয়েছে বলে ঠিক আছে আপনি বাড়িতে যাচ্ছেন যান কিন্তু আমি বাবাকে কিছু বলবোনা যা বলার আপনি এসে নিজেই বলবেন। তাহলে আজ আমি যাই আবার দেখা হবে। রমাকান্তর নিকটে কয়েকটি টাকা আছে হস্টেলের টিফিনের পয়সা

বাঁচিয়ে জমা করেছে ছোট বোনটির জন্য কিছু নিয়ে যাবে কলকাতা থেকে। এতে সকলেই আনন্দ পাবে। কিন্তু কি কিনবে এই সামান্য কটা টাকায় একটি ভালো ফ্রকও তো হবে না। অনেকক্ষণ ভেবে শেষে দোকানে গিয়ে ছোট বোনটির জন্য একটি লাল রঙের ফ্রক কিনলো। চন্দনার লাল রঙটা খুব পছন্দ। শিয়ালদহ থেকে রেলে চড়ে মাঝদিয়া ষ্টেশনে নেমে সেখান থেকে ভ্যানে চড়ে কানাইপুর পৌঁছাতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে মা বলে ডাকতেই মা হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে বারান্দায় বের হলেন। হ্যারিকেনের আলোয় ছেলেকে দেখে বলেন, এত রাত হল কেন? আয় ভিতরে আয়। রমাপ্রসাদ ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে, বাবা ও ভাইয়ের খোঁজ করে। মা কমলাদেবী বলেন তোর বাবা ভাই এখন দোকানে আছে। চন্দনা কখন এসে দাদার পাশে দাঁড়িয়েছে কেউই খেয়াল করেনি রমাপ্রসাদ হঠাৎ দেখে বোনটি দাদার পাশে। চন্দনা ডাকে বড়দা, এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর শুনে ছোট বোনটিকে কোলে তুলে আদর করে বলে আমার ছোট্ট চন্দনা পাখিটির জন্য আমি একটি লাল জামা এনেছি কলকাতা থেকে। বড়দা দাও বলে আবদার করে চন্দনা, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে জামার প্যাকেট বার করে, জামাটি বার করে নিজেই বোনকে পরিয়ে দিয়ে মাকে বলে মা দেখ, আমাদের চন্দনাকে কেমন সুন্দর লাগছে। আরও বড় হয়ে যখন স্কুলে যাবে তখন কলকাতা থেকে স্কুলব্যাগ এনে দেব। দাদা ও বোনের এই সুন্দর ভালোবাসা দেখে মা কমলাদেবীর মনে বেশ আনন্দ অনুভূতি হয় ছেলেকে বলেন যা রমা হাত পা ধুয়ে আয়, অতটা পথ এসেছিস খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। ঘরে মুড়ি আছে খেয়েনে, পরে বাবা, ভাই এলে রাতের খাবার একসাথে সকলেই খাবি ক্ষণ। মা,বাবা,ভাই,বোনের সাথে দুটোদিন খুব তাড়াতাড়ি যেন শেষ হয়ে গেল। মঙ্গলবারে সকাল সাতটার লোকাল ধরতে হবে নইলে সময় মতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যেতে পারবেন না। ভোরবেলা মা কমলাদেবী ঘুম থেকে উঠে ছেলের জন্য খাবার তৈরী করেছেন। রমাপ্রসাদ ঘুম থেকে উঠে সকালে স্নান করে ঘরে আসলে মা সম্মুখে বসে ছেলেকে খাবার পরিবেশন করলেন। আহার সমাপ্ত করে মা বাবাকে প্রণাম করে রমাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ দাদাকে প্রণাম করে, রমাপ্রসাদ বোনকে কোলে নিয়ে আদর করে চন্দনা বলে দাদা মনে আছে তো আমর স্কুলের ব্যাগের কথা। সে আমার কখনো ভুল হবে না দেখে নিস আমার ঠিক মনে থাকবে। তবে বোন এখন আমার যেতে হবে ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে বলে বোনকে নামিয়ে দেয়, উমাপ্রসাদ সাইকেলের পিছনে দাদার ব্যাগটা তুলে নেয়, দাদাকে বলে ওঠো সাইকেলের সামনে নাহলে ট্রেন ধরতে পারবে না। ভাইয়ের সাইকেলের সামনে চড়ে বসে ষ্টেশনে এসে টিকিট কাটতে কাটতে ট্রেন ষ্টেশনে এসে দাঁড়ায়। রমাপ্রসাদ ভাইকে বলে ভালো থাকিস, উমাপ্রসাদ ভারাক্রান্ত মনে বাড়িতে ফিরে আসে।

রমাপ্রসাদ শিয়ালদহে নেমে হেঁটেই বিশ্ববিদ্যালয় হষ্টেলে যায়, ব্যাগ রেখে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ক্লাশরুমের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। ক্লাসরুমে গিয়ে দেখা হয় মাধুরীর সাথে। মাধুরী অন্য সহপাঠীদের সাথে কথা বলছে, রমাপ্রসাদকে দেখে বলে এই যে বিদ্যাসাগরপ্রসাদ কতক্ষণ এসেছেন? আপনার গুণমুগ্ধ আমার পিতৃদেবের তো আর তর সইছে না। আপনি মন্ত্র জানেন না কি এমন বশ করেছেন কেন আসছেন না কখন আসবেন

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার হাঁপ ধরে গিয়েছে ক্লাসের পরে আমার সাথেই আপনাকে যেতে হবে কিন্তু নিজেই গিয়ে কথা বলবেন আমাকে মাঝে রাখবেন না। রমাপ্রসাদ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। ক্লাস শেষে মাধুরী বলে মহাশয় আপনার সময় হবে তাহলে চলুন আমার একটু মার্কেটিঙে বাইরে যেতে হবে। রমাপ্রসাদ বলে চলুন কাকাবাবুর সাথে দেখা করেই আসি। বলে গাড়িতে উঠে বসে অন্যদিন মাধুরী চালকের পাশের আসনে বসে আজ পিছনে বসে। রমাপ্রসাদ প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি, পাশে একটু সরে বসে ,গাড়ি চলতে থাকে। মাধুরী রমাপ্রসাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে আপনার মা আপনাকে খুব ভালোবাসে তাইনা। এই প্রশ্ন কেন করলেন? প্রত্যেক মা-ই তার সন্তানকে ভালোবাসে। রমাপ্রসাদ বেশ কয়েকদিন মাধুরীদের বাড়িতে গিয়েছে, চা, জলখাবার করেছে। মাধুরীর বাবা ডাঃ জয়ন্ত সান্যালের সাথে কথা বলেছে কিন্তু মাধুরীর মাকে কখনো দেখেনি চা জলখাবার অন্য লোকে দিয়ে গিয়েছে। মাধুরীর বাবা রমাপ্রসাদকে পেয়ে প্রথমেই প্রশ্ন তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কাকাবাবু এতদিন কোথায় মাত্র দুদনি তাছাড়া আপনাকে তো বলেছিলাম, মা-বাবা-ভাই-বোনকে দেখতে যাব। তাই বলেছিলে, সেকথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার বাবা, মা কেমন আছেন? হ্যাঁ কাকাবাবু সকলে ভালো আছেন। তোমাদের বাড়িটা কোথায় যেন বলেছিলে? আজ্ঞে কাকাবাবু নদীয়া জেলা, কানাইপুর। ডাক্তারবাবু ডাকেন, বাবলুর মা রমাপ্রসাদের জন্য চা জলখাবার দিয়ে যাও। সাথে আমাকেও একটু লাল চা দিও। মাধুরী বাবার ঘরে এসে বলে বাপি চা কতবার হয়েছে? না বেশি নয় তাছাড়া আমি একটু চা না খেলে এই ছেলেটি আমার সম্মুখে চা খেতে পারবে না। সেদিনের মত গল্প করে হস্টেলে ফিরে আসে ফাইনাল পরীক্ষার আর বেশি দিন বাকি নেই তাই এবারে আরও মনোযোগ সহকারে পড়ায় মন লাগায়। এম.এ পরীক্ষা হয়ে গেলে পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সময়ে পরীক্ষার ফল বের হয় রমাকান্ত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের উপর গবেষণা লিখতে শুরু করেছে রমাপ্রসাদ। লেখা সম্পূর্ণ করে জমা দিয়েছে। এম.এ. তে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এবং মধুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে অধ্যক্ষ শ্যামলকান্তিবাবু রমাপ্রসাদকে নিজের ক্ষমতা বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত সময়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেছেন। প্রায় বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে ইংরাজী সাহিত্যের উপরে গবেষণার ফলপ্রকাশ হলে সেখানেও রমাপ্রসাদ সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে এবার রমাপ্রসাদের নামের আগে লেখা হল ডঃ রমাপ্রসাদ মলি-ক। যোগ্যতার বলে ডঃ রমাপ্রসাদ এবারে পূর্ণ সময়ের অ্যধাপক পদে উন্নীত হল। মাধুরীও ইংরাজীতে এম.এ. উত্তীর্ণ হয়েছে। এই কয়েক বৎসরে দুজনেই একে অপরের কাছাকাছি এসেছে, বসন্তের উদয় হয়েছে দুজনের হৃদয়ে। দুজনের হৃদয় কাননে রঙ বেরঙের কুসুম দল মেলেছে, নানা রঙের প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ছে, মৌমাছি ভ্রমর গুঞ্জন করছে, উত্তাল তরঙ্গ বইছে। মাধুরী বাবার নিকটে সেকথা প্রকাশ করেছে, বাবা ডাঃ জয়ন্ত সান্যাল নিজেই অন্তরে অন্তরে এই আশাই পোষণ করেছিলেন রমাপ্রসাদতে প্রথমদিন দেখে এবং কথা বলার পর থেকেই মাধুরীকে এই ছেলের সাথে জীবনসাথী করে দেবার আশা পোষণ করেছিলেন।

একদিন মাধুরী রমাপ্রসাদকে বলে এই যে প্রফেসর আজকে ছুটির বিকাল যাবে

নাকি? ওহ সরি যাবেন নাকি গঙ্গার ধারে মিলে মিলেনিয়াম পার্কটা দেখতে? রমাপ্রসাদ মাধুরীর মুখ থেকে তুমি সম্বোধন শুনে প্রথমে চমকে তাকায় মাধুরীর দিকে, বলে I am very pleassed of you, তোমার দিক থেকে এটাই আমি আশা করছিলাম। ক্রমশ একে অপরের আরো নিকটে আসে। মাধুরীর ইচ্ছায় দুজনের বিবাহ রেজেষ্ট্রি করান জয়ন্ত বাবু। রমাপ্রসাদ প্রথমে খুব অমত করেছিল বাবা মা কেউ জানল না, সকলের অজান্তে এইভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে বাবা,মা,ভাই,বোন সকলেই মনে খুব কষ্ট পাবে। কিন্তু মাধুরীর আবদারে রাজি হয় এই সত্যে বাবা মাকে না জানানো পর্যন্ত দুজনে একসাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে না।

রমাপ্রসাদ একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে, রমাপ্রসাদ প্রতি মাসে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠায়। বাবার বয়স হয়েছে, মা আরো অচল হাঁটা চলায়, ভীষণ কষ্ট চোখেও দেখতে পাননা। দুটি চোখই অপারেশন হয়েছে কিন্তু সুগারের পরিমাণ বেশি থাকার জন্য চিকিৎসায় রক্তে সুগারের আধিক্য কিছুতেই কমছে না, দৃষ্টিশক্তি প্রায় নেই। ছোট বোনটির বিবাহ হয়েছে, ছেলেটি ভালো, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এখন উমাপ্রসাদের বিবাহ না দিলেই নয়। উমাপ্রসাদ বাবার মুদিখানা চালায়, বাড়িতে এসে রান্না করে বাবা,মা ও নিজের আহারের ব্যবস্থা করে। বাবা একটি মেয়ে দেখেছিলেন উমাপ্রসাদের এক কথা আগে দাদার বিবাহ হবে পরে আমার, কারো কথা শুনছে না। রমাপ্রসাদ এই কথা শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। মাধুরীকে এই কথাগুলো বলাতে , মাধুরী বলেছে, তুমি চাইলেই বাবা অনুষ্ঠান করবেন তুমিই তো চাওনি এতদিন, তবে একটি কথা শুনে রাখো আমি কিন্তু তোমাদের কানাইপুরে গিয়ে থাকতে পারব না। কানাইপুরে সকালে গেলে বিকালে ফিরে আসবো। ওই হ্যারিকেনের আলোতে রাতে থাকলে আমি মরে যাব। রমাপ্রসাদ বাবা মায়ের কষ্টের চিন্তা ও ভাইয়ের ভীষ্মপণের কথা ভেবে বলে, ঠিক আছে তুমি বাবাকে বলো আমি রাজি আছি। তবে আমার একটি কথা তোমার রাখতে হবে। সেটা আবার কি! না এমন কঠিন কিছু নয়, বাবা মা ভাই বোন ভগ্নিপতি ও আমাদের কিছু প্রতিবেশী সেই অনুষ্ঠানে আসবে। কানাইপুরে আমাদের বাড়ির রীতি অনুযায়ী আমাদের ফুলসজ্জা হবে। একটি রাত কানাইপুরে থাকতেই হবে তার জন্য বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও হবে। এই প্রস্তাবে মাধুরী রাজি হয়। শুভদিন দেখে রমাপ্রসাদ ও মাধুরীর হিন্দু মতে মালাবদল করে বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন করেন জয়ন্ত বাবু। কানাইপুর থেকে সকলে আসে। উমাপ্রসাদকে সব আয়োজন করতে বলেছে রমাপ্রসাদ। সেই মত কানাইপুরে ফুলসজ্জা ও বৌভাত হলে পরের দিন রমাপ্রসাদ ও মাধুরী কলকাতায় ফিরে আসে।

এর কিছুদিন পর উমাপ্রসাদের বিবাহ হয়। মাধুরী শরীর খারাপের অজুহাতে কানাইপুরে যায় না। রমাপ্রসাদ একা-ই ভাইয়ের বিবাহে গিয়েছিল। রমাপ্রসাদ নিয়মিত বাড়িতে টাকা পাঠায়। এইভাবে বৎসর খানেক চলার পরে কমলাদেবী কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে গ্রামের ডাক্তার জবাব দিয়ে দিলে, রমাপ্রসাদ মাকে কলকাতায় নিয়ে আসে, নিজের ফ্ল্যাটে রেখে মায়ে চিকিৎসা করাতে থাকে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা একসময় ব্যর্থ হয়ে যায় কমলাদেবী পরলোক গমন করেন। রমাপ্রসাদ দেশের বাড়িতে মায়ের পারলৌকিক কার্য

সম্পাদন করেন। মাধুরীর বাবা ডাঃ জয়ন্ত সান্যালও বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েছেন মাধুরী ও রমাপ্রসাদ জয়ন্তবাবুর সেবার কোন ত্রুটি রাখে না। কিন্তু একদিন সকালে জয়ন্ত বাবুর ঘুম আর ভাঙেনা। সময় পার হয়ে গেলে বাবলুর মা প্রথমে বাবু ,বাবু বলে ডাকে, কোন উত্তর না পেয়ে মাধুরীকে ডেকে আনে। মাধুরী ঘরে ঢুকে বাবা বাবা বলে ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখে শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে। রমাপ্রসাদকে ডাকে এবং বলে ডাক্তার ডাকো বাবার জ্ঞান নেই। রমাপ্রসাদ জয়ন্তবাবুর বন্ধু ডাঃ সুব্রত মজুমদারকে টেলিফোন করে, অপর প্রান্ত থেকে উত্তর আসে তোমরা ব্যস্ত হয়োনা আমি এখনই আসছি। একটু পরেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় একটি ইন্ডিগো গাড়ি। গাড়ি থেকে নামেন ডাঃ সুব্রতবাবু। সকলেই উৎকণ্ঠার সাথে তার অপেক্ষা করছিল। ডাঃ সুব্রতকে দেখে মাধুরী কান্নায় আকুল হয়ে যায় বলে কাকাবাবু, বাবাকে বাঁচান। ডাঃ সুব্রতবাবু ঘরে ঢুকে প্রথমেই কানে স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে বুক পরীক্ষা করেন। হাতের নাড়ি টিপে চোখের পাতা টেনে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে রমাপ্রসাদকে ইশারা করে ডাকেন। ঘরের বাইর এসে বলেন, জয়ন্ত এখন থেকে প্রায় চারঘন্টা আগেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে দেহ ত্যাগ করেছে আমার কিছু করার নেই। মাধুরীর কান্না আমি দেখতে পারব না তুমিম কাউকে আমার সাথে পাঠাও আমি ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেব যাতে তোমাদের কোন অসুবিধে না হয়। ডাক্তারবাবুকে চলে যেতে দেখে মাধুরী ঘর থেকে বাইরে এসে আরও কান্না করতে থাকে এবং বলে কাকাবাবু আপনি চলে যাচ্ছেন বাবার কি হবে? কান্না করিস না মা সব কথা রমাপ্রসাদকে বলে দিয়েছি। রমাপ্রসাদ বুদ্ধিমান ছেলে সব সামলে নিতে পারবে। এইটুকু বলে সুব্রতবাবু গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। রমাপ্রসাদ নিজের ড্রাইভারকে ডাক্তারবাবুর সাথে পাঠিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এসে মাধুরীকে বোঝাতে লাগল। মাধুরীর মায়ের স্মৃতি কিছুই মনে নেই। মা যখন মা গিয়েছেন মাধুরী তখন খুব ছোট ছিল। বাবা একাধারে বাবা ও মায়ের অভাব পূরণ করেছেন। আজ বাবাও চলে গেলেন। মানুষের আপন জনের বিয়োগ ব্যথা ভুলতে খুব কষ্ট হয় কিন্তু আসা যাওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। সকলকে মানতেই হয়। মাধুরীও মেনে নিয়েছে,ভুলে থাকার জন্য মাধুরী ড্রাইভারকে বলে বাড়িতে বিলাতিমদ আনিয়ে নেশা করতে শুরু করেছে। রমাপ্রসাদ বাধা দিয়েও নেশা থেকে ফেরাতে পারছে না। রমাপ্রসাদের জীবনটাও বিষময় হয়ে উঠেছে, কানাইপুরের খোঁজ খবরও রাখতে পারছে না। মাধুরী এখন একাই বারে যেতে শুরু করেছে। কানাইপুরে বৃদ্ধ শ্যামাপ্রসাদ ছেলেকে অনেকদিন না দেখে কান্না করেন। উমাপ্রসাদ বাবার অবস্থা বুঝে বাবাকে সাথে করে কলকাতায় আসে। মাধুরীদের বাড়িতে এসে কলিং বেল টিপলে বাবলুর মা এসে বলে কে?, আমরা কানাইপুর থেকে এসেছি। দিদি এখন ব্যস্ত আছে। আমি রমাপ্রসাদের বাবা আর রমার ভাই উমাপ্রসাদ। আপনারা দাঁড়ান বলে বাবলুর মা ভিতরে গেল। মাধুরী তখন কয়েকজন বন্ধু নিয়ে নেশার আসরে আছে, বন্ধুরা বলে কেমন বেরসিক লোক রে বাবা সময় বোঝে না? তোরা বস আমি দেখছি বলে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, অবিন্যস্ত বেশবাস, টলতে টলতে বৃদ্ধ শ্যামাপ্রসাদের সম্মুখে গিয়ে বলে কি চাই টাকা, টাকা চাই বলে ব্যাগ থেকে একগোছা নোট বের করে ছুঁড়ে দিয়ে বলে এই নিন আর এখানে দাঁড়াবেন না। বৃদ্ধ শ্যামাপ্রসাদ হতবাক হয়ে গেলেন, চুপ করে

দাঁড়িয়ে থাকলেন। উমাপ্রসাদ বলে বাবা চলো এখানে তোমার আর দাঁড়িয়ে না থাকাই ভাল। বৃদ্ধ বাবা অপমানিত হয়ে ফিরে এল গ্রামে। এই কাহিনী রমাপ্রসাদ জানতে পেরেছিল কয়েকদিন বাদে। কিন্তু মাধুরীকে কিছু বলার ক্ষমতা রমাপ্রসাদের সাহসে কুলাল না। শ্যামাপ্রসাদ এই বড় ছেলের লেখাপড়ার জন্য কত কষ্ট না স্বীকার করেছেন, চেনা জানা বহু লোকের নিকটে হাত পেতেছেন। কেউ কিছু সাহায্য করেছে আবার কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আর এখন এই অপমান মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে। শ্যামাপ্রসাদ নির্জনে থাকলে কাঁদে আর বলে দেখো কমলা এই ছেলেকে নিয়ে কত গর্ব করতে। তুমি বলতে আমাদের রমা লেখাপড়া শিখে চাকরী পেলেই আমাদের কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না। অলক্ষ্যে থেকে তুমি হাসছো, আমাকেও তোমার নিকটে টেনে নাও। ইতিমধ্যে উমাপ্রসাদের একটি পুত্র সন্ত ান জন্ম হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ এখন নাতি পেয়ে আদর আহ্লাদ করে নিজের কষ্ট অনেকটা ভুলে থাকে। নাতির নাম রেখেছে দেবপ্রসাদ মলি-ক। রমাপ্রসাদ ও মাধুরীর কোন সন্তান হয়নি। দেশ বিদেশের বড় ডাক্তার দেখিয়েও কোন লাভ হয়নি। ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ। মাধুরী মা হতে পারবে না কোনদিন। রমাপ্রসাদের অনেক চেষ্টায় মাধুরীকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে পেরেছে। মাধুরী এখন একটি সন্তানের জন্য আকুল প্রার্থনা করছে মন্দিরে,মসজিদে ও গীর্জায়। একটি সন্তান ওর নিকটে এখন ঈশ্বর প্রাপ্তির সমান। কানাইপুরে রমাপ্রসাদ অনেকদিন হল যেতে পারেনা। হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল কানাইপুরের জহর দাসের সাথে। জহর প্রাইমারী স্কুলে রমাপ্রসাদের সাথে পড়াশুনা করেছে। রমাপ্রসাদ জহরকে জিজ্ঞাসা করে কলকাতায় কি কাজে? জহর কথার কোন উত্তর না দিয়ে সম্মুখে পা বাড়ায়। রমাপ্রসাদ এগিয়ে গিয়ে জহরকে ধরে বলে কিরে কোন না বলে চলে যাচ্ছিস যে? জহর বলে যাব নাতো কি করব যে নিজের বাবাকে অপমান করে তার সাথে কি কথা বলব? রমাপ্রসাদ কিছুই জানে না খেয়ালি মাধুরীকে পথে আনতেই অনেক সময় ব্যয় করেছে। জহরকে বলে ভাই কি হয়েছে আমাকে খুলে বল। বাবাকে আমি অপমান করব কেন? জহরকে সাথে নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে সুইমিং পুলের পাশে বসে জহরের মুখে সব শোনে। উমাপ্রসাদের ছেলে হয়েছে সে কথাটিও জানতে পারেনি রমাপ্রসাদ। জহর বলে রমা আমি এখন চলিরে,তুই যা ভালো বুঝিস তাই করিস বলে জহর চলে গেল। রমাপ্রসাদ বাড়ির দিকে পা বাড়ায়, বাড়িতে গিয়ে মাধুরীকে বলে, কাল সকালে কানাইপুরে যাব তুমি চাইলে যেতে পারো। মাধুরী বলে কি ব্যাপার বলোতো? হঠাৎ কানাইপুরে যেতে চাইছ কেন? চাইছি কেন শুনবে? আমাদের বাড়িতে নতুন অতিথি এসেছে তাকে বরণ করতে। নতুন অতিথিকে বরণ করতে যেতে মনের ময়লাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও, হাতে সময় বেশি নেই একটি রাত অনেকটাই সময়। মাধুরী কোন কথা বলে না। রাতের খাবার খেয়ে দুজনে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে রমাপ্রসাদ শুয়ে পড়ার আগে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখে মাধুরী কোন কথা বলে না। রমাপ্রসাদ শুয়ে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। মাধুরীও শুয়ে থাকে চোখে ঘুম আসেনা নিজের কোন সন্তান হবে না মাধুরী এই কথাটি জানতে পেরেছে। উমার ছেলেকে দেখতে ও বুকে জড়িয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কানাইপুরে গিয়ে কি করে মুখ দেখাবে যে ব্যবহার নিরীহ পিতৃতুল্য শ্বশুর এবং বয়সে অনেক ছোট দেবরের

সাথে করেছে কানাইপুরের হয়তো গ্রামের লোক সকলেই সেই তিক্ত কথাগুলো জেনে ফেলেছে। এইসব আজে বাজে ভাবনা ভাবতে ভাবতে কখন রাত শেষ হয়ে গিয়েছে সম্বিত ফিরে পায় ঘড়িতে দিয়ে রাখা অ্যালার্মের শব্দে। রমাপ্রসাদ ঘুম থেকে উঠে মাধুরীতে ডাকে। মাধুরী বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে চলে যায়, খানিক পরে বাবলুর মা সকালের খাবার ও চা নিয়ে আসে। দুজনে নিজের পোষাক বের করে তৈরি হতে থাকে। ড্রাইভার পল্টু গাড়ি বের করে। মাধুরী সাধারণ একখানা তাঁতের শাড়ি পরেছে। রমাপ্রসাদ বলে একি তুমি এই শাড়িটা পরলে কেন আর কি ভালো শাড়ি ছিল না? ছিল অধ্যাপক, কেন এটা পরেছি তোমার তা না জানলেও চলবে চলো। একি একটুও প্রসাধন করলে না, বলছিতো আজ এসব খোঁজ তোমার রাখতে হবে না। রমাপ্রসাদ বলে চলো গাড়ি তৈরী। দুজনে বাইরে এসে গাড়িতে বসে। বলে পল্টু চলো, মাধুরী বাবলুর মাকে বলে সময় মতন খাবার খেয়ে নিও। গাড়ি চলতে থাকে,গাড়ি তখন ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে। কানাইপুর কলকাতা থেকে প্রায় তিন ঘন্টার রাস্তা, ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। দুজনে পিছনের সিটে বসে বিশেষ বাক্যালাপ নেই রমাপ্রসাদ কোন কথা বললে মাধুরী হ্যাঁ বা না বলে দায়সাড়া উত্তর দিয়ে চুপ করে থাকছে। গাড়ি চলতে চলতে কানাইপুর চলে এসেছে, শামাপ্রসাদ এখন আগের অবস্থায় নেই। চার খানা পাকাঘর-বারান্দা, অ্যাটাস্ট বাথরুম রান্নাঘর সহ একতলা বাড়ি হয়েছে। সবই অবশ্য রমাপ্রসাদের জন্য। রমাপ্রসাদ উমাপ্রসাদকে বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে বলেছে, উমা সব ব্যবস্থাও করেছে। গাড়ি থেকে নেমে মাধুরী আজ যেন অন্য মানুষ আগের সেই ঔদ্ধত্য আর নেই। বাড়ির সকলে এবং প্রতিবেশী দুই চারজন মহিলা রমাপ্রসাদ ও মাধুরীকে দেখতে আসে আজও তাই মাধুরী সকলকে বলে কেমন আছেন আপনারা। সকলেই বলে ভালো আছি। রমাপ্রসাদ মাধুরীকে বলে ইনি ঘোষ কাকিমা, ইনি চ্যাটার্জী কাকিমা। মাধুরী সকলকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে সকলেই হাত ধরে বলেন ভালো থেকো মা। বাড়ির ভিতরে গিয়ে প্রথমেই খোঁজ করে শ্বশুরমশায়ের, শ্যামাপ্রসাদ এতক্ষণ বৌমার সম্মুখে আসেন নাই নিজের ঘরেই আছেন। মাধুরী শ্বশুরের খোঁজ করে তার ঘরে গিয়ে, বাবা বলে ডেকে পা জড়িয়ে ধরে এই ঘটনা শ্যামাপ্রসাদ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে, চোখের জলে শ্বশুরের পা ভিজে যায়। শ্যামাপ্রসাদ বলে বৌমা পা ছাড়ো, কি হয়েছে তুমি এরকম করছ কেন? ছেলে তোমাকে কোন বাজে কথা বলেছে? না বাবা কেউ আমাকে কিছু বলেনি, আমি আপনাকে যে অপমান করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আপনি তো আমারো বাবা। শ্যামাপ্রসাদ মাধুরীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন ওঠো মা সংসারে এমন অনেক কিছু ঘটে সব মনে রাখলে চলে না, আমি কিছু মনে রাখিনি। ততক্ষণে সকলেই শ্যামাপ্রসাদের ঘরের ভিতরে, শ্যামাপ্রসাদ উমার স্ত্রী ছোট বৌমাকে বলে ছোট মা এদের হাত মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করে দাও। ছোট বউ শুভ্রা বলে চলো হাত মুখ ধুয়ে নাও, শ্যামাপ্রসাদ বলে যাও বড়ো মা তোমরা আমার সন্তানের মতো আমি কিছু মনে রাখিনি। এতক্ষণে মাধুরী শ্বশুরমশায়ের পা ছেড়ে ছোট বোনের মত শুভ্রার সাথে যায় হাত মুখ ধুয়ে এসে বলে চল তোর ছেলের কাছে। ছেলের কাছে গিয়ে বলে দে আমার কোলে তুলে দে। দেবপ্রসাদ ঘুমাচ্ছিল, শুভ্রা বিছানা থেকে তুলে মাধুরীর কোলে দেয়, ঘুম ভেঙে মুখ দেখেই কাঁদতে

থাকে। মাধুরী বলে আমি লোক ভালো নই তাই কাঁদছো। কি যে বলো দিদি শুভ্রা ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে কাঁদেনা বাবা তুমি জেঠিমার কোলে আছো। মাধুরী বলে জেঠিমা নয়, তবে তোমাকে কি ডাকবে বলে দাও। মামনি ডাকবে তোর ছেলে আমাকে। আমি তো আর মা হব না তাই আমিও মা ডাক শুনতে চাই তাই আমি হলাম মামনি। তোমার কাছেই পাঠিয়ে দেব তুমিই তোমার মত করে মানুষ করবে। দেবপ্রসাদ এর মধ্যে মামনির কোলে হিস্ করে দিয়েছে। শুভ্রা বলে, দিল তো শাড়িটা নোংরা করে, একটা শাড়ি এনে দিচ্ছি। তোর ব্যস্ত হতে হবে না আমি এটাই চাই। এবারে রমাপ্রসাদ ঘরে এসে বলে দাও আমার কাছে একটু দাও আর শোনো কাল আমার কলেজ আছে বিকালে রওনা দিতে হবে, আর এখানে রাতে বিদ্যুৎ নেই থাকা যাবেনা। মাধুরী বলে তোমার কলেজ আছে তুমি চলে যাও আমি দুদিন থাকবো, এখানে বিদ্যুৎ ? আমি যে আলোর পরশ পেয়েছি অন্য কোন আলো আর না থাকলেও চলবে। আমি গাড়ি নিয়ে চলে গেলে দুদিন বাদে তুমি কি করে যাবে? গাড়ি পাঠিয়ে দিও, যদি গাড়ি না পাঠাও তবে কানাইপুরে ছেলের কাছে থাকতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

শিশু ও ছাত্রদরদী রবীন্দ্রনাথ

রঞ্জিতা ভট্টাচার্য্য

একথা আমরা সকলেই জানি যে, রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে মূলত ভৃত্য রাজকতন্ত্রে। মাতৃস্নেহবঞ্চিত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঠাকুরবাড়িতে নিঃসঙ্গ। এছাড়া যে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকদের সাহচর্য তিনি পেয়েছিলেন তার অধিকাংশই ছিল তাঁর না পছন্দ। সেই সমস্ত শিক্ষকরা শিশু ছাত্রদের প্রতি যে কতটা অমনোযোগী ছিলেন তা রবীন্দ্রনাথ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে আমরা রবীন্দ্রনাথকে একেবারে স্বতন্ত্র আদর্শে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম বিদ্যালয় গড়ে তুলতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের মত শিশুপ্রেমিক ও ছাত্রপ্রিয় স্নেহশীল শিক্ষক নিতান্তই বিরল।

রবীন্দ্রনাথ শিশুছাত্রদের সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন তা বোঝা যায় শান্তি নিকেতনের ঘটনায়। শিক্ষকরা ছাত্রদের শায়েস্তা করার জন্য মারধোর করলে রবীন্দ্রনাথ রুষ্ট হতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের বললেন — "তোমরা আনন্দ করবে। সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে বেড়াতে যাবে ... তারপর সেখানে পূর্বদিগন্তের প্রথম সুর্যোদয় দেখে বেশ হৈ চৈ করে আশ্রমে ফিরবে।"

রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই ছেলেদের সঙ্গে গল্প গুজব করতেন। এরকমই এক আসরে হঠাৎ ছাত্র প্রমথনাথ বিশী বললেন —

"গুরুদেব আপনি তো বললেন, তোমরা পারুল বনে গিয়ে সুর্যোদয় দেখবে। কিন্তু সূর্যোদয় দেখে আশ্রমে ঠিক সময় মত ফিরতে দেরী হয়ে গেলে আমাদের পিঠে সুধাকান্তদার কিলোদয় হবে তখন কে সামলাবে ?"

একথা শুনে সকলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হেসে উঠলেও পরে তিনি সুধাকান্তকে বলেছিলেন —

"যাই করিস বাপু মারধোর করিস না।"

রবীন্দ্রনাথ শিশুবালক ও যুবকদের স্নেহ করলেও কখনও যদি কোন রকমের হিংস্রতা, নীচতা বা অনিয়ম শিশু ছাত্রদের আচরণের মধ্যে দেখতেন তাহলে বিরক্ত হতেন এবং কখনও কখনও তা তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করতেন। একদিন জনৈক শিক্ষক উদ্ধত আচরণের জন্য ছাত্রকে কায়িক শাস্তি দেন। এতে রবীন্দ্রনাথ বিরক্তত হয়ে হীতেন্দ্রনাথ নন্দী ও সুধাকান্ত কে ডেকে বলেছিলেন -

"তোরা কি মনে করেছিস তোদের ছাত্র আর শিক্ষকদের বিশ্রী আচরণকেও সহ্য করব ? ছাত্রটির একটুও আত্মসম্মানবোধ ও ভদ্রতা যদি থাকত তাহলে ওরকম আচরণ করতে পারত না। আর এঁর বয়সোচিত শিক্ষকোচিত সম্ভ্রম জ্ঞান থাকলে তিনিও এরকম শাস্তি দিতে পারতেন না।"

শিশুদের যাবতীয় দুষ্টুমিতে সর্বদাই রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয় ছিল। একবার একদল ছেলে দুর্গাপুজার সময় শিলাইদহের কুঠিবাড়ি থেকে গোলাপ ফুল চুরি করবে বলে বাগানের

পূর্ব দিকের খোলা গেট দিয়ে বাগানে ঢুকল। ঢুকেই তারা দেখল সামনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পেছনে একজন মালী ও একজন বরকন্দাজ। মালী তো রেগে আগুন। আর ছেলেরা প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম। রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন —

" কি হে পুজোর ফুল তুলতে এতদূরে এসেছো?

সুপারিনটেন্ডেন্ট অনঙ্গবাবু বললেন, 'তোমরা পাঁচিলের বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় ফুল তুলে নাও।'

কিন্তু ছেলেদের লোভ গোলাপফুলের। রবীন্দ্রনাথ তাই দেখে হেসে বললেন — "ওদের গোলাপ ফুলের লোভ, সেই লোভ কি স্থলপদ্ম মেটাতে পারে? তোমরা বাগান থেকে গোলাপফুল তোল। কিন্তু দেখো যেন গাছটাই না ছেঁড়ে।"

শুধু প্রশ্রয় নয়, শিশুদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসাও ছিল গভীর। ১৯৩৭-এ অসুস্থ হবার পর যখন সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন শত শত চিঠির স্তূপের মধ্য থেকে প্রথম জবাব দিলেন দুটি শিশুর চিঠির। শিশুরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। তাদের ছেঁড়া খাতায় এমনকি ছেঁড়া কাগজেও উৎকৃষ্ট কবিতা লিখে দিয়েছেন। শান্তিনিকেতন যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন ওখানকার শিশু ছাত্ররা কবিকে খেলার সাথী বলেই জানত। অনেকেই তাকে বলতেন, শিশুর জন্য কেন এত সময় নষ্ট করেন? এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন —

"অনেক যত্ন না করলে ফুল বাগান তৈরী হয় না, ... ওরা যে ফুল, ওদের স্নেহ চাই, সেবা চাই, যত্ন চাই। ফুলের মধ্যেই অরণ্যের সব ভবিষ্যৎ। শষ্য, ফল, বীজ, কাঠ সবারই মূলে ওই সুকুমার কটি ফুল। তাদের অযত্ন করার অর্থই হল আত্মঘাত।"

গান দিয়ে কবিতা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে,গল্প, খাবার এবং বস্তু দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের বশীভূত করে রাখতেন। তাঁর স্নেহের ধারায় শিশুরা হয়ে উঠত তাঁর একান্ত আপন।

বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রকেই রবীন্দ্রনাথ সন্তানতুল্য মনে করতেন। একবার প্রশান্তচন্দ্রের ভাই প্রফুল-চন্দ্র মহলানবিশ অসুস্থ হয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীরেও তাঁকে দেখতে কলকাতায় এসেছিলেন। একবার বিদেশ যাত্রার সময় জাহাজের খোলা ডেকে রবীন্দ্রনাথ নানা দেশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এ সময়ে ক্ষিতিমোহন সেনকে ডেকে তিনি বলেছিলেন —

"কেমন দিব্যি একটি বন্ধুর দল জোগাড় করেছি দেখুন তো .... এরা বিনা ভাষাতেই অন্তরের ভাব বুঝতে ও বোঝাতে পারে।"

একবার চীনে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা নববর্ষের পরের দিন কবিকে জানাল —

"তোমাকে নিয়ে বুড়োরাই সভা করে .... কিন্তু আমাদেরও তোমার কাছে আসতে ইচ্ছা হয়।"

তারা আরও বলেছিল যে তারা যদি ডাকে তাহলে কবি যাবেন কিনা। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেছিলেন - 'খুব দরকারী কাজ থাকলেও তা ফেলে তোমাদেরই কাছে আগে যাব।'

নানাভাবেই রবীন্দ্রনাথ ছোটদের তোয়াজ করে চলতেন। কখনো কখনো ছোটরা তাঁর কাছ থেকে একটু আধটু ঘুষও পেত। শিশুদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি

নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতেন। শিশুদের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসাও দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করেছিল। চীনে ছোটদের ডাকা সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন। সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ,

"তোমরাই যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। বড় দুর্দিন আসছে, তাই আশীর্বাদ করি ও প্রার্থনা করি যেন কিছুতে তোমরা নষ্ট না হও।"

সমাজতান্ত্রিক ভারতের এক অসমাজতান্ত্রিক দিক

সুব্রত দাস

আমরা আজ একবিংশ শতাব্দীতে বসবাস করছি। অপরিচ্ছন্ন, অসুস্থ এক সমাজ ব্যবস্থা এবং ততোধিক অসুস্থ মানসিকতা নিয়ে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে আমরা কোনোরকমে বেঁচে আছি। কেন বলছি একথা তার কারণ মানুষের মধ্যে ধ্বংস হয়েছে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, অহিংসা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। আমরা প্রতি মুহূর্তে একে অপরের প্রতিযোগী।

অর্থলিপ্সা আমাদের অন্ধ করে দিয়েছে। আমরা ভেবে দেখিনা যে অর্থ আমাদের কোন কাজে লাগে কিনা? আমাদের প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান,শিক্ষা, স্বাস্থ্য। সেই জিনিসগুলো সঠিকভাবে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা, আমরা সেটা ভেবে দেখছি না। আমরা দেখছি কে কত অর্থ হাতে পেল, কত জমল ইত্যাদি। আমরা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে বিধেয়র পিছনে ছুটে চলেছি। এই অর্থের কোনো সীমারেখা আমার কাছে নেই। আবার একদল লোকের হাতে অপরিমিত অর্থ আর অন্যদল রাস্তায় শুয়ে অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে।

বৈষম্য নয়: সাম্য অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র যা ভারতের সংবিধানে লেখা আছে তার সঠিক প্রয়োগই সমস্যার সমাধান করতে পারে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অবিকার সমাজতন্ত্রের নামে সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন, তার ব্যবসায়ীকরণ কাম্য নয়। মনে রাখতে হবে ধনতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্রই ভারতীয় সংবিধানের লক্ষ্য। আমার মনে হয় Contempt of Court এর থেকে বেশী অপরাধ Contempt of Constitution.

সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, অহিংসা, ভালোবাসা, করুণাই হল সমতা ও শান্তির মূল নীতি। আজ আমরা সবদিক থেকেই তার থেকে বিচ্যুত। ভারতবর্ষে প্রায় আমি কোটি লোকের দৈনিক আয় পঁচিশ টাকারও নীচে নেমে গেছে। অনাহারে অর্ধাহারে মানুষের দুর্দশার অন্ত নেই। সংবিধানে সমাজতন্ত্র লেখা থাকলেও আসলে ধনতন্ত্র চলছে আর চারিদিকে তারই বিজ্ঞাপন চলছে। বিশ্বের তাবড় তাবড় ধনী ভারতবর্ষে। যাদের মিনিটে কোটি কোটি টাকা আয়। বিশ্বের প্রথম দশজন ধনীর মধ্যে চারজনই ভারতীয়। অন্যদিকে আশি কোটি লোকের দৈনিক গড় আয় পঁচিশ টাকারও নীচে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে প্রায় চলি-শ হাজার লোক আত্মহত্যা করেছে এবং প্রায় দু'হাজার লোক অনাহারে মারা গেছে। আর সারা দেশের অবস্থা তো কহতব্য নয়। বিদেশে উন্নত রাষ্ট্রে কেউ যদি আত্মহত্যা করে তবে সারা দেশে আলোড়ন হয়ে যায়। সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। আর সেখানে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় চলি-শ হাজার লোকের আত্মহত্যায় সারা দেশে কোন বিকার নেই।

কোথায় চলেছি আমরা! আমরা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছি যার আয় দৈনিক পঁচিশ টাকা বা যার আয় লাখ টাকা সবাই কেমন হাসতে ভুলে গেছে। কে কত

বেশী রোজগার করবে তারই একটা অসম লড়াই চলছে প্রতি মুহূর্তে। কে কাকে কত ঠকাতে পারবে তারই প্রতিযোগীতা ভারতবর্ষে। কে কত উঁচু জাত, তারই লড়াই ভারতবর্ষে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এছাড়াও বিভিন্ন জাতের মধ্যে লড়াই আরও ভয়ঙ্কর, প্রতিমুহূর্তে চলছে।

বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এবং পত্র-পত্রিকা, সিনেমা, নাটক, সিরিয়াল এরা এই লড়াইকে প্রতিমুহূর্তে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। যেহেতু ঐ পত্র পত্রিকা গণমাধ্যম সবই তথাকথিত উচ্চবর্ণের হাতে। ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত কোনো পত্রিকা বা মিডিয়া বলছে না যে একদল মানুষ ধর্মের দোঁহাই দিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা লুঠ করছে। যা ভারত সরকারের এক বৎসরের বাজেটের থেকেও কয়েক গুণ বেশী। হাতে গোনা একটা শ্রেণী এই বিশাল পরিমাণ সম্পদ ভোগ করছে।

প্রতিটি সিনেমায় কোন না কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বা পূজার্চনা দেখানো হচ্ছে। মানুষের রক্ত মাংসের ভিতরে একেবারে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নায়কও মদ খায়, ভিলেনও মদ খায়। আনন্দ হলেও মদ খায়, দুঃখ হলেও মদ খায়। আর ভালোবাসা তো শুধু আমি তোমার, তুমি আমার। সে এক বিকৃত ভালোবাসা। সব মানুষের প্রতি সকলের প্রতি ভালোবাসা উধাও। তার পরিবর্তে ভায়োলেন্স, বিকৃত রুচি, বিকৃত পোশাক।

মানুষ ভুলে গেছে যে টাকা মানুষ খায় না। টাকা পেতে শোয় না, মানুষের প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এগুলো যদি পেয়ে যায় তবে আর অর্থের প্রয়োজন কোথায়, আর এগুলো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু মানুষ টাকার পিছনে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। নিজের প্রয়োজন মিটে গেলেও টাকার পাহাড়ে বসতে চাইছে। বলছে ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য অর্থের প্রয়োজন। একটা কথা ভাবুনতো, ছেলে মেয়েদের সঠিক শিক্ষা দেওয়াটা বেশী প্রয়োজন না কি তার জন্য অর্থ জমিয়ে রেখে যাওয়াটা বেশী প্রয়োজন। অর্থ যেন অনর্থের মূল না হয়। গৌতম বুদ্ধের সেই অমূল্য বাণী —

" চরতেভিক্ষাযে চারিকং
বহুজন হিতায়ঃ বহুজন সুখায়
তানু হিতায়ঃ আজি কল্যাণ
মধ্য কল্যাণ অন্তঃ কল্যাণ ।"

হে ভিক্ষুগণ তোমরা বিচরণ কর, যাতে সর্বাঙ্গিকভাবে বহুজনের হিতে, বহুজনের কল্যাণে, যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও শেষেও কল্যাণ। সবাই সুখী হোক।

বিশ্বের মানুষকে সুখ এবং শান্তিতে রাখার জন্য বুদ্ধ রাস্তায় নেমেছিলেন। বুদ্ধিষ্ট দেশগুলির দিকে তাকালে তা প্রতিভাত হবে। তার বড় উদাহরণ জাপান। আমরাও চাই আমাদের দেশ শান্তি, সাম্য, সুখ, অহিংসা, ভালোবাসা, সৌভ্রাতৃত্বে, সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত হবে অশান্তি নয় - শান্তি চাই, হিংসা নয় - অহিংসা চাই; ঘৃণা নয় - ভালোবাসা চাই, বৈষম্য নয় সাম্যের জয়গানে আবার ফিরে আসুক বুদ্ধ, সম্রাট অশোকের ভালোবাসার ভারতবর্ষ। যাকে নিয়ে আমরা গর্বিত বোধ করতে পারি।

নাট্য শিল্পী শম্ভু মিত্র (শতবর্ষ স্মরণে)

ডঃ শিশির কুমার বিশ্বাস

কাল গিয়ে চলে তার আপন গতিতে। সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পের গতিপ্রকৃতিও পরিবর্তিত হয় তার সাথে তাল মিলিয়ে। শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে আম জনতার মনোযোগের ক্ষেত্রেও বদলায়। অবশ্য তার সাথে পরিবর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটিও বিচার্য। এখন বলিউডের অনুষ্কা শর্মা, শ্রদ্ধা কাপুর, সিদ্ধার্থ কাপুর, সুশান্ত সিং রাজপুত, শাহরুখ খানের নাম জানে না এমন ছেলে মেয়ে নেই বললেই চলে। আবার উনিশ শতকের শেষে নটী বিনোদিনী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং বিশ শতকের সতীনাথ ভাদুড়ির জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সাধারণ দর্শকের মনোযোগ নাটকের থিয়েটার থেকে সিনেমার পর্দার দিকে আবর্তিত হতে থাকে। তবুও সেই সময় কোনো কোনো নাট্য ব্যক্তিত্ব আপন দক্ষতায় সাধারণ দর্শক মহলে প্রবেশ করেছেন। প্রসঙ্গত অবশ্যই শতবর্ষের প্রাক্কালে প্রবাদপ্রতিম শম্ভু মিত্রের (১৯১৫ - ১৯৯৭) কথা স্মরণে আসে। তার জীবনবোধ সমাজচেতনা ও শিল্পচেতনা আজও আমাদেরকে প্রাণিত করে।

শম্ভু মিত্রের জন্ম ১৯১৫ সালের ২২শে আগষ্ট, দক্ষিণ কলকাতার ডোভার রোডে। পিতা শরৎ মিত্র। বাল্যশিক্ষা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে। কেবলমাত্র লেখাপড়ার সংকীর্ণ গন্ডিতে তাঁর কিশোরমন আবদ্ধ থাকতে চাইনি নতুনতর শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা তাকে হাতছানি দিয়েছে। বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন নাট্যাভিনয়ের প্রতি। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক অভিনয় করতে গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাঁধা পান। পরে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। তবে গতানুগতিক লেখাপড়ায় তার মন আবদ্ধ থাকেনি। এই সময় তিনি পিতার প্রহরী চোখের অন্তরালে লুকিয়ে লুকিয়ে বিভিন্ন থিয়েটারে নাটক দেখতেন। ক্রমে প্রথাগত বিদ্যাচর্চা ছেড়ে নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার জগতে প্রবেশ করলেন। তখন থেকেই তিনি আর পিছু ফিরে তাকাননি।

রঙমহল থিয়েটারে অভিনয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর নাট্যচর্চার সূচনা। এই সময় তিনি পরিচিত হলেন নাট্যশিল্পী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সাথে। পরপর অভিনয় করেন মিনার্ভায় 'জয়ন্তী' এবং নাট্যনিকেতনে 'কালিন্দী' তে মিস্টার মুখার্জ্জীর ভূমিকায়। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনয়ে যোগ দিয়ে তিনি প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা শিশির ভাদুড়ীর সংস্পর্শে আসেন। এই সংসর্গ তার অভিনয় জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

১৯৩৯ খ্রীঃ শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশের লেখক ও শিল্পীরা এই মহাযুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্রমশ সোচ্চার হতে থাকে। এদেশে ১৯৪২ খ্রীঃ গড়ে ওঠে ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী। বিনয় ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখেরা এই শিল্পী গোষ্ঠীর সূচনা লগ্ন থেকেই যুক্ত ছিলেন। তাদের চেষ্টাতেই শম্ভু মিত্র এই লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। একইসঙ্গে যোগ দিলেন ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে। সেখানে তিনি আগুন, লেবরেটরি, হোমিওপ্যাথি, জবানবন্দিতে অভিনয় করেন। আর ১৯৪৪ খ্রীঃ বিজন ভট্টাচার্য্য

ও তিনি যৌথভাবে 'নবান্ন' প্রযোজনা করে সারাদেশে সাড়া ফেলে দেন।

১৯৪৮ খ্রীঃ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সহযোগিতায় গড়ে তুললেন বহুরূপী নাট্য সংস্থা। 'নবান্ন' নাটকের মাধ্যমে বহুরূপীর যাত্রা শুরু, এখানেই ক্রমান্বয়ে অভিনীত হল উলুখাগড়া, ছেঁড়া তার, চার অধ্যায়। বহুরূপীর সর্বাধিক উলে-খযোগ্য প্রযোজনা 'রক্তকরবী'(১৯৫২)। এই অভিনয়ের সংবাদ সমগ্র ভারতবর্ষে সাড়া ফেলে। খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ, তাপস সেনের আলো এবং শম্ভু মিত্রের অসাধারণ প্রযোজনায় 'রক্তকরবী' নাটক ভারতীয় নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক বিরাট মোড় ফেরায়। একাধারে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', ইবসেনের 'পুতুলখেলা' ইত্যাদি প্রযোজনা করেন। প্রকৃতঅর্থে শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে বহুরূপী ভারতীয় নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক ভিন্নতর মাত্রা দান করে। তাঁর ধ্রুপদী অভিনয়ের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' এবং সফোক্লিসের 'অয়দি পাউস'। আর আধুনিক নাটকের তালিকায় বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' বা 'ত্রিংশ শতাব্দী' এবং বিজয় তেন্ডুলকারের 'চোপ আদালত চলছে'। ১৯৭৮ সালে দল পরিচালনার ক্ষেত্রে সংঘাত সৃষ্টি হওয়ায় তিনি চিরকালের মতো বহুরূপী ত্যাগ করেন। ১৯৭৮ সালের ১৬ই জুন আকাডেমিতে 'দশচক্র'ই বহুরূপীতে তাঁর শেষ অভিনয়।

তিনি একাধিক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৭০-এ 'পদ্মভূষণ', ১৯৭৬-এ 'ম্যাগসাই', ১৯৮৩-তে বিশ্বভারতীয় 'দেশিকোত্তম'। তবে তাঁর জীবনে অনেক বদনাম, অবহেলা জুটেছে। তাই অভিমানাহত শম্ভু মিত্র চেয়েছিলেন মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে যেন কোন আড়ম্বর না করা হয়। তাঁর ইচ্ছাপত্র অনুসারে মৃত্যুর পর সকলের অন্তরালে তাঁর দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

তিনি বেশ কয়েকটি মৌলিক নাটকের স্রষ্টা। তার মধ্যে উলে-খযোগ্য - 'উলুখাগড়া', 'একটি দৃশ্য', 'বিভাব', 'কাঞ্চনরঙ্গ', (অমিত মিত্রের সহযোগে), 'গর্ভবতী বর্তমান', 'ঘূর্ণী চাঁদ বণিকের পালা', 'অতুলনীয় সংবাদ' প্রভৃতি। তাঁর নাট্যরূপগুলির মধ্যে রয়েছে — রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', ইওজিনের নাটক অবলম্বনে 'ওনিল-এর স্বপ্ন', ইবসেনের নাটক অবলম্বনে 'পুতুলখেলা', সোফোক্লিসের নাটক অবলম্বনে 'রাজা অয়দিপাউস' ইত্যাদি।

'উলুখাগড়া' নাটকে তার গোষ্ঠীচেতনা এবং ব্যক্তিচেতনা পরস্পরের হাত ধরে চলেছে। এই ব্যক্তি মানুষ অবশ্য কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির প্রতিনিধি নয়, সে অবক্ষয়িত সময়ের প্রতিনিধি। একটি ধ্রুব বিশ্বাসের জগৎ ও আদর্শ বোধের প্রেরণা নাট্য কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই বিশ্বাস থেকে নগেন বলে ঃ - "আমি বিশ্বাস করি পৃথিবী থেকে সমস্ত কিছু ভাল এখনও ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

তিন অঙ্কে ও চারটি দৃশ্যে সমাপ্ত মৌলিক নাটক 'ঘূর্ণি' (১৯৫০)। যেখানে মধ্যবিত্ত পরিবারের দোলাচলবৃত্তি প্রতিফলিত। নাটকটিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের আভ্যন্তরীন বিরোধ ও অসামঞ্জস্য উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে বিরাট অনৈক্য প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধহীন দয়াহীন পরিবেশের ঘূর্ণাবর্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

তাঁর 'বিভাব' (১৯৫০) নাটকটি জাপানি কাবুকি নাটকের অনুসরণে রচিত একটি নতুন ধরণের নাটক। অবশ্য এটিকে প্রযোজক সংস্থার নথিতে বহুরূপীর সদস্যদের যৌথ রচনা বলে উলে-খ করা হয়েছে। এই নাটকে অবক্ষয়িত সময় উঠে এসেছে। প্রাচীন নাট্য ঐতিহ্যকে তুলে ধরাও ছিল এই নাটক রচনার অন্যতর উদ্দেশ্য।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'চাঁদ বণিকের পালা'য় (১৯৬৪) তিনি শহুরে নাগরিক জীবনের পরিবর্তে লোক জীবনের মিথকে নাটকে রূপায়িত করলেন। চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব নাটকে আলো আধারের রূপকে ব্যক্ত হয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যের নরখন্ডের কাহিনিকে নাট্যকার আলোচ্য নাটকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। নাটকের নায়ক চন্দ্রধর বা চাঁদ বনিক বাঙালি জীবনের সত্য, মঙ্গল ও আলোর আদর্শের প্রতীক। সে এক ও অখন্ড আদর্শে বিশ্বাসী। তাই শিব ছাড়া অন্য কোনো দেবতাকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। নাটকটি পালা গানের ঢং লেখা। নাট্যকার সমকালীন সমাজে সৎ অসৎ এর দ্বন্দ্বকে, সমকালীন রাজনীতির জটিলতাকে চাঁদের বাণিজ্য যাত্রায় বাঁধাদানের মধ্যে রূপায়িত করেছেন। যখন বেণীনন্দন বল-ভাচার্যকে দিয়ে চাঁদের আদর্শ ভাঙার প্রস্তাব পাঠায়। এর মাধ্যমে নাট্যকার সমকালীন রাজনীতির দুর্বত্তায়নের চেহারাটিকে রূপ দিয়েছেন। চাঁদ বণিককে কেন্দ্র করে সে সময়ের গোটা জাতির প্রতিচ্ছবি বিবর্তিত হয়েছে।

''পুতুলখেলা' নাটকে তিনি প্রেমহীন দাম্পত্যকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রতীকের মাধ্যমে নাট্যবিষয় উপস্থাপিত, মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় বোঝাপড়া বাদ দিয়ে সম্পর্কের প্রকৃত ভীত তৈরী হয় না। এই গভীরতর উপলব্ধি নাটকেও ও মঞ্চায়নে অসামান্য দক্ষতায় রূপায়িত হয়েছে।

পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস যখন মানুষের অন্তরকে কুরে কুরে খায় তখন মানুষের আদিম রূপ বেশি করে প্রকট হয়ে ওঠে — সেই অন্তঃসারশূন্য, মূল্যবোধহীন জীবনের ছবি হল 'গর্ভবতী বর্তমান' নাটকটি। এজন্য মুনাফা লোভী ব্যবসায়ী খরিদ্দারের গলা কাটে, বুদ্ধিজীবীরা প্রগতির নামে নিজেদের স্বার্থপরতাকেই প্রকাশ করে। তাই স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে সব প্রেম ভালোবাসা মুছে যায়। তাই স্বামীর চোখে স্ত্রী - 'মুখোশ পরা ডাইনি।' অন্যদিকে স্ত্রী ভাবে — 'আমি যেন ওর সংসারের ক্রীতদাসী, আমি যেযন ওর বিছানার বেশ্যা।'

সমকালীন সমাজের দুর্নীতি ও ব্যভিচারের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে তাঁর 'অতুলনীয় সম্বাদ' একাঙ্কটি। মুখে আদর্শবাদের বুলি থাকলেও অনৈতিকতা ও পাপাচারের ফলে মানুষের অবস্থা কেমন পর্যায়ে পৌঁছেছে সে বিষয়টি উঠে এসেছে। দুটি মধ্যবয়সী লোকের কথাবার্তায় তা স্পষ্টঃ "আর বলবেন না মশাই। সব ব্যাটা চোর সব। / যা বলেছেন। সবাই কেবল নিজের নিজের স্বার্থটা দেখছে। দেশটার দিকে তো কেউ দেখছে না। / এই।"

আজীবন তিনি মঞ্চ নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করেছেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত একটি জাতীয় মঞ্চ কামনা করেছেন। তাঁর পূর্বে শিশির কুমার ভাদুড়ীও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। প্রকর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মানুষের অন্তরের মুক্তিতে চিরকাল শ্রদ্ধাবান শম্ভু মিত্র সেই গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে কখনও প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য মেনে নেননি। আবার

মঞ্চ সজ্জার কল্পনাময় বিন্যাস ও সংস্থান তার আগে কেউ বাংলা থিয়েটারে রূপায়িত করেননি।

একটি উন্নত আদর্শকে সামনে রেখেই তাঁর শিল্পীজীবন আবর্তিত হয়েছে। তিনি জানতেন আগাগোড়া মিথ্যাচার আর বেইমানি দিয়ে অভিনয় করা যায় না। কঠোরভাবে সুবিধাবাদের বিরোধী শম্ভু মিত্র মনে করতেন, "নিজের কাছে যা আশা করা যায় না, তা সমাজের কাছেও আশা করা বৃথা। আমি কষ্ট করে সৎ হব না, অথচ সমাজটা সৎ হয়ে যাবে। আমাদের মতো লোককে নিয়েই তো সমাজ।"

তাঁর সুযোগ্য কন্যা শাঁওলী মিত্রের মন্তব্য থেকে শম্ভু মিত্রের শিল্পাদর্শ ও তাঁর স্বকীয় জীবনবোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় ঃ "এই চিন্তার স্বচ্ছতা, এই যুক্তির অনুসন্ধান কার্যকারণ সম্পর্কে প্রতিটি ঘটনার পিছনে সন্ধান করা, সবসময়েই একটা 'কেন?'-র সম্মুখে দাঁড় করানো নিজেকে এবং অপরকে আর তারই দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে স্বচ্ছ করে তোলবার প্রয়াস এইটাই ওই 'শম্ভু মিত্র' নামক ব্যক্তিটির প্রধানতম গুণ এবং দোষ। আর ওই বিশেষত্বই বোধ হয় অন্য সবার থেকে তাঁকে এত আলাদা করে দিয়েছিল, মানুষ হিসাবে।" ['দেশ' পত্রিকা, জুন ১৯৯৭]

শতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর উন্নত শিল্পবোধ, সমাজ সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। এই স্বকীয় চিন্তাধারাই তাকে বহুকাল বাঁচিয়ে রাখবে।

সহায়ক গ্রন্থ —

১) চাঁদ বণিকের পালা — শম্ভু মিত্র
২) কাকে বলে নাট্যকলা — শম্ভু মিত্র
৩) নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) — আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
৪) বাংলা নাটকের ইতিহাস — অজিত কুমার ঘোষ
৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — দেবেশ কুমার আচার্য।

প্রাচীন ভারতীয় বিবাহ পদ্ধতি ও বৈবাহিক সম্পর্ক

অজিত কুমার ঘোষ

বর্তমান ভারতীয় সভ্য সমাজে যে হিন্দু বিবাহ রীতি-নীতি লক্ষ্য করা যায় তার মূল ভিত্তি প্রাচীন ভারতীয় বিবাহ ব্যবস্থা। এই ঐতিহ্যকে আমরা ক্রমশঃ আজও অনুসরণ করে চলেছি হয়তো আয়োজন ও জাঁকজমক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় তুলনায় ভিন্নরূপে। বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কেবল বংশধর সৃষ্টি ও রতি আনন্দ উপভোগ বিবেচিত হত না, রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য গঠনে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রাধান্যতা ইতিহাসের পাতায় পাতায় লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন কালে সম্পূর্ণ সাবালিকা হবার পরই মেয়েদের বিবাহ সচরাচর ঘটত। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান বিবাহের সময় বরের বয়স অন্ততঃ কুড়ি বছর এবং কন্যার বয়ঃসন্ধি ঠিক আগে। কন্যার প্রথম রজোঃ দর্শনের পূর্বেই যে পিতা বিবাহ দিতেন না, তিনি অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হতেন। মোটামুটি প্রচলন অনুযায়ী আদর্শ বিবাহ তাকেই গণ্য করা হত যেখানে পাত্রীর বয়স পাত্রের বয়সের এক তৃতীয়াংশের বেশী নয়। সমসাময়িক কাব্য ও উপন্যাস, শিলালেখ ও তাম্রপটে যে নায়িকা বা নারীর উলে-খ আছে তারা সবাই বিবাহের সময় পূর্ণবয়স্কা ছিলেন। বেশি বয়সে বিবাহের ফলে অনেক সময় পতি নির্বাচনে মেয়েদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হত। ধর্মসম্মত পাত্র ও পাত্রীর পিতামাতাই স্থির করতেন এবং বর্তমানে আজও তা করে থাকেন। এটি স্থির হত প্রচুর আলোচনা ও পরামর্শ, লক্ষণ বিচার এবং পাত্র পাত্রীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিচারাদি করে। বর ও বধূকে একই বর্ণ ও একই গোত্রের মধ্যে হতে হত। তবে এরও অনেক ব্যতিক্রমও ছিল।

আজও হিন্দু পিতামাতাদের মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে নিজেদের বিপুল ঋণজালে আবদ্ধ করে ফেলতে দেখা যায়। বিবাহের নিয়ম কানুনের খুঁটিনাটি এক এক গ্রন্থে ভিন্ন রকম হলেও মূল ব্যাপারটি আজও যেমন, প্রাচীনকালেও মোটামুটি তেমনই ছিল। ঋগ্‌বেদে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে এর প্রায় কোন প্রভেদ নেই। ধর্মসম্মত বিবাহের পদ্ধতি ছিল খুবই জটিল।

ঋকবেদে যে বিবাহের পদ্ধতি ছিল তাতে বিবাহের ব্যয়ভার বেশীর ভাগই বহন করতে হত কন্যার পরিবারকে। সাথে যৌতুকের ব্যয়ভার যুক্ত হত কন্যার পিতার উপর আবার অনেক সময় কন্যার পিতাকে যৌতুক দিতে বাধ্য করা হত এমনও দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। কন্যার গৃহ প্রাঙ্গনে জাঁকজমকপূর্ণ এক অস্থায়ী মন্ডপ তৈরী করে তাতে বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। বর আসতেন সুসজ্জিত হয়ে বন্ধু ও আত্মীয়দের দল সঙ্গে নিয়ে কন্যার গৃহে। মধু ও দধি মিশ্রিত পানীয় দিয়ে কন্যার পিতা বরকে সম্বর্ধনা জানাতেন। বর ও বধূকে পৃথকভাবে বিপরীত দিকে একে অপরের দিকে বসান হতো। পুরোহিতের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে দম্পতি পরস্পরকে দেখতো - অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম বারের মত। কন্যার পিতা আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রের হাতে কন্যাতে সমর্পণ করতেন। এবং পাত্রকে ধর্ম, অর্থ ও

কাম এই তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এই মর্মে পত্নীর প্রতি প্রতিশ্রুতি দিতে হত। বর বধূ একে অপরের হাত ধরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করত আর পবিত্র যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত, তন্ডুল ও শস্যকণা উৎসর্গ করত। এই সময় তাদের অঙ্গবস্ত্র গ্রন্থিবদ্ধ থাকত পরস্পরের সাথে। কনেকে পা রাখতে হত যাঁতার উপর। বর বধূ সাত পা যেত একসাথে, বধূ আগে থাকতো প্রতি পদক্ষেপে সে একটি তন্ডুলস্তূপ মাড়িয়ে যেত। সবশেষে পুরোহিত পবিত্র জলের ছিটা দিতেন এবং এর সাথে সাথে অনুষ্ঠানের প্রধান অংশের সমাপ্তি হত। বিশ্বাস করা হত ঐন্দ্রজাল ও আধ্যাত্মিক প্রভাবযুক্ত বিবিধ, মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা (যে মন্ত্রগুলি বৈদিক ও অন্যান্য উৎস থেকে গৃহীতত) বিবাহ পরবর্তী জীবন মঙ্গলময় হয়ে উঠবে।

কন্যা গৃহে বিবাহ সম্পন্ন হবার পর নব দম্পতি এরপর চলে যেত বরের গৃহে, সেখানেও একবার যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হত। সন্ধ্যায় বর ও বধূকে ধ্রুবতারা দর্শন করানো হত, কারণ ধ্রুবতারা বিশ্বস্ততার প্রতীক। পরপর তিন রাত দম্পতিকে রক্ষা করতে হত আত্মসংযম। এই তিন রাত সম্পর্কে কোন কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে এক শয্যায় নিজেদের মাঝখানে একটি দন্ড রেখে শয়নের অনুমতি পেত, আবার অনেক সময় পৃথক ভূমিশয্যায় শয়ন করতে হত। চতুর্থ রাত্রিতে স্বামীকে এক অনুষ্ঠান পালন করতে হত যার উদ্দেশ্য ছিল সন্তান উৎপাদন সুনিশ্চিত করা। এরপর স্বামী স্ত্রীর একান্ত মিলনের মধ্য দিয়ে বিবাহ পরিপূর্ণতা পেত। বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। বিবাহের অন্যতম তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হল, প্রথমটি গৃহস্থের করণীয় যাগযজ্ঞাদির মাধ্যমে ধর্মের পুষ্টি সাধন; দ্বিতীয়টি বংশধর সৃষ্টি করে পরলোকগত পিতা ও পিতৃপুরুষের তৃপ্তিবিধান এবং তৃতীয়টি হল 'রতি' অর্থাৎ যৌন মিলনের আনন্দ উপভোগ করা।

উপরিউক্ত বর্ণিত এই বিবাহ পদ্ধতিই আজও হিন্দু পরিবার অনুসরণ করে থাকে। প্রাচীন ভারতে কেবলমাত্র এই পদ্ধতি ছাড়াও ভিন্ন পদ্ধতিতে বিবাহ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্ম, আর্য, দৈব্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ - এই আটপ্রকার বিবাহের কথা উলে-খ করেছেন যাকবল্ক্য। একই কথা অর্থশাস্ত্রে, মেগাস্থিনিসও উলে-খ করেছেন। তবে ধর্মসূত্রে আটপ্রকার বিবাহের উলে-খ থাকলেও জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে দৈব, আর্য ও পৈশাচ বিবাহের কথা নেই। এছাড়াও সমকালীন সাহিত্য অর্থশাস্ত্র এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে আরো দুটি বিবাহের উলে-খ করা হয়েছে। যথা — অনুলোম (উঁচু বর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিচু বর্ণের মেয়ের বিবাহ) ও প্রতিলোম (নিম্নবর্ণের পুরুষের সাথে উঁচু বর্ণের মেয়ে বিবাহ) বিবাহ।

দেখা যায় বিবাহের যে আটটি রূপ ছিল তাতে প্রথম চারটি ব্রাহ্ম, আর্য, প্রজাপত্য ও দৈব্য বিবাহের ধরণ ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ছিল। ক্ষত্রিয়দের বিবাহ হিসাবে বিবেচ্য ছিল গান্ধর্ব বিবাহ। অসুর বিবাহ স্বীকৃতি ছিল বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে দানবিক বিবাহ বলে বর্ণিত করা হয়েছে, এটি সমাজে নিন্দিত হয়েছে। অনুশাসন গ্রন্থগুলিতে নিম্নলিখিত আটপ্রকারের বিবাহের কথা বলা আছে —

ব্রাহ্ম ঃ এই পদ্ধতিতে পিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারর কন্যাকে বস্ত্র ও অলংকার দিয়ে সুসজ্জিত করে বিদ্বান ও চরিত্রবান নিজ বর্ণের পাত্রের সঙ্গে যথাবিধি যৌতুকসহ বিবাহ।

আর্য ঃ এই বিবাহে পিতা তার কন্যার মূল্য হিসাবে বরের কাছ থেকে এক জোড়া গাভী বা বলদ গ্রহণ করে তাকে পাত্রস্থ করতেন।
প্রজাপত্য ঃ'তোমরা দুজনে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করো' এই শুভ কামনা জানিয়ে পিতা বরের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করতেন।
দৈব্য ঃ এই প্রকার বিবাহে গৃহস্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে পুরোহিতকে তাঁর প্রাপ্ত অংশ হিসাবে কন্যাকে দান করা হত।
গান্ধর্ব্য ঃ পিতা মাতার সম্পত্তি ক্রমে বিবাহ হত। আবার পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রেম একমাত্র বিবেচ্য ছিল।
অসুর ঃ পাণিপ্রার্থী কর্তৃক কন্যার পিতাকে যৌতুক স্বরূপ অর্থ বা বিভিন্ন দান সামগ্রি প্রদান করা হত। দান সামগ্রি বিবাহের পর স্বামীকে প্রত্যার্পণ করা যেত।
রাক্ষস ঃ বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ।
পৈশাচ ঃ কন্যাকে বলপূর্বক ছিনিয়ে এনে বা ঘুমন্ত অবস্থায় ধর্ষণ করে পরে তাকে বিবাহ করা।

এছাড়াও তখনকার সমাজে বহুগামিতা এবং বিধবা বিবাহ সম্পর্কে জানা যায়। এক পুরুষ এক স্ত্রী ছিল রীতি। তবে পুরুষরাও কখন কখন একাধিক পত্নী গ্রহণ করেছেন। ধনী পরিবারের পুরুষরা এক স্ত্রী থাকলেও পুনরায় বিবাহ করতেন। দুটি স্ত্রী (দ্বিভার্যা) ও বহু পত্নীর (ভূরিভার্যা) উলে-খ করেছেন বরাহমিহির ও কালিদাস। নারীদের বহু পতিত্বের কোন নিদর্শন ঋকবেদে নেই তবে স্বামী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে স্ত্রী পুনঃবিবাহ করতেন। সেক্ষেত্রে বিবাহ হত স্বামীর ছোট ভাই বা দেবরের সঙ্গে। এছাড়াও বিষ্ণুগুপ্ত তার 'অর্থশাস্ত্রে' দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেছেন যে স্বামী দুশ্চরিত্র, চিরপ্রবাসী, রাজদ্রোহী, ব্রাত্য বা ক্লীব হলে স্ত্রী সেক্ষেত্রে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারেন। তেমনি স্ত্রী যদি শুধু কন্যা সন্ত ানেরই জন্ম দেয় তাহলে আট বছর অপেক্ষা করবার পর স্বামী তাকে ত্যাগ করতে পারতেন। তবে সেক্ষেত্রে স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

প্রাচীনকালে বিধবা বিবাহও প্রচলিত ছিল। বিধবাদের বিবাহ বা পুনর্বিবাহ ঋকবেদে উলে-খ আছে যা মৃত পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অনুমোদন যোগ্য। বৃহৎসংহিতায় বিধবাদের পুনর্বিবাহ ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের কথা উলে-খ আছে। অমর কোষ, যাজ্ঞবল্ক্য, বাৎসায়নগুপ্ত সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের কথা উলে-খ করেছেন। সন্তান লাভের জন্য বিশেষত বিধবাদের ক্ষেত্রে 'নিয়োগ প্রথা'র কথা জানা যায় এবং স্বামী ক্লীব হলে নারীদের উপরিউক্ত নিয়োগ প্রথার সুযোগ দিতে হত। 'নিয়োগ প্রথা' বিষয়টি সন্তানলাভের জন্য সে যুগে অনুমোদন যোগ্য ছিল। এমন কি উভয় পক্ষের শ্বশুর-শাশুড়িদের অনুমোদন প্রয়োগে বিষয়টি সুযোগ পেত। বাল্যবিবাহ সমাজে সেভাবে ছিল না। তবে ভারতীয় সমাজে তখনকার দিনে স্বয়ম্বর বিবাহের প্রচলন ছিল। গ্রিক লেখক নিয়ারকাস তার বর্ণনায় তা উলে-খ করেছেন।

বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র বা আইন সংহিতাগুলিতে বিবাহ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে দেখা যায়। বিবাহের উপর কতগুলি বিধিনিষেধ লক্ষ্য করা যায় সেখানে

বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি তার মায়ের দিক থেকে উর্দ্ধতম পঞ্চম পুরুষ এবং পিতার দিকে থেকে উর্দ্ধতম সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সম্পর্কিত ক্ষেত্রে সমূহের বিবাহ করতে পারবে না। এছাড়া বা বহিঃগামী এবং বা অন্তঃগামী বর্ণের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত নিয়ম কানুন ছাড়া বিবাহ সংক্রান্ত কতগুলি যোগ্যতা বা বিবেচনা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়। এখানে বলা হয় এইরূপ পরিবারে বিবাহ না করা শ্রেয় যেখানে কোন পুরুষ সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি, যেখানে বেদ পাঠ করা হয়নি, ধর্ম সংক্রান্ত দায়িত্ব অবহেলিত বা পরিবারের সদস্যগণ কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত । এছাড়া কন্যার গুণাবলী বিবাহ ক্ষেত্রে বিবেচ্য,সংক্ষেপে কন্যাকে একটি উত্তম পরিবার থেকে এবং ত্রুটিহীন বংশধারা থেকে আসতে হবে।

বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে রাজ্য বিস্তার করা এবং এক শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে মগদ রাজ বিম্বিসার তাঁর রাজ্যকে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যান। কোশল রাজ মহাকোশলের কন্যা ও প্রসেনজিতের বোন কোশলাদেবীকে বিবাহ করে কাশীর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল যৌতুক হিসাবে পান। এই অঞ্চল থেকে বছরে একলক্ষ কার্ষাপণ মুদ্রার রাজস্ব আদায় হত। এছাড়া লিচ্ছবি নেতা চেতকের কন্যা চেল-না, বিদেহ রাজ্যকন্যা বাসবী, পাঞ্জাবের মদ্র রাজকন্যা ক্ষেমা বিম্বিসারের পত্নী ছিলেন। এই বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তিনি মগধের পরিধি প্রসারিত করেন। ৩০৫ খ্রীপূর্বাব্দে সেলুকাস পরাজয়ের পর তার কন্যা হেলেনাকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাথে বিবাহ দেন। এর সাথে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, বেলুচিস্তান জায়গায় চন্দ্রগুপ্তের অধিকার স্বীকৃত হয়। বৈবাহিক সুসম্পর্ক স্থাপনের ফলে চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে ৫০০ যুদ্ধ হস্তি দিয়ে সহায়তা করেন। ফলে সেলুকাস সহজেই এন্টিগোনাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে।

বিদেশিরাও কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি গ্রহণ করে। এইসব বিদেশিরা সাতবাহন ইক্ষাকু,লিচ্ছবি প্রভৃতি ভারতীয় রাজবংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনন করেন। শক্ রাজ রুদ্রদমনের এক কন্যার সঙ্গে সাতবাহন রাজ গৌতমী পুত্র সাতকর্ণির এক পুত্রের বিবাহ হয়। পশ্চিম শক রাজ মহাক্ষত্রপ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের কন্যা রুদ্র ভট্টারিকার সঙ্গে ইক্ষাকুরাজ বীরপুরুষ দত্তের বিবাহ হয়। এছাড়াও দেখা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তর সাথে বাকটক রাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ হয়। এর ফলে বাকটক রাজবংশে শাসনক্ষেত্রে গুপ্ত রাজবংশের প্রভাব দেখা যায় যখন নাবালক পুত্রের প্রতিনিধি রূপে রানিমা প্রভাবতী গুপ্ত শাসন করেন। পুষ্যভূতি বংশের রাজা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের অধিকারী হলেও ভগিনীর বৈবাহিক সূত্র ধরে গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর সিংহাসনের অন্যান্য দাবীদারকে ঠেকিয়ে ভগ্নী রাজ্যশ্রীর অভিভাবক হিসাবে কনৌজের শাসন কার্য পরিচালনা করে। পরে তিনি নিজেকে কনৌজের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। গুজরাটের বলভী রাজা ধ্রুবসেনের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হর্ষ ধ্রুবসেনের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে বলভী রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন।

সামাজিক ইতিহাসে 'বিবাহ' একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিবাহ ব্যতীত পরিবার

গঠিত হয় না। আর পরিবার হল সমাজের মূল ভিত্তি। প্রাচীন ভারতীয় চতুর্বর্ণের মধ্যে বিবাহ, বিরহ কাঠামোয় যেমন পরিবর্তন এনেছে, তেমনি অসংখ্য বর্ণসংকর জাতির সৃষ্টি করেছে এই বিবাহ। বর্তমান হিন্দু সমাজে যে বৈবাহিক রীতি দেখতে পাই, প্রাচীন ভারতীয় বিবাহ ব্যবস্থা ছিল তার উৎসস্থল। এই ঐতিহাসিক পরম্পরাকেই যুগ যুগ ধরে আমরা অনুসরণ করে চলেছি। এই বৈবাহিক সম্পর্ক কখন কখন রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের পরিচায়ক হিসাবে প্রাচীন ভারতে দেখা যায়। এই পরম্পরা আমরা সুলতানি ও মুঘল যুগেও দেখতে পাই। মুঘল সম্রাটদের সঙ্গে রাজপুত কন্যা বিবাহ সম্পর্কে বলতে পারি। বিখ্যাত দুই মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান দুজনই ছিলেন রাজপুত রাজকন্যার গর্ভজাত সন্তান। আধুনিক গণতন্ত্রের যুগের পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক রাজনৈতিক ও সমাজতন্ত্রের ভিতকে মজবুত করেছে।

গ্রন্থসূত্র ঃ

১। দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত ইতিহাসের সন্ধানে আদিপর্ব ঃ প্রথম খন্ড, সাহিত্য লোক, ২০০০

২। এ.অ্যল.ব্যসম, অতীতের উজ্জ্বল ভারত, (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৫)

৩। দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত ইতিহাসের সন্ধানে আদিপর্ব ঃ দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য লোক, ২০০৭

৪। ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, প্রাচীন যুগ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১

৫। রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট, ব-্যাক সোয়ান, হায়দ্রাবাদ, ১৯৮০, (বঙ্গানুবাদ কৃষ্ণাগুপ্তা)

বাংলা লোকসাহিত্যে প্রবাদ প্রবচনের গুরুত্ব

অধ্যাপিকা বৈশাখী গোস্বামী

'লোকসাহিত্য' বিষয়টি 'লোকসংস্কৃতি' নামক বিজ্ঞানবদ্ধ শাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। আমরা ইংরেজি 'Folklore'এর প্রতিবাদ হিসাবে লোকসংস্কৃতি শব্দটিকে বাংলায় গ্রহণ করেছি। লোকসংস্কৃতি হল একই রূপে ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক পরিবেশে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী যে আচার, আচরণ, জীবনচর্চা, সাহিত্য, শিল্প ও ললিত কলা ইত্যাদির ঐতিহ্যানুযায়ী অনুশীলনে স্বাভাবিক পারঙ্গমতা অর্জন করে তার আলোচনা, বিচার, সংরক্ষণ, চর্চা প্রভৃতিই লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত। যেমন - লোকাচার (Folk Custom), লোকবিশ্বাস (Folk Belief), লোক উৎসব (Folk Festival), লোকশিল্প (Folk Art), লোকনৃত্য (Folk Dance), লোকধর্ম (Folk Religion), লোক সংস্কার (Folk Superstitions), লোকসাহিত্য (Folk Literature), লোকসংস্কৃতি সমগ্র মানবসমাজের অন্তর্গত এক এক জনগোষ্ঠীর 'সাংস্কৃতিক দর্পণ' বলে অভিহিত করা যায়।

"Folklore is the material that is handed on by tradition, either by word or mouth or by custom and practice."

লোকসংস্কৃতি যে বিরাট বিষয়কে তার জ্ঞান রাজ্যের অন্তর্গত করেছে, লোকসাহিত্য তারই এক ঐতিহ্যসম্পন্ন ও বৈচিত্র্যময় প্রদেশ।

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী শাখা লোকসাহিত্য। চরিত্র এবং গঠন প্রকৃতি অনুসারে লোকসংস্কৃতি বা Folklore-কে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি।

ক) বস্তু নির্ভর লোকসংস্কৃতি বা Material Folklore

খ) অ-বস্তু নির্ভর লোকসংস্কৃতি বা Non Material Folklore.

এই দুই ভাগের মধ্যে প্রথম ভাগের অন্তর্গত হলে পোষাক পরিচ্ছেদ, কুটির শিল্প, লোক ভাস্কর্য, বিভিন্ন শ্রেণীর পাত্র বা দেওয়াল চিত্র ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় লেখা ব্যাপারের কোন সাহায্য ছাড়াই বিশেষ জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যে সকল বস্তুকে রূপায়িত করে তাই হল বস্তু নির্ভর লোকসংস্কৃতি। অপরপক্ষে লোকসাহিত্য হচ্ছে অ-বস্তু (Non Material Folklore) বিভাগের অন্তর্গত। একজন পাশ্চাত্য সমালোচক লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন - 'Folk literature is simply literature transmitted orally. অর্থাৎ লোকসাহিত্য হল সেই সাহিত্য যা স্রষ্টার মুখে সৃষ্টি হয়ে মুখে মুখেই প্রসার লাভ করে। বিবর্তনকে স্বীকার করে এবং মানব অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে জীবিত থাকে।

অনেকের মতে, লোকসাহিত্য অপরিশীলিত বা নিরক্ষর গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি।

এর গায়ে লেগে থাকে মাটির গন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই এই সাহিত্যের জন্ম হয় মানুষের মুখে মুখে। উচ্চতর সাহিত্য যেখানে এক এক বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ লোকসাহিত্য সেক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের সম্পদ রূপে গৃহীত ও বিবেচিত হয়ে থাকে।

লোকসাহিত্য প্রবাদ বা প্রবচন অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রবাদের বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও প্রবাদ যে লোকসাহিত্যের প্রাচীন শাখা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রবাদের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত পৌঁছানো বড়ই কষ্টকর। কিন্তু একথা ঠিক যে মানসিকতার বা মননশীলতার দিক দিয়ে যে সকল জাতি খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি তাদের মধ্যে প্রবাদের প্রচলন নেই কিংবা থাকলেও তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি। প্রবাদকে বলতে পারি, প্রকৃষ্ট বচন। অভিধানে প্রবাদের একটি অর্থ হল ঃ 'পরম্পরাগত বাক্য'। পরম্পরা বলতে লোক পরম্পরা উভয়কেই বোঝায়। প্রবাদ একদিক দিয়ে যেমন প্রাচীন তেমনি অন্যদিক দিয়ে আধুনিকও। এটি বহুদিন ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে, এই অর্থে প্রাচীন আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করে বিভিন্নমুখী ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বহু পরীক্ষিত উপদেশ ও নীতি প্রচার করাই এর লক্ষ্য। প্রবাদ ব্যক্তি ও সমাজজীবনের কর্তব্য নির্দেশক এবং রূঢ় সমালোচক তাই প্রবাদগুলি লোকপ্রিয় ও লোকগ্রাহ্য। লোকের মুখে মুখেই প্রবাদের প্রচার ও প্রসার। লোকস্মৃতি হল প্রবাদের বাহন। সাধারণ বুদ্ধিরর বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রবাদে। আর সেই বহুদর্শিতার প্রকাশ সরস ও সংক্ষিপ্ত। প্রবাদ হল আপাত তুচ্ছ কিন্তু স্বরূপগত গভীর উক্তি। সাধারণের সম্পদ তাই সহজযোগ্য। প্রবাদের বিষয় বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। নানা কারণে এই প্রবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন ভাবে প্রবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন —

" দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির সাহিত্য ও প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তায় ক্ষিপ্র, রসময় সংক্ষিপ্ত বাক্যের প্রচলন দেখা যায়, এগুলিকে প্রবাদ বলে।"

প্রবাদ সম্পর্কিত স্পেনদেশীয় উক্তির ইংরেজী অনুবাদ — "A proverb is a short sentence baased on long experience." অর্থাৎ ব্যক্তির বা জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে সংক্ষিপ্ত অথচ রসভিত্তিক ক্ষিপ্র বাকের উৎপত্তি হয়েছে তাকে বলে প্রবাদ। প্রবাদের সত্য হল দশজন মানুষের অভিজ্ঞতার সত্য। বাংলা প্রবাদে এই সম্পর্কে বলা হয় - ''দশজন রাজি যেখানে, খোদা রাজি সেখানে।" ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' সংগ্রহের ভূমিকায় উলে-খ করেছেন, প্রবাদ "একজনের সহজবুদ্ধিতে সহসা প্রতিফলিত হইলেও ইহা বহুজনের সুলভ বুদ্ধির উপায় ও ক্ষিপ্র প্রয়োগের অস্ত্র।" প্রবাদ সম্পর্কে ফরাসী শিক্ষাবিদদের মন্তব্য — "Proverbs are crystalizedd forms of human experience and as human experience gives no definite solution aany problem, proverbs can not do so other."

পাশ্চাত্য দার্শনিক বেকন প্রবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন — "The genious

wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs." নির্দিষ্ট ভৌগোলিক খন্ডের মধ্যে অবস্থিত একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সঠিক ধারণা পাওয়া যায় প্রবাদের মধ্যে। "ঈশান কোণে মেঘে/ ঝড় ওঠে জেগে।" প্রবাদে wisedom এর থেকে experience এর মূল্য অনেক বেশী। যেমন - "গাঁ নষ্ট কানায় / পুকুর নষ্ট পানায়।" বহু মনীষির ধারণা যে প্রবাদগুলি মানবসভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মৌখিকভাবে জন্মলাভ করে লোকোক্তি হিসাবে শ্রুতি পরম্পরায় চলে আসতে থাকলেও স্বল্প শব্দ প্রয়োগে সরসতাও গভীর ভাব প্রকাশ করতে সমর্থ। কর্মবহুল জীবনে প্রবাদের মূল্য খুব বেশী, কারণ অল্প সময়ে আমাদের অনেক কাজ সমাধা করতে বা কথা বলতে হয়।

প্রবাদ হল সুদীর্ঘ বাস্তব জীবনের বহু পরীক্ষিত সত্যের রসময় প্রকাশ। তবে এগুলিতে সহজ মানবিক বৃত্তি সমূহের ও নিগূঢ় তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায় - " Corrective and creative step for better life." সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত বিভিন্ন ভাবনার প্রকাশ ঘটায় প্রবাদ। বাংলার বহু প্রবাদে নারী জীবনের দুঃখ বেদনা, সামাজিক চিত্র সহ অর্থ- রাজনৈতিক, ইতিহাসও ছড়িয়ে আছে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পন্ডিত মনে করেন, প্রবাদের ছয়টি গুণ থাকা আবশ্যক। যেমন সংক্ষিপ্ততা, সরলতা, সাধারণ গুণ, অলঙ্কার, প্রাচীনতা এবং সত্যতা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য অবশ্য মনে করেন, প্রবাদের এই সমস্ত লক্ষণ আনুপূর্বিক গ্রহণ করা যায় না। মোটামুটিভাবে প্রবাদের সংজ্ঞা থেকে আমরা প্রবাদের তিনটি গুণের কথা জানতে পারি। যেমন - সংক্ষিপ্ততা (Brevity), অর্থবহতা (Sensibility) এবং সরসতা (Saltness)। প্রবাদের সরসতাটুকু নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। কখনও কৌতুক, কখনও বাগবৈদগ্ধ্য, কখনও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, কখনও আবার শে-ষ-চাতুর্যের সাহায্যে এই সরসতার সৃষ্টি করা হয়। যেমন - 'কাঁদলে চোখই যায়, শোক যায় না।' অথবা 'যত গর্জে তত বর্ষে না।' অথবা 'বেলা গেছে কেলা তলায়।' আক্ষেপমূলতা প্রবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য - "পরের কাজে কামার ব্যস্ত।" প্রবাদের লোকপ্রিয়তার একটি কারণ হল সরসতা। "যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ ধন্য রাজার পূণ্য দেশ।'' অনেক সময় প্রবাদ দৃষ্টান্তের ভূমিকা নেয়। যেমন - "সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে।" অথবা "নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।"

গঠনগত রূপের দিক থেকে প্রবাদ তিন ধরণের হতে পারে।

ক) অপূর্ণবাক্য বা বাক্যখন্ড (Phrase)

খ) পূর্ণবাক্য (Sentence)

গ) একাধিক বাক্য

প্রথম ধরণের প্রবাদের উদাহরণ — 'ভস্মে ঘি ঢালা',' আদায় কাঁচকলায়' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ধরণের প্রবাদের উদাহরণ — 'পরের কাজে কামার ব্যস্ত' অথবা 'মাঘের শীত বাঘের গায়'।

তৃতীয় ধরণের প্রবাদের উদাহরণ হল — "অমাবস্যার মাথা ভারী/ পূর্ণিমার লেজে ভারী।" অথবা "অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর / অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।"

প্রবাদের দুই রূপ — ক) একটি গদ্যপ্রবাদ ও খ) অন্যটি পদ্যপ্রবাদ।

গদ্যপ্রবাদের চেয়ে পদ্যপ্রবাদের সংখ্যায় অনেক বেশী শুধু তাই নয় অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক। গদ্য প্রবাদের উদাহরণ 'বেল পাকলে কাকের কি?' অথবা 'নেয়ের গরু, বামুনের নাও।'

অতএব এইসব আলোচনা থেকে বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ প্রবচনের গুরুত্ব অপরিসীম। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে প্রবাদের উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজন কিয়ৎ পরিমাণে চিত্ত প্রকর্ষের। চিত্ত প্রকর্ষ যে কেবলমাত্র শিক্ষাদীক্ষার দ্বারাই সম্ভব এমন মনে করা ভুল হবে কেননা সামাজিক জীবনের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সেই প্রভাবকে নিজের জীবনে অঙ্গীকৃত করে চিত্তের প্রকর্ষ সাধিত করা সম্ভব। কোন জাতিকেই কিন্তু অনগ্রসর বলে মনে করা যায় না। তাদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় ঐ জাতিই হয়তো কোন এক সময়ে অগ্রসর ছিল কিন্তু কালের অমোঘ পরিহাসে আজ তার রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। যেমন পশ্চিমবাংলার ডোমম জাতি। মধ্যযুগে তারা শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিল। মধ্যযুগে তারা সমস্ত রাজাদের সৈন্যরূপে দেশরক্ষার দায়িত্ব পালন করত। কিন্তু ইংরেজের আধিপত্যের কারণে ডোম জাতির সামাজিক বিবর্তন ঘটে। সেই ডোম জাতির মধ্যে থেকে এমন কিছু কিছু প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়, যা তাদের প্রতিবেশী তফশিলীভুক্ত জাতির মধ্যে সেই পরিমাণে পাওয়া যায় না। সুতরাং এইরকম বহু অনগ্রসর জাতির প্রাচীন সংস্কারের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় প্রবাদে। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যশালীদের মধ্যে সেই প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, যে জাতির ভাষা সমৃদ্ধ এবং প্রয়োগ কৌশল অতি চমৎকার, তাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী প্রবাদ পাওয়া যায় এবং সেই জাতির সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ অতি সুদৃঢ় হয়। প্রবাদ অলংকৃত ভাষায়, সুক্ষ্ম কৌশলের দ্বারা সৃষ্ট কাজেই প্রবাদ যে কেউ রচনা করতে অক্ষম। এর জন্য বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন।

প্রবাদ প্রধানত অন্তপুরিবাদের প্রাধান্য পায়। স্ত্রী সমাজের মধ্যে উদ্ভূত হয়ে, সকল সমাজেই প্রচার লাভ করে। মেয়েলি ভাষাও প্রবাদে প্রকাশিত হয়। অশিক্ষিত নারীর প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক ভাষার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ক্ষিপ্রতা, প্রবাদের ভাবেও তা বর্তমান। এককথায় প্রবাদের ভাষাই নারীদের মুখের ভাষা, প্রবাদের জীবনদর্শন নারীরই জীবনদর্শন। সুতরাং মননশীলতার অগ্রসর নিরক্ষর নারী সমাজের মধ্যেই ক্ষিপ্র এবং যথাযথভাবে প্রকাশের প্রয়োজনে প্রবাদের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এর বিষয়বস্তু পুরুষের বহির্মুখী কার্যের ক্ষেত্রে কালক্রমে বিস্তার লাভ করেছে।

লোকসাহিত্যের প্রত্যেকটি গানের যেভাবে উদ্ভব ঘটেছে প্রবাদেরও উদ্ভব হয়েছে সেই ভাবেই। যেমন স্ত্রী সমাজের মধ্যে পরস্পরের কথায় এমন একটি বাক্য সহসা বের হয়ে এল, যা সহজে একটি চমক সৃষ্টি করল, সেই চমৎকারিত্বের গুণে এটি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত এবং সকলের মনে গেঁথে গেল। এভাবেই মুখে মুখে সমগ্র সমাজে তা প্রচলিত হয়ে গেল।

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত লোকসাহিত্য ছিল চরম অবহেলিত এবং অবজ্ঞাত। যেন লোকসাহিত্য একান্তভাবে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ বা তথাকথিত ইতর জনেরই ছিল উপভোগ্য বিষয়। ততাকথিত শিক্ষিত মানুষ একে দেখতেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। আজ

কিন্তু সে ধারণা পাল্টেছে এবং লোকসাহিত্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা প্রবাদও জনপ্রিয় হতে পেরেছে।

বর্তমানে প্রবাদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম শোনা গেলেও এর ব্যাপক প্রচলন ও জনপ্রিয়তার শিখরে যে পৌঁছেছিল - একথা সর্বজন স্বীকৃত। প্রবাদের সহজসাধ্যতা সরল প্রকাশভঙ্গী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলো প্রবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘদিনের প্রাত্যহিক, সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতাই প্রবাদে প্রতিফলিত হয়।

বাংলা প্রবাদ লোকজীবন ও মানুষের এক সার্থক ফলশ্রুতি কালে কালে নিত্য নতুন ধারায় তার রূপান্তর। আর এই রূপান্তর এই মানব জাতি গোষ্ঠী, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীকে আবহমান কাল ধরে আবর্তিত সময়ের প্রবাহে ধরে রাখবে, বিকাশের নিত্য নতুন দিক উন্মোচিত করে দেবে। তাই প্রবাদকে বলা যায় জাতির দর্পণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১। বাংলার লোকসাহিত্য (১ম, ৬ষ্ঠ) আশুতোষ ভট্টাচার্য।
২। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস - ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
৩। বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র - ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী।
৪। বাংলা প্রবাদ - ডঃ সুশীল কুমার দে।
৫। বাংলা লোকসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপাদান - ডঃ রবীন্দ্রনাথ শাসমল।

মতুয়া ধর্মীয় মতাদর্শ ঃ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক ঐক্য

গোপাল মন্ডল ও সুদীপ মন্ডল

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতপাতের সমস্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমগ্র পর্যায় জুড়ে দেশের ঐক্য গড়ে তোলার কাজকে কন্টকাকীর্ণ করেছে এই সমস্যা। ঋকবেদের পুরুষসুক্ততে বলা হয়েছে - "ব্রাহ্মনোহস্য মুখমাসীদ, বহু রাজন্যকৃত, উকতদস্যযদ্ বৈশ্যং, পদভ্যং শুদ্রোত্মাজায়ত" অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্ম নিয়েছে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পদযুগল হতে শুদ্র। বর্ণকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করার জন্যই এই স্তোত্রটি ঋকবেদে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। ভারতে আর্যদের আগমনের সময় তাদের মধ্যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল - কর্মভিত্তিক অর্থাৎ কর্মের ভিত্তিতেই বর্ণের পরিচয় নির্দিষ্ট হত। এই কারণেই ঋষি ভৃগুর সন্তানরা রথ নির্মাণ করত। আর অনেক জন্ম সূত্রে হীনবৃত্তি ধারীরাও ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারত। কালক্রমে বর্ণ ব্যবস্থা হয়ে গেল জন্ম ভিত্তিক ও শোষণের হাতিয়ার।

ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায় ইত্যাদি সমস্যাগুলিকে বিচারের মধ্যেই আনেননি আবার জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরাও এই সমস্যাগুলিকে আড়ল করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জাতপাতের সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা কাঁচা ক্ষতের মত চিরকালই রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। যে সমস্ত নিম্নবর্ণের জাতিগোষ্ঠী চিরকাল অবহেলিত অত্যাচারিত হয়েছে জাতীয় আন্দোলনের পর্বে তারা জাতীয় আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, নিজেদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির দাবী জানিয়েছে। সারা ভারতবর্ষে নিম্নশ্রেণীর মানুষের নিজেদের অবস্থা উন্নয়ণের জন্য আন্দোলনের উদাহরণ অনেক। বাংলার ক্ষেত্রে যদিও জাতপাতের সমস্যা কোনদিনই তেমন তীব্র আকার ধারণ করেনি কিন্তু বাংলায় নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের আন্দোলন জাতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উলে-খযোগ্য।

বাংলায় অনুন্নত জাতি সমূহের মধ্যে নমঃশুদ্র সম্প্রদায় ছিল সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় এবং সর্বাপেক্ষা সংগঠিত এই সম্প্রদায়ের নেতা হরিচাঁদ ঠাকুর "মতুয়া ধর্ম" নামে এক অবৈদিক ও সমন্বয়বাদী ধর্মের প্রবর্তন করেন। অধুনা বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দি ছিল এই ধর্মের আদি ক্ষেত্র। কিন্তু স্বাধীনতা ও দেশভাগের কারণে সর্বস্ব হারিয়ে মাতুয়াদের ভারতবর্ষে চলে আসতে হয়। ১৯৪৮ সালে ঠাকুর নগরে এই সম্প্রদায়ের মানুষের ধাম তথা আন্দোলনের কেন্দ্র মাতুয়া মহাসংঘ স্থাপিত হয়। বর্তমান প্রকল্পের ক্ষেত্রে আমরা ঠাকুরনগর স্থাপিত পরিভ্রমণ করে ঠাকুরনগরের অতীত ও বর্তমান সর্বোপরি দলিত আন্দোলন হিসাবে মতুয়া ধর্মের উত্থানের বিষয়ে জানার চেষ্টা করব।

নমঃশুদ্ররা ছিল বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম। আদিতে এরা 'চন্ডাল' নামে পরিচিত ছিল। এদের আদি বাসস্থান ছিল — পূর্ববঙ্গের যশোহর, খুলনা, বরিশাল,

ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুর - এই ছয়টি জেলায়। অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু সমাজে এদের স্থান ছিল দ্বিতীয় - প্রথম স্থানে ছিল মাহিষ্মরা। ১৯০১ সালের জনগণনায় নমঃশুদ্রদের সংখ্যা ছিল ১৮,৪৮,৪৮৩ জন। ১৯৩১ এ তা হয় ২০,৯৪,৯৫৭ জন। পূর্ব বাংলার মোট হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় নমঃশুদ্ররা ছিল ১৯০১ সালে ১৭.৬৬%। ১৯৩১ এ ছিল ১৮.৯৪%। আর উলি-খিত ছয়টি জেলায় তারা ছিল সংখ্যাগুরু। মোট জনসংখ্যার ৭৫% ছিল নমঃশুদ্র। পেশার দিক থেকে তারা ছিল কৃষিজীবী এবং অন্যান্য উৎপাদনের সাথে যুক্ত কিন্তু হিন্দু সমাজে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। শিক্ষা সম্পত্তি, মন্দিরে প্রবেশ, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান প্রভৃতির অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। তারা ছিল উচ্চবর্ণের অত্যাচার ও শোষণের শিকার। এইসব কারণে সামাজিক মর্যাদার অন্বেষণে এই সম্প্রদায়ের বহু মানুষ ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়।

জাতিভেদ ও জাত ব্যবস্থার কারণে উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। তেমনি নমঃশুদ্ররাও আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার আশায় আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। রাঘবগড়ের আম গ্রামের এক অবস্থান্ন গ্রাম্য মোড়লের বাবার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নমঃ মোড়লদের একটি সভা ডাকা হয় এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কাজ বয়কট করার জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর নমঃদের কাছে আহ্বান রাখা হয় এবং বয়কট শুরু হয়। কিছু দিন বয়কট চলার পর দারিদ্রের কারণে এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার সফলাডাঙ্গা গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-৭৮) জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গের নিপীড়িত সম্প্রদায়কে তিনি নতুন জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মধ্যে আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদা বোধের বিকাশ ঘটান। তিনি "মাতুয়া" নামে এক সাম্যবাদী ধর্মের প্রবর্তন ঘটান। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্মের মাধ্যম ছাড়া বৃহৎ মানুষকে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তেমনি সংঘ শক্তি ছাড়া উচ্চশ্রেণীর হাত থেকে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। বাখরগঞ্জের নমঃশুদ্র নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করলেন যে ধর্ম আন্দোলন ব্যতীত মুক্তি সম্ভব নয় তখন তারাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করে।

হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭) 'মতুয়া' আন্দোলন ও মতকদর্শকে জোরদার করে তোলেন। তাঁরা শিক্ষাবিস্তার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণের দিকে নজর দেন। তিনি বলেন – "বাঁচি কিংবা মরি তাতে ক্ষতি নেই, গ্রামে গ্রামে পাঠশালা চাই।" তাঁর উদ্যোগে ৩৯৫২ টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, মেয়েদের ধাত্রীবিদ্যা ও নার্সিং ট্রেনিংও দেওয়া হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতুয়া নেতৃত্ব উচ্চবর্ণ নিয়ন্ত্রিত জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল না। ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের সঙ্গেই সম্প্রীতি বজায় রাখত। পরবর্তীকালে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের (১৯২০-৯০ খ্রীঃ) নেতৃত্বে নমঃশুদ্র আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ঠাকুরনগর গ্রামটি বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁর গাইঘাটা থানার চিকণপাড়া মৌজায় অবস্থিত। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় এই স্থানটি ছিল জলাভূমি ও

বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গুরুচাঁদ ঠাকুরের পৌত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ১৯৪৮ সালে এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। দেশভাগের ফলে মতুয়া অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গের যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা,ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুর এই ছয়টি জেলা পাকিস্তানে চলে যায়। ফলে মতুয়া সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই সময় যেহেতু নমঃশুদ্র আন্দোলনের নেতা যোগেন মন্ডলের সঙ্গে মুসলীম লীগ নেতাদের সম্পর্ক ভাল ছিল তাই যোগেন মন্ডলের নেতৃত্বে নমঃশুদ্র গোষ্ঠীর এক অংশ পাকিস্তানে থেকে যেতে মনস্থ করেন। যোগেন মন্ডল লিয়াকত আলি খাঁর মন্ত্রী সভায় পাকিস্তানের প্রথম আইন মন্ত্রী হন। অন্যদিকে প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের নেতৃত্বে আরেকটি অংশ ভারতে চলে আসতে থাকে।

এই সকল উদ্বাস্তু মানুষদের নিয়েই ঠাকুর নগরের পত্তন ঘটে, পরবর্তী কালে দীর্ঘ সময় ধরে নমঃশুদ্র তথা বিভিন্ন নিম্নবর্ণের মানুষ এই ঠাকুর নগরে বসতি স্থাপন করে। সেই সময় ঠাকুরনগরে কোন রেল ষ্টেশন ছিল না, বনগাঁ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত কয়লার ইঞ্জিনে রেল চলত। ১৯৫২ সালে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও সহপাঠী কৈলাসনাথ কাঠজুর সহায়তায় ঠাকুর নগর রেলষ্টেশন স্থাপন করে। রেল ষ্টেশন স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই গুরুত্ব বদলে যায়। বহু মানুষের আগমনের ফলে এই অঞ্চল ধীরে ধীরে জমজমাট হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীর দিনে এখানে প্রথম মতুয়া মহামেলার সূত্রপাত হয়। তখন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতি বছর শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথিতে ঠাকুরনগরের মেলা হয়ে আসছে। ১৯৪৮ সালে যেখানে অল্প কিছু মানুষ নিয়ে উৎসবের সূচনা হয়েছিল ২০১৬ সালে সেখানে ভক্ত সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে গেছে। বর্তমান সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মতুয়া ধর্ম আন্দোলন বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মত বাংলায় জাতিভেদ প্রথা খুব বেশী কঠোর নয় কিন্তু বিভিন্ন দলিত শ্রেণীর মানুষ উচ্চবর্ণের সামাজিক প্রাধান্যকে স্বীকার না করে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবী তুলে ধরেছে।

মতুয়া মেলা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন নিম্নবর্ণের মানুষের মিলন ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সহ প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও এই ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এই ধর্মের উৎপত্তিস্থল তথা মতুয়াধর্মাবলম্বীদের আদি বাসস্থান বাংলাদেশ। এই মেলাকে কেন্দ্র করে দুই বঙ্গের মধ্যে সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরী হয়েছে। বর্তমান কালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই মেলা ও সংগঠন নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রে এই মতুয়া মহাসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ২০১১ সালের পর থেকে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এঁদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—

১. বিপাণচন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জী ও আদিত্য মুখার্জী — ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০ (প্রথম সংস্করণ) আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা ২০০৬

২. রণবীর সমাদ্দার — ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় সংহতির সমস্যা (প্রথম সংস্করণ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা ১৯৮৫

৩. মনোশান্ত বিশ্বাস — বাংলার মতুয়া আন্দোলন; সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি (প্রথম সংস্করণ), সেতু প্রকাশনী, কোলকাতা ২০১৬

৪. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর — মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুন্নত সমাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ) নিখিল ভারত প্রকাশনী, কোলকাতা ২০১১

৫. কপিলকৃষ্ণ বিশ্বাস — গুরুচাঁদ ও তাঁর অনুগামীদের শিক্ষা আন্দোলন (প্রথম সংস্করণ) নিখিল ভারত প্রকাশনী, ঠাকুরনগর উত্তর চব্বিশ পরগণা ২০০৯।

ভারতীয় শিক্ষার সামাজিক সমস্যা

মধুমিতা দত্ত

শিক্ষা ব্যক্তির সম্ভাবনা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া শিশু অবস্থা থেকে পূর্ণবয়স্ক মানুষ হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে সমাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে শেখায়। এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সমাজের একজন নাগরিক হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্য আত্মীয়করণের মধ্য দিয়ে একজন পূর্ণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব রূপে বিকশিত হয়। অসাম্য বা বৈষম্য কেবল অন্যের ওপর প্রভাব খাটায় যার ফলে অসাম্য বা বৈষম্য দেখা দেয়। এর মধ্য দিয়ে সামাজিক ক্ষমতাগত পার্থক্য সূচিত হয়। এই ক্ষমতাগত পার্থক্যের বিভিন্ন ভিত্তি আছে। যেমন — সম্পত্তিগত, প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোগত, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগত ইত্যাদি।

যে কোন সমাজে আধুনিককালে শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। 'ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের' প্রতিবেদনে শিক্ষার এই দিকটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় শিক্ষাকে এমনভাবে সংঘটিত করতে হবে যাতে তা জাতীয় আদর্শের উপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। কিন্তু সমাজের সকল ব্যক্তি যদি সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে না পারে বা সমাজের মধ্যে যদি কিছু ব্যক্তি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তবে সামাজিক পরিবর্তন বা উন্নতি সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক বিবর্তনের ধারা অনুশীলন করলে দেখা যায়। সমাজের এক শ্রেণির মানুষ সমাজ অগ্রগতির মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এইসব ব্যক্তিরা সমাজের মূল দেহ থেকে জীবনী শক্তি সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে দলগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পিছিয়ে পড়ে। তাদেরকেই বলা হয় 'পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী' বা 'দুর্বল শ্রেণিভুক্ত মানুষ।'

যেহেতু শিক্ষা একপ্রকার সামাজিক সুযোগ সুবিধা সেহেতু পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা এর থেকেও বঞ্চিত হয়। তাই এই শ্রেণীভুক্ত মানুষের শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে কিছু মানুষকে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়। কিন্তু এই জাতীয় শ্রেণীকরণের কোন নির্দিষ্ট মান নেই। তবে ভারতবর্ষে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ বলতে অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা দুর্বল,শিক্ষাগত দিক থেকে যারা অনগ্রসর এবং সামাজিক পরিবর্তনে যারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনা, তারাই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত।

ভারতে বেশিরভাগ মানুষই গরীব ও নিরক্ষর, তবে সব দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত নয়। যারা সাধারণ ভারতীয় মানের তুলনায় অনেক বেশি গরীব, অনেক বেশি সংখ্যায় নিরক্ষর এবং অনেক বেশি পরিমাণে সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত তারাই পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীভুক্ত।

ভারতীয় সংবিধানে নিম্নলিখিত দুটি শ্রেণীর মানুষকে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীভুক্ত বলা

হয়েছে —

ক) তপসিলি জাতি (Scheduled Caste)

খ) তপসিলি উপজাতি (Scheduled Tribe)

পরবর্তীকালে আরও কিছু ভারতীয় গোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং তাদের বলা হয় 'অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ' (Other Backward Class)

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রের সুবিধাভোগের অসাম্য নতুন ঘটনা নয়। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক উপাদান এই অসাম্য সৃষ্টিতে অনুঘটকের কাজ করেছে। শিক্ষাবিদদের ভাবনায় সামাজিক সমস্তরকম সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর ব্যাপকতা বেশী। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে অসাম্য দূরীকরণে বাধা সৃষ্টি করে। প্রাচীন ভারতে এই বৈষম্য প্রাধান্য পেয়েছিল বর্ণভিত্তিক শ্রেণী বিভাগের অপব্যাখ্যার ফলে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির কুফলতা হিসাবে। পরবর্তীকালে ইসলামিক শাসনে শাসক শ্রেণির অসহযোগিতায় সাধারণ মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ব্রিটিশ ভারতে সরকারের উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, সুযোগ সুবিধার সংকীর্ণতা, আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে কৃপণতা এবং সর্বোপরি চুঁইয়ে পড়া নীতির প্রয়োগ শিক্ষাব্যবস্থায় অসম অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় বৈষম্য আঞ্চলিক ও শ্রেণী ভিত্তিতে এখনও বর্তমান। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর জনগণের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমসুযোগের সুফল পাওয়া যায়নি। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছিল সমসুযোগের নীতিকে কার্যকরী করতে হলে অনগ্রসর শ্রেণীর জনগণদের জন্য বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি করতে হবে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, সরকারী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূর না করার কারণ হিসাবে শিক্ষাবিদরা নিম্নলিখিত ভাবনাগুলিকে প্রকাশ করেছেন-

১. স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষাকে সাধারণভাবে রাজ্যগুলির এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল। ওই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারর তার নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা এবং প্রাথমিকতা অনুযায়ী জনগণের জন্য শিক্ষার সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে সর্বভারতীয় স্তরে অসাম্য বজায় রয়েছে, রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এবং বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের মধ্যে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে।

২. ভারতীয় সমাজের গতানুগতিক সংস্কারের প্রভাবে দেশের বহু সংখ্যক মানুষের মনে এখনও সার্বজনীন শিক্ষা বিষয়ে মানসিক দিক থেকে অনীহা বর্তমান। এই সংকীর্ণ মানসিকতা অনেকক্ষেত্রে জনগণের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, এখনও আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ বা বিশেষ শ্রেণিভুক্ত মানুষ নারী শিক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। আর ওই কারণে তারা যথেষ্ট সংখ্যায় মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখান না। ফলে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে শিক্ষার জন্য পুরুষ ও নারীদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

৩. দীর্ঘদিনের অবহেলার ফলে দেশে বহু সংখ্যক নিরক্ষর জনগণ সৃষ্টি হওয়ায় তার পরোক্ষ প্রভাব শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির পথে অনেক ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী অনুদান যতই থাকুক না কেন বা সরকার যতই উৎসাহ দেখাক না কেন, স্থানীয় মানুষের উৎসাহ ছাড়া কোনো অঞ্চলের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা যায় না। ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার তারতম্যের দরুণ শিক্ষা ব্যাপারে স্থানীয় মানুষের তারতম্য ঘটে। তাই বয়স্ক জনগনের নিরক্ষরতা দেশে শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টির পথে অনেক ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার যথাযথ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিশাল দেশে এমন অনেক অঞ্চল আছে, যে সকল স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ফলে এই সকল অঞ্চলের জনগণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে বাধ্য হয়। এই কারণে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের তুলনায় ওই সকল অঞ্চলে শিক্ষারও সুযোগ সুবিধা কম।

৫. ভারতের মত বিশাল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বন্টন থাকা স্বাভাবিক। আর এই প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্য অনুযায়ী, বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দেশে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয় তা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকল অঞ্চলের মানুষকে সমভাবে সহায়তা করতে পারে না। ফলে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মানুষ বা বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে নিয়োজিত মানুষ, এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারে উৎসাহ প্রকাশ করে না। এই কারণেও দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের বৈষম্য দেখা যায়।

৬. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবের জন্য শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব না হওয়ায় দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করা গেছে, ভারতে তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা কম। কারণ, ওই শ্রেণীভুক্ত নাগরিকদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে। তাছাড়া দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে ওই সব অঞ্চলে শিক্ষকতা করার প্রতিও অনীহা লক্ষ্য করা যায়।

৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির যুগেও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে দেশের জনগণের একটা বড় অংশ সেই প্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণে অক্ষম। ফলে গতানুগতিক উপায়ে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদনশীলতা প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি থমকে পড়ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ছে গুরুতরভাবে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারসমূহ আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, লিঙ্গ অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে কোনরকম বৈষম্য করবে না। কিন্তু পাশাপাশি ঐ একই ধারার ৪ নং উপধারায় বলা হয়েছে যে সামাজিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির মানুষের অগ্রগতির জন্য

রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তাদের জন্য নেওয়া ঐ বিশেষ ব্যবস্থা সাম্যের অধিকারের পরিপন্থী হবে না যেহেতু বিশেষ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূর করা। চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমমূহ আলোচনা করতে গিয়ে ৪৬ নং ধারায় সমাজের দুর্বল অংশের মানুষদের, বিশেষত তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষদের শিক্ষা সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষনের প্রশ্নে রাষ্ট্রকে বিশেষ যত্নবান হতে বলা হয়েছে।

সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বিশেষ চিন্তাভাবনার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় সংবিধানের ষোড়শ অংশে। তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ৩৪১ ও ৩৬৬ (২৪) নং ধারা দুটিতে তফসিলি জাতি বলতে কি বোঝায় এবং ৩৪২ ও ৩৬৬ (২৫) নং ধারাতে তফসিলি উপজাতি বলতে কাদের বোঝানো হবে সে কথা বলা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমম তফসিলি জাতি ও উপজাতিগুলিকে চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে।

অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির উন্নতিকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালে কাকা সাহেব ফালেলকার কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে চারটি মানদন্ডের ভিত্তিতে ভারতের ২৩৯৯টি বর্ণের অধিবাসীদের সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর বলে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের অবস্থার উন্নয়ণের জন্য সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়। কমিশন যে চারটি মানদন্ডের ভিত্তিতে অনগ্রসরতা পরিমাপ করার কথা বলে সেগুলি হল — ক) হিন্দু সমাজে জাতপাতের ভিত্তিতে যারা নিম্নস্তরে অবস্থান করে; খ) যে সম্প্রদায় বা জাতের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর; গ) সরকারী চাকরিতে যাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং ঘ) যাদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে যুক্ত মানুষের সংখ্যা কম। প্রতিবেদনটি যথেষ্ট বাস্তবমুখী নয় বলে মনে করে তদানিন্তন কেন্দ্রীয় সরকার তা গ্রহণ করেনি। অবশ্য এক নির্দেশের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যের অবস্থা অনুযায়ী অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকা প্রণয়ন করার অনুমতি দেন। তবে ঐ তালিকা প্রণয়নের সময় জাতপাতের চেয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের কথা বলা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক,, কেরালা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু ও উততরপ্রদেশ — এই ১০টি রাজ্য অনুন্নত সম্প্রদায় চিহ্নিত করার জন্য নিজ নিজ কমিশন নিয়োগ করে, কিন্তু তারা প্রায় সকলেই জাতপাতের ভিত্তিতেই অনগ্রসর সম্প্রদায় গুলিকে চিহ্নিত করে।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা সত্ত্বেও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রকৃত উন্নয়ণ না হওয়ার কারণে সংরক্ষণ ব্যবস্থারই কোন প্রয়োজন নেই বলাটা অসঙ্গত। বরং সংরক্ষণ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করে এর অপব্যবহার বন্ধ করে সংরক্ষণের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে হবে। সংরক্ষণের ফলে সামাজিক বিভাজন যাতে না বাড়ে, সামাজিক বিভেদ যাতে স্থায়ী রূপ না পায়, অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ যাতে পরনির্ভরশীল হয়ে না পড়েন সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। দেখতে হবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা যেন স্থায়ী রূপ না পায়। মনে রাখতে হবে এটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন সাময়িক ব্যবস্থা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক

থেকে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নত ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের সমপর্যায়ভুক্ত করার জন্যই এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা। বলা যায়, সমাজে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যেই এই প্রয়োজনীয় এবং পরিকল্পিত অস্থায়ী অসাম্যের ব্যবস্থা।

তথ্যসূত্র ঃ—

১. শিক্ষার সমাজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি — ডঃ সোনালী চক্রবর্তী।

২. সামাজিক শিক্ষা — ডঃ জয়ন্ত মেটে, ডঃ বিরাজলক্ষ্মী ঘোষ, ডঃ রুমা দেব, রত্না বিশ্বাস।

৩.শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ — ডঃ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী ও মহঃ নিজাইরুল ইসলাম।

৪. ভারতীয় রাজনীতির বিতর্কিত বিষয় — অরুণাভ ঘোষ।

৫. ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা — ডঃ নিমাই প্রামাণিক।

বাংলার চটকল আন্দোলন ও হুগলী জেলা ১৮৫০-১৯৩০

মীনাক্ষী হালদার

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে শিল্পায়ণ শুরু হলেও উপনিবেশিক কাঠামোয় তার গতি ছিল অত্যন্ত ধীর। শিল্পায়নের প্রথম যুগে যে দুটি শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটেছিল তা হল বস্ত্রশিল্প আর পাটশিল্প। বাংলাদেশে বিশেষ করে হুগলী নদীর দুই তীরেই পাটকলগুলি সন্নিবেশিত ছিল। ভারতবর্ষের প্রথম পাটকলটি গড়ে উঠেছিল হুগলী জেলাতেই জর্জ অকল্যান্ডের উদ্যোগে যার নাম ছিল 'রিষড়া ইয়ার্ন মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড'। এই মিল প্রতিষ্ঠায় পুঁজি বিনিয়োগ করেছিলেন একজন বাঙালী বিশ্বম্ভরবাবু। এই মিলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৫ খ্রীঃ। অল্পকিছুদিনের মধ্যেই হুগলী নদীর দুই তীর জুড়ে গড়ে ওঠে অসংখ্য পাটকল। ১৮৮৪-৮৫ সালে মোট ২৪টি চটকল গড়ে ওঠে যার শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫১,৯০২ জন। ১৯১৭ সালের মধ্যে ৭৬টি চটকল গড়ে ওঠে যার শ্রমিক সংখ্যা ছিল ২,৬৬,০৩৮ জন। ১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে মোট ৯৫টি চটকল গড়ে ওঠে যার শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৩,৪৭০০০ জন। এর মধ্যে ৯০টি পাটকলই ছিল বাংলাদেশে। বাংলাদেশের পাটকলগুলির প্রধান কেন্দ্র ছিল হাওড়া, হুগলী, কলকাতা ও ২৪ পরগণা জেলায়।

হুগলী জেলার চটকলগুলির বেশিরভাগই অবস্থিত ছিল শ্রীরামপুর মহকুমায়। ১৮৮২ সালের মধ্যে হুগলী জেলায় মোট ৫টি চটকল গড়ে ওঠে। ১৮৬৬ তে শ্রীরামপুরে ইন্ডিয়া জুট মিল, ১৮৭৩-এ চাঁপদানীতে চাঁপদানী জুটমিল, ১৮৮৮ তে তেলেনিপাড়ায় ভিক্টোরিয়া মিল ও রিষড়ায় হেস্টিংস মিল গড়ে ওঠে।১৮৮২-৮৩ সালে হুগলীর ৪টি ও হাওড়ার ৫টি মিলে মোট ২০,৩২৩ জন শ্রমিক কাজ করতো যার মধ্যে পুরুষ শ্রমিক ছিল ১০,২২৮ জন,নারী শ্রমিক ছিল ৪৬৯৮ জন, শিশু শ্রমিক ১৯২৩ জন। ১৮৮৮-৮৯ সালে এই দুই জেলায় মোট চটকল শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৪,৫২৫ জন। ১৮৯৮ সালের মধ্যে হুগলী জেলায় যে পাঁচটি জুট মিল গড়ে উঠেছে তার শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১৭,৬৮৯ জন। ১৯১১ সালে হুগলী জেলার মোট ৮টি চটকলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৩০,৩৭৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ শ্রমিক ছিল ২১,৬০৯ জন, নারী শ্রমিক ৫৬৩৮ জন এবং শিশু শ্রমিক ৩১২৮ জন। ১৯১২ সালের Industrial Statistics থেকে জানা যায় হুগলী জেলার ৯টি চটকলে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ৪১,৩০০ জন, নারী শ্রমিক ৯৮৭৫ জন , ১৪ বছরের উর্ধ্বে ছেলের সংখ্যা ১৬,৮৭৯ জন, মেয়ের সংখ্যা ৭,১৮০ জন, ১৪ বছরের নীচে বালকের সংখ্যা ১০৫৪ জন এবং বালিকার সংখ্যা ৩০৮ জন।

শ্রমিক নিয়োগ ঃ - চটকলগুলির মালিকানা ছিল ইউরোপীয়দের হাতে। এই ইউরোপীয় মালিকেরা সর্দার নিয়োগ করত। ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্টে সর্দারকে

'The lower subordinate' বলা হয়েছে। অনেক চটকলে সর্দারেরা ফোরম্যান হিসাবেও কাজ করত। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে মালিক সর্দার চুক্তি থাকত। আর এর ফলেই চটকলে সর্দারদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বজায় থাকত। সর্দারেরা আড়কাঠি হয়ে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে শ্রমিক নিয়ে আসত। অনেক সময় এরা নিজের পরিচিত গ্রাম থেকে নিজের চেনাজানা বন্ধু, আত্মীয়জনকেও কারখানায় নিয়োগ করত। ১৯২১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টেও বলা হয় - 'শ্রমিক হিসাবে কারখানায় কাজের জন্য সর্দারেরা গ্রাম থেকে লোক সংগ্রহ করে প্রায়ই তাদেরকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে আসে, একসঙ্গে রাখে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের কোথাও ব্যবস্থা করছে বা আবার বাড়ী পাঠাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং এই সর্দারেরা সাধারণত বিহার, উড়িষ্যা অথবা উত্তরপ্রদেশের লোক এবং তাদের নিয়োগ সীমাবদ্ধ থাকছে তাদেরই গ্রামের দরিদ্র লোকেদের মধ্যে। এই কারণেই বাংলার চটকলগুলিতে এক একটি অঞ্চলের লোকেদের প্রাধান্য দেখা দিত। অনেক সময় সর্দারেরা বস্তি তৈরী করে শ্রমিকদের ভাড়া দিত। শ্রমিকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত সর্দারের অনুগত থাকত ততক্ষণ পর্যন্ত সর্দারদের বাসস্থানে থাকতে পারত। আনুগত্য না পেলে সর্দারেরা শুধুমাত্র বাসস্থান থেকেই উৎখাত করত না, তার নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে কাজ থেকেও ছাটাই করত। তবে সর্দারদের অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়ালে অনেকসময়ই শ্রমিকেরা সর্দার বিরোধী আন্দোলন ও ধর্মঘটে সামিল হত। আবার অনেকসময় কোন কোন মিলে সর্দারেরা শ্রমিক দরদী হিসাবেও ভূমিকা পালন করেছে। আবার কখনও কখনও শ্রমিক আন্দোলন বা ধর্মঘটের সময় শ্রমিকদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আন্দোলনে বা ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। ১৮৯০ পর্যন্ত চটকলগুলিতে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল বেশি কিন্তু নব্বই এর দশকের পর থেকে বহিরাগত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এইসব শ্রমিকের বেশিরভাগ আসত বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। প্রথম দিকে চটকলগুলিতে শ্রমিকদের ১৫/১৬ ঘন্টা কাজ করতে হত। যে মজুরী পেত তা দিয়ে দুবেলার খাবার জুটত না। নারী ও শিশু শ্রমিকদের ওপর চলত অকথ্য অত্যাচার, অবাধ শোষণ ও নির্যাতন। ফ্যাক্টরী আইন থাকলেও মালিকেরা তা মেনে চলত না। আবার প্রাপ্য মজুরী থেকে একাংশ সর্দারকে খুশী রাখার জন্য দিতে হত। শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। অন্ধকার, ভ্যাপসা, অস্বাস্থ্যকর, আলো বাতাসহীন ঘুপচী ঘরে তাদের একসাথে গাদাগাদি করে থাকতে হত। শ্রমিকদের কোনোরকম বীমা বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল না। ফ্যাক্টরী কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় নারী ও শিশু শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা ছিল অবর্ণনীয়। কারখানার তিন চার মাইল দূর থেকে ভোর রাতে নারী ও শিশু শ্রমিকেরা হেঁটে কারখানায় আসত। দিনরাতব্যাপী কাজ করানো হত। এর ফলে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ত, নারী শ্রমিকদের বেতন ছিল খুব কম, যদিও তাদের কাজের বোঝা কম ছিল না। নারী শ্রমিকেরা কাজ করার সময় তাদের শিশুদেরও সঙ্গে নিয়ে আসত। কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার জন্য ঐ সমস্ত শিশুদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ত। শ্রমিকদের ওপর এই অমানবিক শোষণ তাদের নৈতিক জীবনকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

শ্রমিক সংগঠনের সূচনা ও শ্রমিক আন্দোলন (১৮৫০-১৯৩০) ঃ- ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ভারতবর্ষের শিল্পায়ন হয়েছিল আর এই পরিমন্ডল চটকল শ্রমিক আন্দোনকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। এজন্যই প্রথমদিকে শ্রমিকদের একাংশ ছিল আংশিক সময়ের শ্রমিক। তাই তারা সংগঠিত শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। এছাড়া গোড়ার যুগে শ্রমিকদের কৃষক সুলভ মনোভাব, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীর প্রভাব তাদের একটি শ্রেণি হিসাবে গড়ে উঠতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু এসব বাধা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক কাঠামোয় আধুনিক শিল্প বিকাশের প্রায় সূচনা থেকেই শ্রমিকেরা তাদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কখনও কারখানার ম্যানেজার ও সুপারভাইজারের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে কারখানা চত্বরে দাঙ্গা, হাঙ্গামা বা ম্যানেজার সুপারভাইজারদের দৈহিক পীড়নের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে তাদের সচেতনতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে তখন তারা নিজেদের নানারকম দাবী যেমন কাজের ঘন্টা হ্রাস, মজুরী বৃদ্ধি, ধর্মীয় উৎসবে ছুটি, সর্দার ও সুপারভাইজারের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। এমনকি ধর্মঘট আন্দোলনেও সামিল হয়েছে। আরর এইসব প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে বহিরাগতদের কোনরকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই। এই পর্যায়ে শিবপুর, কাঁকিনাড়া, শ্যামনগর, ঘুঘুড়ি, ক্লাইভ, বরানগর, শ্যামমনগর হুগলী, গার্ডেনরীচ প্রভৃতি চটকলগুলিতে শ্রমিকেরা বিভিন্ন দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট সংগঠিত করে। এর মধ্যে উলে-কযোগ্য দুটি ধর্মঘট হয় বজবজ চটকল ও গার্ডেনরীচের হুগলী চটকলে। ১৮৯৫ খ্রীঃ ২রা মে বজবজ চটকলের প্রায় ৭০০০ শ্রমিক সর্দারের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। ৬ সপ্তাহ কাজ বন্ধ থাকে। কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০,০০০ টাকা। শুধু অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া নয়, এই পর্বে শ্রমিকদের সংহতিবোধও লক্ষ্য করার মত। সহকর্মীদের ছাটাই বা নির্যাতনের প্রতিবাদে বা অন্য চটকলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনেও তারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে গার্ডেনরীচের হুগলী চটকলের শ্রমিকরা ২ জন সহকর্মীকে ছাটাইয়ের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে। ১৯০০ খ্রীঃ কাঁকিনাড়া মিল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে চাঁদা সংগ্রহের জন্য কামারহাটি মিলের কয়েকজন শ্রমিকদেরকে বরখাস্ত করলে প্রতিবাদে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ দেখায়।

সুতরাং বলা যায় যে, চটকলে প্রাথমিক পর্যায়ের কোন প্রতিবাদ প্রতিরোধই চিন্তাভাবনাহীন প্রতিবাদ ছিল না। কারণ যে কোন প্রতিবাদ জানানোর জন্য এমনকি একটি মিলের একটি ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকদের একসঙ্গে জড়ো করে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী পেশ করার জন্য ও সংগঠন ও পরিকল্পনা প্রয়োজন। তাই খুব ছোট পরিসরে হলেও শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম যুগ থেকেই সংগঠিত হওয়ার চেতনা বা শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদের চেতনা তৈরী হয়েছিল।

হুগলী জেলাতেও এই পর্বে অনেকগুলি ধর্মঘট হয়। ১৮৭৯ -৮০ তে হুগলীর চাঁপদানী মিলে সিঙ্গাল সিফট প্রথা চালুর বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। ১৮৮১ তে শ্যামনগর মিলে একজন সর্দার ও টাইমকিপারকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে ধর্মঘট হয়। ১৮৯৫ তে চাঁপদানী মিলে মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট হয়।

বিংশ শতকের সূচনায় দেশজোড়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে শ্রমিক প্রতিবাদ, সংঘর্ষ ও ধর্মঘটের নতুন জোয়ার আসে। এই পর্বে আন্দোলনগুলি ছিল স্বাধীন, আবার এই পর্বেই শ্রমিক আন্দোলনে বহিরাগত অর্থাৎ সক্রিয় রাজনীতিবিদদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এই প্রথম জাতীয় আন্দোলনের সাথে শ্রমিক আন্দোলনের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

সার্বিক রাজনৈতিক জাগরণের প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের মধ্যেও একধরণের রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা দেয়। জাতীয় আন্দোলনের কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নেতা যেমন অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জী, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, অপূর্ব কুমার ঘোষ, প্রেমতোষ বোস প্রমুখেরা শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। তাদের সহযোগিতায় অনেকগুলি ইউনিয়ন গড়ে ওঠে ইন্ডিয়ান মিল হ্যান্ডস ইউনিয়ন। শিল্প শ্রমিকদের অংশগ্রহণ জাতীয় আন্দোলনে এক জঙ্গী চরিত্র নিয়ে এসেছিল। এই সময় শ্রমিকরা অনেক বেশি সংগঠিত ছিল। বাংলার ৩৭টি চটকলের মধ্যে ১৮টিতেই শ্রমিক ধর্মঘট হয়। যদিও এই পর্বের ধর্মঘটগুলি হয়েছিল মূলত অর্থনৈতিক দাবীকে কেন্দ্র করে; তথাপি আন্দোলনগুলিতে রাজনৈতিক প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ - এ বঙ্গভঙ্গের দিনে হাওড়ার ফোর্ট গ-স্টার চটকলে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। চটকলের বাঙালী কেরানিবাবুরা মুসলমান শ্রমিকদের হাতে রাখী পরাতে যায় এবং সোচ্চারের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেয় এতে কর্তৃপক্ষ বাধা দিতে গেলে সংঘর্ষ বেধে যায়। কর্তৃপক্ষের জুলুমের প্রতিবাদে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দেয়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের আর্থিক দাবিদাওয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। ৭০০০ শ্রমিকেরা ১৫ দিনের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম অবশেষে জয়লাভ করে। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সমস্ত দাবিদাওয়া মেনে নেয়। এই মিলের দ্বিতীয় ধর্মঘটটি হয় ১৯০৫ এর ৭ই ডিসেম্বর। ম্যানেজার ফরেষ্টার দুজন শ্রমিককে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়ার জন্য পুলিশের হাতে তুলে দিলে প্রতিবাদে শ্রমিকেরা দলবদ্ধভাবে ধর্মঘট করে। এই শ্রমিকদের হয়ে মামলা লড়েন ব্যারিষ্টার অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জী।

হুগলী জেলার চটকলগুলিতেও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব দেখা যায়। ১৯০৫ এর নভেম্বরে রিষড়ার ওয়েলিংটন জুটমিলে ধর্মঘট হয়। শ্রীরামপুরের ইন্ডিয়া জুটমিলে সুপারভাইজারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে একবছরের মধ্যে তিনবার ধর্মঘট হয়। (৩১শে জুলাই ১৯০৬, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৬, ২৯শে জুলাই ১৯০৭)। ১৯০৭ এ রিষড়ার ওয়েলিংটন ও হেস্টিংস মিলেও ধর্মঘট হয়।

এই আন্দোলনগুলির মধ্যে স্বদেশী যুগের মূল স্রোতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অনেক লক্ষণই স্পষ্টত ধরা পড়েছিল। একথা অস্বীকার করা যায় না যে স্বদেশী যুগে চটকল শ্রমিকেরা তাদের আন্দোলনে অসামান্য উদ্যোগ ও সংহতির পরিচয় দিয়েছিল, তবে স্বদেশী যুগে ধর্মঘটগুলি মূলত বাঙালী শ্রমিকদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চটকলে বিরাট সংখ্যক অবাঙালী শ্রমিকদের যুক্ত করার কোন রাজনৈতিক প্রয়াস ছিল না। তাছাড়া এই পর্বের আন্দোলনে অনেক সময় সম্প্রদায়গত চেতনাও অনেক সময় কাজ করেছে। তবে এই সম্প্রদায়গত চেতনা হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকদের মধ্যে কোন স্থায়ী বিভেদ রচনা করতে

পারেনি। এই সময়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দ দেশীয় শিল্পপতিদের ব্যাপারে ছিলেন একেবারে নীরব। তাছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগ্রামী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ তা কাজে লাগাতে পারেননি।

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল পর্বের পর শ্রমিক আন্দোলনে খানিকটা ভাঁটা পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু আন্দোলন একেবারে থেমে থাকেনি। শ্রমিকেরা নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন দাবীতে বিশেষ করে অর্থনৈতিক দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বছরগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করেছিল। যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, মজুরী হ্রাস, শ্রমিক ছাটাই প্রভৃতি শ্রমিকদের জীবনে যে সংকট তৈরী করেছিল তার ফলে মজুরী বৃদ্ধি, বোনাস, খোরাকি ইত্যাদি দাবীতে বারবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তেমনি সমকালীন রাজনৈতিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। ১৯১৯ খ্রীঃ রাওলাট আইনের প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী যে হরতাল বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় তাতে শ্রমিকেরাও অংশগ্রহণ করে। ১০ই এপ্রিল গান্ধীজিকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয় তাতেও শ্রমিকেরা অংশগ্রহণ করে। শ্রমিকদের এই সংগ্রামী মানসিকতাকে লক্ষ্য করেই জাতীয় আন্দোলনের নেতারা জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত করতে এগিয়ে আসেন। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে ১৯২০ খ্রীঃ All Inddia Trade Unionn Congress। অবশ্য সর্বভারতীয় স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠার পরও রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবমুক্ত আপেক্ষিক অর্থে স্বাধীন শ্রমিক প্রতিবাদ ও সক্রিয়তা অব্যাহত ছিল।

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিশের দশকের গোড়ার দিকগুলিতে শ্রমিক সক্রিয়তা ও যৌথ সংগ্রাম নতুন মাত্রা পায়। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের মধ্য থেকেই উদ্যোগ উঠে এসেছে। চটকলের তাঁতী বা স্পিনার অথবা ছাপাখানার কম্পোজিটার বা মেসিন শ্রমিকেরা প্রতিবাদ গড়ে তোলা বা ধর্মঘট চালানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন। কখনও ধর্মঘট চালানোর জন্য প্রতিবাদী শ্রমিকদের মধ্য থেকেই অস্থায়ী adhoc কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৯২০-২৬ এর মধ্যে বহু চটকল ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ১৯২১ এ গড়ে ওঠা 'কাঁকিনাড়া লেবার ইউনিয়ন', ১৯২৫ এ কালিদাস ভট্টটাচার্যের উদ্যোগে গড়ে তোলেন 'ভাটপাড়া লেবার ইউনিয়ন'। ১৯২৫ এ শিবনাথ ব্যানার্জী হাওড়ায় গড়ে তোলেন 'জুট লেবার ইউনিয়ন'। ১৯২৩ এ নৈহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গৌরীপুর ওয়ার্কার্স এমপ-য়ীজ অ্যাসোসিয়েশন'। ১৯২৫ এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন'। পরবর্তীকালে যার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'চটকল মজদুর ইউনিয়ন'।

আবার এই কুড়ির দশকেই মার্কসবাদীরা শ্রমিক ও শ্রমজীবীদের সংগঠনের কাজে নিজেদের যুক্ত করেন। মূলত মার্কসবাদীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্টস পার্টি'। একদিকে শোষণ ও নিপীড়ণ সম্পর্কে শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা ও চেতনা অন্যদিকে কমিউনিস্টদের তৎপরতার ঘাত প্রতিঘাতে কুড়ির দশকের শেষ দু-তিন বছরে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি ও আন্দোলনে বড় রকমের অগ্রগতি ঘটে। ১৯২৮ এ দুটি পর্যায়ে চেঙ্গাইলের লাজলা চটকলে আটমাস ধরে ধর্মঘট হয়। বাউড়িয়া চটকলেও ধর্মঘট হয়। এদিকে সরকার

শ্রমিকদের ক্রমমবর্ধমান সংগ্রামী মনোভাবে বিচলিত হয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ওপর পাঁড়শী আক্রমণ চালাতে শুরু করে। একদিকে জনন নিরাপত্তা আইন ও শিল্পবিরোধ আইন এর মত দমনমূলক আইন পাশ করে আচমকা শ্রমিক আন্দোলনের গোটা র‍্যাডিক্যাল নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করের শুরু করল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯২৯ এর ২০শে মার্চ ৩১ জন কমিউনিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। এই পটভূমিতে শুরু হল চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট ১৯২৯ এর জুলাই আগষ্ট মাসে। এই ধর্মঘটের প্রধান কারণ ছিল শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা ৫৪ থেকে ৬৪ ঘন্টা বৃদ্ধি করা। সরকারী বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৯২৯ এর ২২শে জুলাই থেকে জগদ্দল ভাটপাড়া ও কাঁকিনাড়া অঞ্চলের সমস্ত চটকল, ৫ই আগষ্ট শিয়ালদহ ও বেলেঘাটা অঞ্চলে সমস্ত চটকলে ধর্মঘট শুরু হয়। ১৩ই আগষ্ট ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে হুগলী জেলায়। এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। যার সভাপতি ছিলেন শ্রমিকদের প্রিয় মাতাজী প্রভাবতী দাশগুপ্ত। এছাড়া ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, কালী সেন, আব্দুল মোমিন, আব্দুল রেজ্জাক খাঁ প্রমুখ। মালিকপক্ষের অন্যায় মনোভাবের ফলে ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হয়। ধর্মঘটের নেতাসহ বহু শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলার সাধারণ মানুষ ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। ১০ই আগষ্ট অ্যালবার্ট হলে কলকাতার নাগরিকদের এক সভায় ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হয়। দৃঢ়তার সঙ্গে এই ধর্মঘট চলতে থাকায় শেষ পর্যন্ত সরকার মীমাংসায় আসতে বাধ্য হয়। অকমিউনিষ্টদের শ্রমিক নেতাদের একাংশের সঙ্গে ইন্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাক্টারিং অ্যাসোসিয়েশনের কতগুলি শর্তসাপেক্ষে মীমাংসা হয়। চটকলের প্রথম ধর্মঘট ছিল প্রথম ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত ধর্মঘট।

আদিবাসী বিবাহ বিচিত্রা

অধ্যাপিকা সোমা মাইতি

সূচনা ঃ - "বিবাহ হল এক বা একাধিক পুরুষের সাথে এক বা একাধিক মহিলার সমাজস্বীকৃত মিলন। নানা আচার অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে সেই স্বীকৃতি মেলে। এরই মাধ্যমে মিলিত পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে এবং সেই মিলনজাত সন্তান সন্ততির মধ্যে পারস্পরিক কর্তব্য এবং অধিকারের অন্তর্ভুক্তি ঘটে।"

Dr. Waslermarck বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী বিবাহের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক জীব। তার দৈনন্দিন বা প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ নানা সামাজিক নিয়মকানুন ও রীতিনীতির মধ্য দিয়েই প্রতিপালিত হয়ে থাকে। প্রাণী সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজে পুরুষ ও নারীর মিলন এক অপরিহার্য অমোঘ সত্য, যা ব্যতিক্রম সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষায় কোন পথ নেই। মনুষ্য জীবন চর্যায় এই চিরন্তন জাগতিক সত্যটি সমভাবে কার্যকরী। কিন্তু মানবসমাজে পুরুষ-স্ত্রীর মিলনে রয়েছে বিশেষ বিশেষ স্বতন্ত্রতা যার মধ্যে রয়েছে প্রভূত নিয়ম ও বহু বিধান। বিবাহই একক ভাবে মানবসমাজে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যৌন মিলন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সমাজের এই বিশেষ দিকটিকে সার্থকতায় পর্যবসিত করার জন্যই বোধ হয় বিবাহের আগমন ও সূচনা।

বিবাহ বিষয়ে কয়েকটি মূলকথা ঃ - বিবাহ এই প্রথাটি মানব সমাজে এক অভিনব প্রথা। সাধারণ যৌন মিলনকে অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধন স্ত্রী পুরুষের সম্মিলিত জীবনযাত্রাকে স্থায়িত্বে বরণ করে। বিবাহের নানা বিধি নিয়ম পরবর্তীকালে পারিবারিক জীবনকে দৃঢ়তায় পর্যবসিত করে। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ হল একটি জটিল সাংস্কৃতিক বিষয় যার মধ্যে জীবের জীবনে অত্যাবশ্যক যৌন ক্ষুধার প্রশ্রমনের ব্যবস্থার সাথে সাথে বহুবিধ সামাজিক কার্য করা যেমন গৃহরক্ষা, শিশুপালন, অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

বিবাহ বিধি ঃ - বিবাহের দুটি প্রধান বিধি প্রচলিত তা যেকোন সমাজেরই হোক না কেন, এদের একটির নাম অন্তর্বিবাহ ও অপরটি হল বহির্বিবাহ। অন্তর্বিবাহ প্রথা হল যেকোন পুরুষ বিবাহকালে নিজগোষ্ঠীভুক্ত মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে। যেকোন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতে প্রচলিত ও দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বহির্বিবাহ প্রথাটি হল কোন ব্যক্তি তার নিজ দলের মধ্যে বিবাহ করতে পারবে না। এছাড়াও বিবাহ বিধিতে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ বিধি লক্ষ্যনীয়। অনুলোম হল যখন উচ্চজাত ও উচ্চ বংশ মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ তার অপেক্ষা নিম্ন জাতি ও বংশের মহিলাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে। অপরপক্ষে প্রতিলোম হল যখন কোন নিম্নজাত ও বংশজাত পুরুষ তার অপেক্ষা উচ্চজাত বা বংশের মহিলাকে স্ত্রীরূপে বরণ করে। প্রাচীন ভারতের প্রতিলোম বিবাহ বরনীয় ছিল না যদিও সমাজে এর প্রচলন ছিল।

বিবাহ বিচিত্রা ঃ - প্রতিটি সমাজে বিবাহের নানারূপ নিয়মকানুন রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন,

যা বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সংশি-ষ্ট সমাজের বিধান মেনে চলতে হয়। তেমনি এক সমাজে আদিবাসী সমাজ যেখানে বিবাহের অদ্ভুত রীতি পদ্ধতি আজও অদ্ভুতভাবে প্রয়োগিক সেটি লেখাটির মধ্য দিয়ে আলোচনা হতে চলেছে। প্রথমত, আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে চেঞ্চু আদিবাসীদের কথাই আলোচনা করা যাক মূলত এই আদিবাসী গোষ্ঠী অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে প্রভৃতি রাজ্যগুলিতেই লক্ষ্যনীয়। কালো বাদামী থেকে গাঢ় বর্ণের দেহত্বক, মাঝারি উচ্চতা, কুঞ্চিত চুলবিশিষ্ট এই আদিবাসীদের এক বিবাহ রীতিই প্রচলিত। বিবাহ পদ্ধতি খুব সরল ও সংক্ষিপ্ত। প্রথমে বর তার ভাবী স্ত্রীকে একটি শাড়ি ও ব-াউজ এবং শাশুড়িকে একটি ব-াউজ উপহার হিসাবে প্রদান করে। তারপরই বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হয় ও বর বউ একটি মাদুরের উপর বসে ও তাদের বস্ত্রের প্রান্তভাগ এক সাথে বেঁধে দেওয়া হয়। তখন উপস্থিত সকলে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানায়। চেঞ্চুদের মধ্যে আবার গান্ধর্ব্যমতে বিবাহ বিশেষভাবে প্রচলিত। যুবক যুবতী প্রণয়াবদ্ধ হয়ে বিবাহের অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করে। পরে আবার তারা বাড়িও ফিরে আসে। তবে চেঞ্চুরা মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনদের বিবাহ বিশেষভাবে পছন্দ করে। বিধবা বিবাহ এদের সমাজে প্রচলিত নিয়ম।

বিরহোড় সম্প্রদায় ঃ - বিরহোড় সমাজে সারারাত বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর মা - বাবাই সম্বন্ধ সম্পন্ন করে। সমস্ত কিছু কথাবার্তা তারা স্থির করে। এই বিবাহের নাম হল .....। এই বিবাহে ..... বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে, বিবাহের দিন একটি বাঁশের ঝুড়িতে কনেকে নিয়ে আসা হয়। সমস্ত টান্ডা জুড়ে বিবাহে হৈচৈ শুরু হয়। তিনচার জন মানুষ তাকে বয়ে নিয়ে আসে। বরের বাড়ীর উঠোনে একটি উঁচুবেদীতে দুটি শালপাতা পাশাপাশি রাখা হয়। এর একটিতে কনে পূর্বমুখ করে এবং অপরটিতে বর পশ্চিম মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দুজন মহিলা একটি কাপড় বরকনের মাঝখানে প্রসারিত করে ধরে থাকে। এসময় বর ও কনে তিনবার পরস্পরের দিকে চাল ছুঁড়ে দেয়। এরপর স্থান পরিবর্তন করে নেয় এরা। পরে বর ও কনের হাতে রক্তমাখা একখন্ড করে কাপড় দেওয়া হয় এর নাম সিনাই। দুজনেই সিনাইটিকে মাটিতে স্পর্শ করিয়ে আপন গ্রীবার উপর রাখে। তারপর বর কনের গ্রীবা ও কনে বরের গ্রীবা ঐ বস্ত্রখন্ড দিয়ে স্পর্শ করে। তিনবার এইভাবে করার পর তারা আমপাতার মালাবদল করে বর কনের কপালে সিন্দুর দান করে বিবাহের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এছাড়াও বিরহোড়দের আরো বিচিত্র বিবাহ ধরণ পরিলক্ষিত যেমন নিয়মিত বিবাহের মতই সিন্দুর দানের মাধ্যমে টান্ডায় পানভোজনের মাধ্যমে বিবাহকে বলা হয় নাম-না-পান-কপাল। কখনো কোন যুবক যুবতী পরস্পরকে ভালোবেসে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে স্বামী স্ত্রীর মতো কিছুদিন বাইরে বসবাস করে ফিরে এলে টান্ডায় সবাই একত্রিত হয়ে তাদের বিবাহের স্বীকৃতি প্রদান করলে তার নাম উদরা-উদরী কপাল। এরপর রয়েছে কোন ... যা কিনা বিশেষ একজন যুবককে স্বামী রূপে পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে একজন যুবতী মাথায় একঝুড়ি মহুয়া ফুল বা একবোঝা জ্বালানী কাঠ নিয়ে তার আকাঙ্খিত যুবকের বাড়ীতে জোর করে ঢুকে পড়ে। সমস্ত রকম নিগ্রহ সহ্য করে যদি ঐ যুবতীটি কয়েকটা দিন ঐখানে কাটিয়ে দিতে পারে তাহলেই তাকে ঘরের বৌ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ঠিক বিপরীতে

কোন যুবক যুবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও হঠাৎ করে যদি কপালে সিন্দুর মাখিয়ে পালিয়ে যায় তাহলে তার কাছ থেকে সকলে মিলে জরিমানা ও .... নিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। যে বিবাহের নাম সিন্দুর .....।

টোডা ঃ - টোডাদের বিবাহের যোগাযোগ ছোট বয়স থেকেই হয়ে থাকে। মেয়েদের বয়স সাধারণত ৫-৬ বছর হলেই বৈবাহিক যোগাযোগ শুরু হয়ে যায়। টোডাদের সমাজে বহুপাতমূলক বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত। কয়েকভাই মিলে একজন মহিলাকে বিবাহ করে ও সকলেই মহিলাটিকে সাধারণ স্ত্রী হিসাবে গণ্য করে। কোন একভাই বিবাহ করলে সাধারণ সামাজিক প্রথানুযায়ী তার স্ত্রী দ্রোপদীর ন্যায় অন্যসব ভাইদেরও স্ত্রী পরিগণিত হয়। এই ধরণের বিবাহে স্ত্রীরর ঘর করা নিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। স্ত্রী কিছুদিন অন্তর পালাক্রমে প্রত্যেক স্বামীর সাথে অতিবাহিত করে। তবে এই ধরণের বিবাহে সন্তানের আসল পিতৃত্ব স্থাপনের নিরুপণ খুবই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই লক্ষ্য করা যায় যে স্বামীদের মধ্যে যে পিতা হতে ইচ্ছুক সে তার স্ত্রীর সাতমাস গর্ভাবস্থায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তীরধনুক উপহার দেয়। জঙ্গলের পরিবেশে একটি জ্বলন্ত প্রদীপের সম্মুখে এই তীর ধনুক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। টোডাদের ভাষায় এটি 'পুরুষ্যুৎপুনি।' এই অনুষ্ঠানের পরেই ঐ পুরুষ ঐ সন্ত ানের সামাজিক পিতা হিসাবে পরিচিত হয় ও দায়দায়িত্ব পালন করে থাকে।

টোটো ঃ - টোটোদের সমাজে মূলত দুধরণের বিবাহ প্রচলিত (১) দাবা বেহু আইয়া (২) জিপিয়া বেহু আইয়া। প্রথমটি খুব জাঁকজমক সহকারে সম্পন্ন হলেও অনেকগুলি গরু বলিদান দিয়ে তাদের মাংস ও মদ দিয়ে গ্রামস্থ সকলকে আপ্যায়ণ করা হয় ও দ্বিতীয় বিবাহ পদ্ধতিতে দু-একটি গরু কিংবা শূকর বলি দেওয়া হয়। প্রায় সব বিবাহই অভিভাবকদের দেখাশোনা এবং পরিচালনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়।

গারো ঃ - গারোদের মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত ধরণের বিবাহ প্রথা প্রচলিত যেমন - কোন একজন ব্যক্তি তার খুড়তুতো বোনকে বিবাহ করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে তার কাকার বিধবা স্ত্রীকেও বিবাহ করতে পারে। অনেকসময় বিধবা কাকীমা তার ভাসুরপোকে বিবাহ করতে নারাজ হলে কাকীমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। কোন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রাক্কালে তার প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য। সম্পত্তি যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় সেজন্য এদের সমাজে নোকরন জামাতা বিধবা শাশুড়ীকেও বিবাহ করে থাকে।

মুন্ডা ঃ - মুন্ডাদের ভাষায় বিবাহকে বলা হয় আরান্দি। এদের কাছে বিবাহ হল কেবলমাত্র নারীপুরুষের মিলন নয় দুই পরিবারের মধ্যেও সামগ্রিক মিলন। ছেলেদের ১৮ ও মেয়েদের ১৫-১৬ বছর বয়সের বিবাহ সম্পর্ক হয়ে থাকে।

সাঁওতাল ঃ - এরা আবার বিবাহের নানা ধরণে বিশ্বাসী। যেমন -কিরিং বহু বাপলা — এই বিবাহে ঘটক পাত্রপাত্রীর সন্ধান দিলে অভিভাবকদের আলোচনার পর যোগমাঝি কনের বাড়িতে গিয়ে কথা ফেলে, পরে কনেকে কোলে বসিয়ে একটি হাঁসুলী উপহার দেওয়া হয়। পরে বরকে ধুতি ও কয়েকটি টাকা উপহার দিয়ে সিঁথিতে সিন্দুর প্রদানের মধ্য দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

মিরবোলক বাপলা হল আর এক ধরণের সাঁওতালী বিবাহ। যা কিনা কোন ছেলে মেয়ে

সহজ ও স্বচ্ছন্দ পথে যদি তার মনোনীত ছেলেটি বিবাহ করতে সুযোগ না পায় তবে যে এক ভাঁড় হাঁড়িয়া নিয়ে ঐ ছেলের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং ওখানেই জোর করে থেকে যায়। তাকে ছেলের বাড়ীতে লঙ্কা পুড়িয়ে নাকে দিয়ে শোকানো হয়। যদি সমস্ত বাধা সহ্য করে থাকতে পারে তবে সকলের মধ্যস্ততায় বিবাহ সম্পন্ন হয়। এছাড়াও সাঁওতালদের আরো বিচিত্র বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বিচিত্র এই পৃথিবীর বিচিত্র মানবজাতির বিচিত্র বিবাহ প্রথা সত্যি উলে-খযোগ্য তার দাবি রাখে। মানবজাতির সৃষ্টির ধারাবাহিকতা যেমন বিবাহের মাধ্যমে অগ্রগতির পথে চলেছে তেমনি অনেক সময় এর ভয়ঙ্কর কদর্যময় রূপও বিভীষিকার আকার ধারণ করে জীবনযাত্রার মানকে অন্ধকারময় দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যা আমরা বিবাহ বিচিত্র জীবনযাত্রার মাধ্যমে লক্ষ্য করছি। বর্তমান মানব সভ্যতার উন্নতির সোপান যেখানে আকাশ ছুঁয়ে যেতে চাইছে সেখানে বহুপাতমূলক আদিম সামাজিক অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিবাহব্যবস্থা নারী সমাজকে চিরতরে অবলুপ্তির পথে তরতর করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আলোচ্য বিষয় হল যে, আদিবাসী সমাজে শিক্ষার প্রসার অনেক ক্ষেত্রে এখনো অনেক পিছিয়ে যেখানে অল্পবয়সী মহিলাদের ঋতুমতী হওয়ার অনেক আগেই বিবাহ নামক আইনত যৌনমিলনে বাধ্য করা হচ্ছে, ফলস্বরূপ কত ফুল ফোটার আগেই কুঁড়িতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। অপুষ্টি, অশিক্ষা, দারিদ্রতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি জাতিগত অচিরেই কত নিস্পাপ সহজ সরল নারী প্রাণকে নিমেষে শেষ করে দিয়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, দেশে, রাজ্যে, সমস্ত ক্ষেত্রে নারী পুরুষ অনুপাতে অসাম্যের সৃষ্টি করে এক অন্ধকার ইতিহাস ঘোষণা করে চলেছে। বর্তমান সমাজে মেয়েদের স্থান অনেক এগিয়ে থাকলেও কন্যারা আজো অবহেলিত, নিস্পেষিত ও নিপীড়িত। নারী প্রাণ আজো কত অসহায় শক্তিশালী পৌরষতার কাছে। তাই আজ যতই স্লে-গান চলুক 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'। কিন্তু বেটি তো ভ্রুণেই নিহত। তাই সভ্য সমাজ, আদিবাসী সমাজ যে সমাজই হোক না কেন মানুষ সৃষ্টির ধারাবাহিকতা যদি বিবাহ নামক সামাজিক আইন স্বীকৃত প্রথার মাধ্যমে বজায় থাকে, তাহলে সেই প্রথা থাকুক বিজ্ঞানভিত্তিক, স্বাস্থ্যসম্মত, শিক্ষা, জ্ঞান, চিন্তা, চেতনার আঙ্গিকে নিয়মাবদ্ধ। যেখানে যেকোন সভ্য বা আদিবাসী যাই হোক না কেন যার বিবাহ প্রথাতে থাকবে না কোন নারী বা পুরুষের জীবনে চরম বিপর্যয়ময়তা; থাকবে মনের সমস্ত কোণ থেকে পূর্ণ মানসিক সম্মতি তবেই না সেই বিবাহ প্রথা হবে আদর্শ বৈবাহিক পদ্ধতি বিচিত্রা।

তথ্যসূত্র ঃ —

Dr. R.M. Sarkar, 1997, Kalimata Press, 19/D.H.23 Gayaleagans,Calcutta - 700006.

Bose N.K. - Cultural Anturopology and other essays, Indian Associated publishing co. calcutta 1953.

Boas, F.(Ed.)- General Anturopology D.C. Health & Co. Newyork, 1938.

Brace, C.L. - The stages of Human Evolution, Human and cultural origins, Englewood ....., N.J prentice hall, 1967

Chattopadhay, G-Rajanaa - A village in wwest Bengal Bookland pvt, Ltd. calcuttta, 1964.

Chattopadhay, Kamaladevi Trebalism in India, Vikas publishing house, NewDelhi, 1978.

Social Evolution watts co., 1952.

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারত

পাপিয়া দাস

ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এর আভিধানিক অর্থ হল যা অলৌকিক নয়, লৌকিক, অপার্থিব নয়, পার্থিব; অতীন্দ্রিয় নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ডোনাল্ড স্মিথের মতে সেটিই হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ধর্মাচারণের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে, ধর্মমত নির্বিশেষে ব্যক্তির সাথে একজন নাগরিক হিসাবে ব্যবহার করে, কোনো বিশেষ ধর্মের সাথে যা সাংবিধানিকভাবে সংযুক্ত নয় অথবা যা কোনো ধর্মের উন্নতিবিধান করা বা তাতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে না। গজেন্দ্র গদ্‌করের মতে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য হল আর্থ সামাজিক সমস্যার সমাধানে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের অঙ্গীকার।

জর্জ জেকব হলইয়ক্ সর্বপ্রথম ১৮৫১ সালে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ব্যবহার করেন। ইংরেজি শব্দটি ল্যাটিন 'স্যেকুলাস' থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হল 'বর্তমান যুগ'। অবশ্য ল্যাটিনে এই শব্দটিকে 'পৃথিবী' শব্দটির বিকল্প হিসাবেও ব্যবহার করা হয়েছে। তাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে ধর্মীয় অবস্থানের বিপরীত পার্থিব অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে।

'Secularism' শব্দটি মানুষের জীবন ও সমাজের প্রতি এমন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায় যা আভিধানিক অর্থেই ধর্মবিমুখ এবং জগৎমুখী। 'রিলিজিয়াস' বা ধর্মীয় শব্দটির বিপরীতার্থক হিসাবেই 'Secular' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধর্মহীনতা বা ধর্মের প্রতি উদাসীনতার এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বিশ্বমানবতার উপরে অধিষ্ঠিত। এই ধর্মহীনতার অর্থেই প্রাচীন ভারতের লোকায়ত বা চার্বাকবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। আর এই অর্থেই আঠারো শতকে ইউরোপের জ্ঞানবাদী আন্দোলনের মধ্যে এবং পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানীক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় 'Secularism' বা ধর্মনিরপেক্ষতার পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল।

ধর্মহীনতা বা ধর্মের প্রতি উদাসীনতার এই প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্ম বিষয়ে অন্য দুটি সুপরিচিত রাষ্ট্রীয় নীতি থেকে আলাদা করে বোঝা প্রয়োজন। কারণ ধর্মের প্রতি যে কোনো ধরণের উদার মনোভাবকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলা যায় না।

ধর্মহীনতা বা ধর্মের প্রতি উদাসীনতার প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হলে তবেই রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যেতে পারে। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শুধু যে কোনো রাষ্ট্রধর্ম থাকবে না তাই নয়, উপরোক্ত রাষ্ট্রের সমস্ত নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণে সব রকমের ধর্ম ও ধর্মচিন্তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। আর এই নিরিখেই বিচার করতে হবে যে ভারতীয় সংবিধানে তথা সরকারী নীতি ও কার্যক্রমে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে বা হতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ নীতির কোনো উলে-খ ছিল না।

১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের মুখবন্ধে সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ যুক্ত করা হয়। কিন্তু অনেক আগে রচিত সংবিধানের অন্যান্য ধারায় ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্রনীতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষতা বলা যায় না। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে ধর্মের স্বাধীনতাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ১৫ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে কারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। এ থেকে মনে হতে পারে যে, ভারতীয় রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এ ধারাতেই নিহিত আছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর পরেই আবার ২৫(১) ধারায় ধর্মের প্রতি আরও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছেঃ "সব মানুষেরই নিজ নিজ ধর্ম ঘোষণা, আচরণ এবং প্রচারের সমান অধিকার আছে।" ২৬(১) ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নামাঙ্কিত ধর্ম বা ধর্মগোষ্ঠীর অধিকার আছে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার নিজেদের সমস্ত ধর্মীয় ব্যাপারে নিজেরা ব্যবস্থাপনা করবার, আর ধর্মীয় প্রয়োজনে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা করবার।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় সংবিধানে সব ধর্ম, ধর্মগোষ্ঠী এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি এবং উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। একথা মনে করাও যুক্তিসম্মত যেসব ধর্মের মানুষকেই নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আসক্ত থেকে ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সংবিধানে উৎসাহিত করা হয়েছে। এহেন ধর্মনীতি যে উপরে আলোচিত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত সংজ্ঞার পরিপন্থী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাস্তব প্রয়োগের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই একথা সত্য। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতিবোধের জন্য সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ ধারায় যথেষ্ট ছিল। কারণ ১৪ ধারায় বলা আছে যে সব নাগরিকেরই আইনের সামনে সমান অধিকার আছে। এর সঙ্গে ১৫ ধারা যোগ করলে ধর্মের কারণে বৈষম্যের আর কোনো অবকাশই থাকে না। কিন্তু ওপরে আলোচিত সংবিধানের অন্যান্য ধারাগুলি থেকে স্পষ্টই মনে হয় যে সংবিধানের রচয়িতারা ধর্মকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দিতেই চেয়েছিলেন। সব ধর্মের মানুষই গভীরভাবে ধার্মিক হবে। নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আসক্ত থাকবে। আর তারপর বিধর্মীদের প্রতি সহনশীল হবে, এই ছিল সংবিধান রচয়িতাদের মূল ভাবনা। রাষ্ট্রও জনগণের ধর্মশক্তিকে উৎসাহিত করবে, কিন্তু কোন ধর্মের মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না, এই ছিল সংবিধানভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি।

যে কোন রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক দিক আছে। রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত সত্ত্ব নয়। তার প্রধান উপাদান যেমন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একটি বিশেষ জনসমষ্টি, তেমনি সে জনসমাজে শ্রেণীগত, ধর্মীয় এবং অন্যান্য বিভাজন ও সংঘাত বর্তমান। শাসক শ্রেণির একটি ক্ষুদ্র অংশেই রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাদের নীতি প্রণয়ন এবং রূপায়ণে তাদের শ্রেণী চরিত্র, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির অনিবার্য প্রতিফলন ঘটে থাকে। ভারতীয় সংবিধানেও এমন কিছু মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের দ্বারা প্রণীত হয়েছিল। যারা কিছুটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণপরিষদে আসীন হয়েছিলেন। অতএব শুধুমাত্র সংবিধান বা আইনের পরিচয়ে নয়, শাসক গোষ্ঠীর লোকব্যবহারেও ধর্মাসক্তি এবং

ধর্মীয় পক্ষপাতের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ খোদিত থাকা সত্ত্বেও একাধিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এদেশের রাজনীতিতে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। এদেশে বর্তমানে যে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ছড়িয়ে পড়েছে, তার মধ্যেও কিছুটা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গন্ধ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারী নীতির আড়ালে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ যেন তার শাখা প্রশাখা দ্রুত বিস্তার করে চলেছে। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে রাষ্ট্রীয় তথা ব্যক্তিজীবনে ধর্মহীনতার সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুত করে সব ধর্মকে রাষ্ট্রের তরফে সমান উৎসাহ দেবার নীতি গ্রহণ করলে যে কার্যত সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বলাবাহুল্য রাজনৈতিক নেতাদের সকলেই যে প্রকৃত ধর্মান্ধতা থেকে ধর্মীয় রাজনীতিতে আসক্ত হয়ে থাকেন, তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন মাত্র। দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত, বঞ্চিত, শোষিত জনগণের সামনে নিজ ধর্মীয় ভাবমূর্তি তুলে করতে পারলে লোকসংগ্রহে সুবিধা হবে, লোকযাত্রা অনুধাবন করে ধূর্ত রাজনীতিকেরা অনেক আগেই এ সিদ্ধান্তে এসেছিল। আর সে কারণেই তারা আগে থেকে উচ্চ গ্রামে প্রচারের বন্দোবস্ত করে তারপর পথে ঘাটে ধর্মচারণ করে থাকেন। যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ধার্মিক নন, আর সারাবেলা মিথ্যাচার, কপটতা, জনবঞ্চনা, দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকেন।

অনেকেরই এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষেরই বুঝি কোন না কোন ধর্ম আছে। সে ধর্ম প্রধান প্রধান বড় ধর্মগুলির একটিই হোক বা কোন আদিম অথবা অসংগঠিত ধর্মই হোক। কিন্তু এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (১৯৯৭) পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় ৫৮০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৯০ কোটি মানুষের কোন ধর্ম নেই। অর্থাৎ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়ে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ বিলুপ্ত হওয়ার পরেও রাশিয়ার বহু সংখ্যক মানুষ বংশানুক্রমিক কিংবা অন্যভাবে কোন ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

পারিবারিক সূত্রে কোন না কোন ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে যেসব মানুষ জন্মেছেন, তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সজ্ঞানে ধর্মত্যাগ করেছেন। ১৯৯৫ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পশ্চিম ইউরোপের প্রধানত জন্মগত খ্রিষ্টানদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাসের হার কমে আসছে এবং নাস্তিকদের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্সে ৩৮%, ব্রিটেনে ২২% শতাংশ। পশ্চিম জার্মানীতে ২২%, নেদারল্যান্ডসে ৩৬%, বেলজিয়ামে ৩১%, সুইডেনে ৫৫%, নরওয়েতে ৩৫%,ডেনমার্কে ৩৬%, জাপানে ৩৫% মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। অর্থাৎ তারা ধর্মকে অসার ও অপ্রয়োজনীয় জেনে স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ করেছেন। আর মনে রাখতে হবে যে এসব দেশের অধিকাংশই শিক্ষায় উন্নত, বিজ্ঞানে বিকশিত এবং শিল্প সমৃদ্ধ।

ভারতবর্ষেও প্রাচীন কাল থেকেই কয়েকটি প্রধান দর্শনে এবং ব্যবহারিক লোকযাত্রায় বস্তুবাদী নাস্তিক্য মনোভাব প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাংখ্য,যোগ, ন্যায় - বৈশেষিক, লোকায়ত তথা বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি দর্শন আদিতে বস্তুবাদী ও নাস্তিক দর্শন ছিল। যার মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসের কোন স্থান ছিল না। বিশেষত লোকায়ত দর্শন ছিল বলিষ্ঠ ও আপসহীনভাবে বস্তুবাদী, দেহাত্মবাদী। তাছাড়া আয়ুর্বেদ, নাট্যশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতি জগৎ ও জীবনমুখী ব্যবহারিক দর্শনের মহাগ্রন্থগুলিও ছিল মূলত বস্তুবাদী ও ধর্মহীন। আধুনিক ভারতেও বহুসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত, উন্নতমনা এবং আদর্শবাদী নাস্তিক মানুষ বাস করেন।

অতএব ধর্মবিশ্বাস, ধর্মচর্চা এবং ধর্মপ্রচার যদি মৌলিক মানবিক অধিকার রূপে স্বীকৃতি পায়, তবে একই সঙ্গে যে কোন মানুষের ধর্মহীনতা এবং নাস্তিককতাকেও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার রূপে স্বীকৃতি দেওয়া গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। কারণ নিজের জিন কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো একটি বিশেষ ধর্ম নিয়ে কোন মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় না। মানব শিশুর জ্ঞান হবার আগেই তার মা বাবা, পরিবার এবং সমাজ অবোধ শিশুর উপর নিজেদের ধর্ম চাপিয়ে দেয়। শিশুর অজান্তে এবং তার ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে নিজ পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে তার একটি বিশেষ ধর্ম লাভ হয়। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সেই বিশেষ ধর্মটির সব মৌলিক বিশ্বাস ও তত্ত্ব,ধর্মগ্রন্থ, আচার-ব্যবহার এবং নিত্যকর্ম আত্মস্থ করে নেয়। পরিবার কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া ধর্ম আশৈশব আত্মগত এবং অভ্যাসে পরিণত হবার ফলে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছে এক প্রশ্নাতীত অন্ধবিশ্বাসের রূপ পরিগ্রহ করে।

অন্যভাবে বলা যায় যে ধর্ম মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি মানবজীবনের অন্যান্য অনেক আদর্শের মতোই গ্রহণীয় বা পরিত্যজ্য জ্ঞান বিচারের নিরিখে। আমি সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্রের সমর্থক হতে পারি। আবার পরবর্তীকালে নিজ বিচার বুদ্ধিতে এদের মধ্যে একটি আদর্শকে ত্যাগ করে অন্যটি গ্রহণ করতে পারি, অথবা সবগুলিকেই বর্জন করতে পারি। আমি একটি নূতন নিজস্ব আদর্শও রচনা করতে পারি। কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমার দ্বারা এভাবে কোন একটি বিশেষ আদর্শ বর্জন বা গ্রহণকে সমদৃষ্টিতে দেখবে এবং এর জন্য আমার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ বা অত্যাচার করবে না। ধর্মও প্রকৃতপক্ষে এরকম একটি ব্যক্তিগত আদর্শমাত্র, যা জন্মলব্ধ নয়, পরিবার ও সমাজ কর্তৃক ব্যক্তিমানুষের উপর আশৈশব চাপিয়ে দেওয়া একটি সংস্কার মাত্র। পার্থক্য এই যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আদর্শ গ্রহণে চিন্ত াশক্তি ও জ্ঞানবিচারের অবকাশ আছে। কিন্তু ধর্মমাত্রই শুধু কল্পনা ও অন্ধবিশ্বাসের উপর অধিষ্ঠিত। যেখানে বিচারবুদ্ধির কোন স্থান নেই।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ ঃ—

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ বুঝতে হলে ৩টি স্তরে এর কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন —(১) রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে, (২) সামাজিক বা আচরণগত স্তরে এবং (৩) বৌদ্ধিক বা চেতনার স্তরে।

ইংল্যান্ডে তথা ইউরোপে প্রাচীনকালে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্যাথলিক চার্চের পূর্ণ আধিপত্য কায়েম ছিল। পোপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে যাজকগণ তাঁদের চূড়ান্ত

ক্ষমতার জোরে সাধারণ মানুষের, এমনকি রাজার উপরও নিপীড়ন চালাতেন। তাই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপকে এবং দৈনন্দিন জীবনমাত্রাকে চার্চের ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখতে সাধারণ মানুষ এবং রাজন্যবর্গ উভয়েই সংগ্রাম চালিয়েছিল। ইউরোপে এ কারণে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার জন্য শক্তিশালী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। চার্চের ক্ষমতার বিরুদ্ধে যে শক্তিগুলি সক্রিয় হল সেগুলি 'ধর্মনিরপেক্ষ' নামে পরিচিত হল। যে সকল প্রক্রিয়া ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদের পতন এবং যুক্তিভিত্তিক ও বৈজ্ঞানীক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করল, সেগুলি 'ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া' নামে পরিচিত হল।

অতএব, পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব হয়েছে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসাবে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইউরোপের অনুরূপ কোনো সংগঠিত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নিপীড়নের দৃষ্টান্ত নেই। হিন্দু বা ইসলাম কোন ধর্মেই ব্রাহ্মণ বা উলেমারা চার্চের সংগঠিত যাজকদের মতো জনসাধারণের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পায়নি। তাই প্রাক্ মুসলমান বা মুসলমান আমলে ভারতে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সাথে রাজার বা জনসাধারণের সংঘর্ষের কোন ইতিহাস নেই। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় সমাজে অন্তর্গোষ্ঠী স্তরেও সাধারণভাবে ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহ্য বজায় ছিল।

ঊনবিংশ শতকে ভারতে যে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী মননশীলতা জাগ্রত হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে ধারা আরও বলবান হয়ে ওঠে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রগীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বরণ করে নেওয়া হয়। ভারতের মোটামুটি ৮৫ শতাংশ অধিবাসী হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এদেশে কোন ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি, যদিও পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে বরণ করে নেওয়া হয়। ভারতীয় সংবিধানের ২৫, ২৬ এবং ৩০ নং ধারায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৪,১৫,১৬ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তির ধর্মীয় আনুগত্য নির্বিশেষে তার সাথে নাগরিক হিসাবে বৈষম্যহীন আচরণ করতে বাধ্য। রাষ্ট্র কোন ধর্মের উন্নতি বিধান করবে না অথবা কোন ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবেনা। পরবর্তীকালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংযোজিত হয়েছে।

তবে লুথেরা এবং স্মিথের মতে ভারতীয় রাষ্ট্র কিন্তু কোন কোন ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। সংবিধানের ১৭ নং ধারা অনুসারে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং হরিজনদের জন্য হিন্দু মন্দির সমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া ধর্মীয় বিষয়াদিতে রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্ত ক্ষেপের নিদর্শন। তেমনি আইনে মন্দির সমূহের প্রশাসনের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে ধর্মীয় দানসংক্রান্ত বিভাগ স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক যে সকল আইন এদেশে রচিত হয়েছে সেগুলি ধর্মীয় বিষয়াদিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের নিদর্শন মাত্র। সংবিধানের ৪৮ নং ধারায় রাষ্ট্রকে গোহত্যা নিবারণের জন্য যে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে তা ঠিক ধর্মনিরপেক্ষ নয়। তবে কুপ্পু স্বামীর মতে, খ্রিষ্টানদের চার্চের অনুরূপে হিন্দুদের কোন সংগঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান না থাকায় এবং তারই সাথে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সংস্কার সাধনের ইচ্ছা তীব্র হয়ে ওঠায় রাষ্ট্রকেই এই

দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। কিন্তু স্মিথের মতে হরিজনদের জন্য হিন্দু মন্দির সমূহের দ্বার উন্মুক্ত করা মত সমাজ সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে রাষ্ট্র ধর্মীয় বিষয়াদিতে অসম্পৃক্ত থাকার যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল তা ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে। আবার একদিকে যেখানে রাষ্ট্র হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতির সংস্কার সাধন করে চলেছে, অন্যদিকে সেই রাষ্ট্র এখনও অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু করতে পারেনি। শুধুমাত্র হিন্দুদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনগুলির সংস্কার করেই রাষ্ট্রকে থামতে হয়েছে।

শ্রীনিবাস হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক বা আচরণগত স্তরে যে ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের ফলেই এই ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শহরাঞ্চলের উদ্ভব, স্থানিক সচলতার বৃদ্ধি এবং শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে এই প্রক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ভারতবর্ষের আত্মপ্রকাশের ফলে এই ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছে। শ্রীনিবাসের মতে ভারতে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির তুলনায় হিন্দুরাই এই ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমত, হিন্দুধর্মের মৌলিক ও সর্বব্যাপ্ত শুদ্ধি অশুদ্ধির ধারণা বিভিন্ন কারণে হীনবল হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্মে কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন না থাকায় এই ধর্মের অস্তিত্ব জাত ব্যবস্থা, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এবং গ্রাম সম্প্রদায়ের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপরর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি উলে-খযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে হিন্দু ধর্মের উপর ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার অভিঘাত অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছে।

আধুনিককালে ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার জোয়ারে জীবনচক্র সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলি সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং এই অনুষ্ঠানগুলির সামাজিক দিকটি ধর্মীয় বা আচরণগত দিকের তুলনায় অধিক প্রাধান্য অর্জন করেছে।

হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গোঁড়া অংশ হল ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায়। হিন্দু জীবনযাত্রা প্রণালীর ধর্মনিরপেক্ষকরণের ফলে এবং পাশ্চাত্যয়নের বিস্তৃতির ফলে তারা তাদের সম্মান অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। আধুনিক কালে স্কুল কলেজ সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন হওয়ার ফলে পূর্বে সংস্কৃত ভাষা তথা হিন্দু শাস্ত্রাদির উপর যে একচেটিয়া অদিকার ছিল তা এখন আর নেই। অধুনা অনেক পুরোহিতের জীবনযাত্রা প্রণালীও কিছুটা পাশ্চাত্যায়িত হয়ে গেছে। এদের অনেকেই ইংরেজি শিখে নিয়েছে এবং গর্ব সহকারে তাদের ইংরেজি ও জ্ঞান তারা প্রদর্শন করে। পূর্বে পুরোহিতগণ সাধারণভাবে সমাজ সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাগুলির প্রতি বিরূপ বা উদাসীন ছিল। এখনও সম্মান ও কর্তৃত্বের হানির ফলে ধর্মীয় অথবা সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা কোন উদ্যোগনিতে পারে না। হিন্দুদের যুগোপযোগী পুনর্বিশে-ষণ করার মতো বৌদ্ধিক সামর্থ্য বা সামাজিক অবস্থানও তাদের নেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে পাশ্চাত্যায়িত হিন্দু উচ্চবর্গীয়রা এই পুনর্বিশে-ষণ করেছে। এই উচ্চবর্গীয়গণ সনাতন আচারর বিচারের বিরুদ্ধতা করায় ঐতিহ্যগত প্রথা পদ্ধতিমূহ অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে গণমাধ্যমসমূহের প্রভাবে ঐতিহ্যগত হিন্দু সংস্কৃতির গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু পুরাণ ও মহাকাব্যের বিভিন্ন কাহিনী, সাধুসন্তদের জীবনী ও ধর্ম বা নীতিভিত্তিক নানা কবিতা সংকলিত থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িক পত্র এবং শিশুপাঠ্য পুস্তিকাতেও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণসমূহ থেকে নানা কাহিনী চয়ন করা হয়। আকাশবাণীতে প্রত্যহ সকালে এবং অন্যান্য সময়েও ভক্তিগীতি প্রচারিত হয়। রথযাত্রা বা দশেরার মতো বিখ্যাত ধর্মোৎসবগুলি দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়। হিন্দু মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে নানান চলচ্চিত্রও নির্মিত হয় এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি দূরদর্শনে সম্প্রচারিতও হয়। এই গণতন্ত্রীকরণের ফলে অবশ্য ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অনেকটা পরিবর্তনও ঘটেছে। অধুনা শহরাঞ্চলে অনেক শিশু রামায়ণ মহাভারত না পড়ে দূরদর্শন মারফত রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হচ্ছে।

চেতনাগত বা বৌদ্ধিক স্তরে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি ধর্মহীনতা এবং অসাম্প্রদায়িকতা বা সর্বধর্মসহিষ্ণুতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া পার্থিব জগৎ থেকে ধর্মের ব্যাপক প্রভাব হ্রাস করার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত বলে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সাধারণভাবে ধর্মহীনতাকেই বোঝায়।' ম্যাক্কী বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা হল দৈবী জগতের ধারণা থেকে সরে আসার এবং এই পার্থিব জগতের প্রতি নজর ফেরানোর প্রক্রিয়া। ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে মূলত অসাম্প্রদায়িকতাকে বোঝায়। এখানে এটাই ভাবা হয়েছে যে রাষ্ট্রীয় স্তরের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশে সহায়তা করবে, যে চেতনা ধর্মকে অস্বীকার না করেও বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় বোধের উর্ধ্বে বিরাজ করে।

কোন কোন কঠোর সমালোচকের মতে, চেতনাগত স্তরে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা অর্থে গ্রহণ না করায় ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্তরে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে। যেমন - পুলিন দাসের মতে ভারতের সংবিধানে বিবেকের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত। যে মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা আছে সে তার স্বাধীন বিবেকের প্রণোদনায় নিজের পছন্দসই ধর্মাচরণ, ধর্ম প্রচার ও ধর্মপ্রবর্তন - এগুলির মধ্যে একটি, দুটি বা সবকটি করতে পারে। আবার নাও করতে পারে। সে আবার বিবেকের নির্দেশানুযায়ী নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক হতে পারে, ধর্মীয় মনোভাবের বিরুদ্ধাচারীও হতে পারে। বিবেকের স্বাধীনতার অঙ্গন সদর্থক ও নঞর্থক উভয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই প্রসারিত। বিবেকের স্বাধীনতার ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী বলে এর আওতায় আরও অনেক ধরণের স্বাধীনতা এসে পড়ে। কিন্তু সংবিধানে বিবেকের স্বাধীনতার সাথে যোগ করা হয়েছে অবাধে ধর্মবিশ্বাস জানানো, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচার করার অধিকার। ফলে বিবেকের স্বাধীনতার অধিকারে ব্যাপ্তি পরবর্তী বাক্যবন্ধের অব্যাপ্তির অন্তর্ঘাতে খন্ডিত হয়েছে। ধর্মবোধের মৌলিক আধার হল স্বানুভব। যে পথেই এই অনুভবে পৌঁছান যাক না কেন, তাতে অপরের সাথে সংঘাতের কোনো সম্ভবনা থাকে না। কিন্তু ধর্মাচরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ানির্ভর।

ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা একে অপরের বিপরীত ও বৈরী এবং যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার জন্য ধর্মকে অগ্রাহ্য করা প্রয়োজন এটি অবশ্যই একটি চরমপন্থী অবস্থান। অধিকাংশ চিন্তাবিদ এই ধারণাকে সত্য বলে মনে করেন না। তাঁরা বলেন যে বৈরীভাবমূলক হওয়ার

বদলে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে পারস্পরিক অনন্যতার সম্পর্ক বিদ্যমান। ধর্মনিরপেক্ষকরণের পাশাপাশি ধর্মও বিকশিত হতে পারে মানুষের নৈতিকতার অন্যতম ভিত্তি হিসাবে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মকে পরস্পরবিরোধী বলে বিবেচনা করা সঙ্গত হবে না।

তবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সর্বধর্মসহিষ্ণুতার অর্থে গ্রহণ করলে সেই আদর্শটিও ভারতে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। অমর্ত্য সেনের মতে, যে ধরণের ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতে প্রচলিত আছে তা কেবল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পর অসহিষ্ণুতার প্রবণতাকে সন্তুষ্ট রেখেছে। ধর্মসম্প্রদায়গুলির পরস্পরকে সহ্য করার যে ক্ষমতা রয়েছে তার সমন্বয়ের সমর্থনে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি এখনও দৃঢ় হয়নি। কোন বক্তব্য বা কর্মসূচী যদি বৃহৎ ধর্মসম্প্রদায়গুলির একটিকেও রুষ্ট করে তাহলে তাকে সত্ত্বর নিষিদ্ধ করার জন্য তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারতের যে প্রশংসনীয় অবস্থান, তার সঙ্গে এ বিষয়টি খাপ খায় না।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো অবোধ শিশুর বিচারবুদ্ধি জন্মাবার আগে তার উপর পিতামাতার ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বা আচার বিচার চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক। বিচারবুদ্ধি জন্মাবার বয়স যদি আঠারো ধরা হয়, তবে এ বয়সের আগে কোনো শিশু বা কিশোরের উপর পিতৃপুরুষের ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। অতএব অগণতান্ত্রিক। ১৮ বছর বয়স হওয়ার পর যুবক যুবতীরা নিজেরাই স্থির করবে যে তাদের কোন ধর্মের প্রয়োজন আছে কি না এবং যদি থাকে তবে সেটি কোন ধর্ম। এমনও হতে পারের যে বিজ্ঞান মনস্ক আধুনিক যুবক যুবতীদের অনেকেই কোন ধর্মেরই প্রয়োজন অনুভব করবে না। আর অসহনীয় পারিবারিক, সামাজিক চাপ না থাকলে তারা কোন ধর্মই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে ধর্মীয় অবিশ্বাসের কবল থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা, আর সে উদ্দেশ্য ১৮ বছরের নীচে কোন মানুষের ধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না দেওয়া। আর প্রয়োজনে আইন পাশ করে শিশু ও কিশোরদের উপর ধর্ম আরোপ নিষিদ্ধ করা।

ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যথার্থভাবে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন —

(১) ধর্মপ্রচার, ধর্ম প্রবর্তন প্রভৃতি সংক্রান্ত নাগরিকবর্গের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে রাষ্ট্র সুস্পষ্ট দূরত্ব বজায় রাখবে। কেবলমাত্র যখন জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে তখনই রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপ ঘটবে।

(২) রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার পদাধিকারী (মন্ত্রী, বিচারপতি ইত্যাদি) থেকে শুরু করে সর্বস্তরের কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই আচার আচরণে, কথাবার্তায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রাখবেন। তাঁরা সকলেই দায়িত্বভার গ্রহণের সময় শপথ বাক্য পাঠ করবেন ঐকান্তিক প্রত্যয়ের সঙ্গে, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নয়।

(৩) নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকর্ম ও চিন্তাভাবনা মুক্ত হবে। ধর্মসম্প্রদায় ভিত্তিক প্রার্থী মনোনয়ন বর্জিত হবে।

(৪) সর্বপ্রকার বিদ্যায়তনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিশীল চিন্তাচর্চার প্রবর্তন ঘটাতে হবে।

(৫) এসবের জন্য ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী ঘটাতে হবে। সর্বপ্রকার চেতনা এবং ধর্মীয় আচার আচরণ সংস্কার বিশ্বাস বর্জিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।

পরিশেষে প্রশ্ন জাগে, এ ধরণের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ কোনদিকে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে মূলত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানুষের জাগতিক চেতনায় পরিবর্তন আসে। শুধুমাত্র ব্যক্তি মানুষের তথাকথিত চিত্তশুদ্ধি বা হৃদয়ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চৈতন্যের পরিবর্তন সুদূর পরাহত। মানুষের ব্যক্তিজীবনে অনুশীলন ও সাধনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা মানুষকে তার সমাজকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না। একমাত্র অনুকূল জাগতিক পরিবেশ নির্মিত হলেই মানবজীবনে নবচেতনার উন্মেষ ত্বরান্বিত হতে পারে। কোনও রাষ্ট্র সম্বন্ধেও সেকথা সত্য। বর্তমানের কলুষিত রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকৃত গণতন্ত্র রচিত না হলে এদেশে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের অবসান এবং দ্রুত আর্থিক বিকাশ ও সমবন্টন না হলে প্রকৃত মানবতাবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। সেই সঙ্গে আরো প্রয়োজন ব্যাপক গণশিক্ষার মাধ্যমে জনগণের বিজ্ঞানমনস্কতার দ্রুত বিকাশ। অর্থাৎ প্রকৃত গণতন্ত্র,বৈজ্ঞানীক সমাজতন্ত্র এবং বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এদেশে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাবও বিলম্বিত হবে।

তথ্যসূত্র ঃ—

* কুপ্পুস্বামী, বি.(১৯৯৮), সোশ্যাল চেঞ্জ ইন ইন্ডিয়া, দিল্লী: কোনার্ক পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

* শ্রীনিবাস,এম.এন.(১৯৭২), সোশ্যাল চেঞ্জ ইন ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লী: ওরিয়েন্ট লংম্যান।

* অমর্ত্য সেন, সংকটের মুখে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, অতীশ দাশগুপ্ত কর্তৃক মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত, কলকাতা: নোভাল রিসার্চ সেন্টার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

* বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তানুজ,, (২০০৯), গণতন্ত্র ধর্ম ও রাজনীতি, কলকাতা: মিত্রম্।

* দাস, পুলিন (২০০১), ধর্মনিরপেক্ষতা ও বর্তমান ভারত, কলকাতা : সমাজতত্ত্ব (এ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল স্টাডিজ).

* নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডেশন কোর্স ইন হিউম্যানিটিস্ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স্ এর পাঠ সংকলন, পর্যায় ৫, একক ২২.

* ঘোষ, হিমাংশু (২০১০) ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি; কলকাতা মিত্রম্ ।
* মহাপাত্র, অনাদিকুমার (২০১১), ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, কলকাতা: সুহৃদ।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও অকালি দল

সুকান্ত পাল

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রায় শেষদিকে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দলের পরিচালনায় সর্বভারতব্যাপী সর্বশেষ বৃহত্তম আন্দোলন ছিল এটি। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক দল,বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও সংগঠন এই আন্দোলনের প্রতি তাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পাঞ্জাবের শিখ জাতির ধর্মীয় সংগঠন অকালিদলের ভূমিকা এই আন্দোলনের প্রতি কি রকম ছিল তা দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করা হবে এই প্রবন্ধে।

অকালি দলের প্রেক্ষাপট ঃ— ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে এই ধর্মীয় সংগঠনটি ১৯২০ এর দশকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মতোই ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিষয় "গুরুদুয়ার আন্দোলনকে" ঘিরে এই সংগঠনটির বিবর্তন হয় যা মূলত 'অকালি আন্দোলন' নামে পরিচিত। পাঞ্জাবী শব্দ অকাল থেকে এই শব্দটি এসেছে। 'কাল' অর্থে 'মৃত্যু'। অকাল মানে মৃত্যুহীন। অকালি মানে মৃত্যুহীন একটি বিষয়। বর্তমানে এটি একটি শিখদের রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। "....The word Akali, a term now appropriated by members of the dominant sikh political party."1

শিখ ধর্মের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গুরু, গ্রন্থ এবং গুরুদোয়ারা বা গুরুদোয়ার। এই গুরুদোয়ার ঐতিহ্যগতভাবে ধীরে ধীরে শিখ জাতির ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। গুরুনানক প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা তখন থেকেই চলে আসছিল। কিন্তু বেশ কিছু মহান্তির হাতে পড়ে ধীরে ধীরে গুরুদোয়ার এবং শিখ ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট হতে শুরু করে এবং ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধীনে চলে যায়। তারপর বেশিরভাগ শিখ ধর্মস্থানগুলি বংশ পরম্পরায় মহান্তরা, সরকারের মনোনীত সদস্যরা যেভাবে চালাতে শুরু করেন তাতে শিখ সম্প্রদায় নানা সামাজিক দুর্নীতির মধ্যে ডুবে যেতে শুরু করে। "....most of the sikh shrives had passed into the control of the hereditary Mohantos and the Government nominated managers and custodians and the religious leaders of the Sikh community had fallen prey to a number of social evils."2

এই অবস্থা থেকে শিখ সম্প্রদায়কে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে ছিল নিরংকারী আন্দোলন, নামধারী

আন্দোলন, সিং সভা আন্দোলন প্রভৃতি। বিংশ শতকের প্রথমদিকে অকালিদলের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন উক্ত আন্দোলনগুলির ভিত্তিভূমি থেকে উত্থিত হয় এবং ধীরে ধীরে তা রাজনৈতিক সচেতনতা প্রাপ্ত হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশরূপে চিহ্নিত হয়।

অকালি দলের রাজনৈতিক বিবর্তন ঃ— অকালি দলের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পুরোহিত, মহান্ত, শিখ ধর্মস্থানের বিভিন্ন স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে যেমন ছিল তেমনি তার সাথে সাথেই এই আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও এক প্রবল আন্দোলন ছিল। "The religio -political struggle of the Akali - directed against the priests, Mahantas and other vested interests in the sikh shrines and consequently against the British imperialism - was one of the most powerful movements of modern India".3

এই প্রবল শক্তিশালী আন্দোলনকে কংগ্রেস ও গান্ধী ভীষণভাবে জাতীয় আন্দোলনের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। অকালি আন্দোলন পাঞ্জাবের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তেমনি পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদকেও শক্ত করেছিল। এতদিন পর্যন্ত যারা শিখ সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত নেতা ছিল, বিশেষত মহান্ত এবং ভূম্যাধিকারীরা তাদের অস্বীকার করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ব্যারিষ্টার, উকিল, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত সেনাবিভাগের আধিকারিকরা এর নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। তারা আগের নেতাদের মতো ব্রিটিশের নির্দেশে চলতে আর আগ্রহী ছিলেন না।

অকালি দলের এই নেতৃত্ব গুরুদুয়ার আন্দোলন থেকেই উঠে এসেছিলেন এবং তারা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের সাথে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। অকালি আন্দোলনের সময় থেকেই অকালি-কংগ্রেস পরস্পর সহযোগিতা ও নির্ভরতা শুরু হয় এবং দুই দল পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আসে। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই পারস্পরিক সহযোগিতা এবং জাতীয় আন্দোলনে অকালি দলের অংশগ্রহণ চলতে থাকে। এই ক্ষেত্রে অকালি দলের দুই নেতা বাবা খরক সিং এবং তারপর মাষ্টার তারা সিং এর অবদান যথেষ্ট। "It was mainly due to the Akali congress association during the Akali movement that two leaders come closer to each other and that the sikhs become inextrically involved in congress activities. Actually, the two groups among the sikhs the Akali advocates of purely religious reform and others who looked upon gurdwara, reform only as a part of the larger programme of the country's freedom - remained united till 1939, initially under the leadership of Baba Kharak Singh and later that of Master Tara Singh.4

এক শক্তিশালী ও পারস্পরিক সহযোগিতায় সম্পর্ক অকালি দল ও কংগ্রেসের মধ্যে স্থাপিত হয়। এর ফলে গুরুদুয়ার আন্দোলনের মতো আঞ্চলিক বিষয়ে সমর্থন ও সহযোগিতা করে কংগ্রেস যেমন তার সংগঠন বিস্তৃত করেছিল তেমনি অকালি দলও পাঞ্জাবের জনগণ ও জাতীয় আন্দোলনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সামিল হয়ে জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী ও বেগবতী করে তুলেছিল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রসঙ্গে অকালি দল ঃ— অকালি দল ও পাঞ্জাবের জনগণের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে উঠেছিল তা কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় নি। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অকালি দল এবং পাঞ্জাবের সচেতন মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং তাতে অংশগ্রহণও ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয় তখন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ভিত্তিক দলের মধ্যে নানান দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। কমিউনিষ্টরা যেমন এই সময় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল, আন্দোলনে সম্পূর্ণ অনীহা দেখিয়েছিল তেমনি মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও বিরোধিতা এবং ব্রিটিশকে সহযোগিতা করেছিল। অকালি দলও কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা প্রশ্নহীনভাবে এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি।

তবুও অকালি দলের একাংশ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে তীব্র সংগ্রামের জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আরেক অংশ বিরোধিতা না করলেও সামান্য আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নিজেদের জাতীয়তাবাদের তকমাটা ঠিকঠাক রাখতে চেয়েছিলেন। অন্য অংশে মাষ্টার তারা সিং-এর নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী এই সময় ব্রিটিশ সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার কথা বলেছিলেন। মাষ্টার তারা সিংয়ের বক্তব্যের সাথে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্যের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায় - 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে সমর্থন অসমর্থনের বিষয়কে কেন্দ্র করে।

যাইহোক, তবুও বেশ কিছু শিখ এবং অকালি নেতা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এঁদের মধ্যে উলে-খযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন জলন্ধর জেলার লাসারা গ্রামের সর্দার দুলা সিং এর পুত্র লাভ সিং সইনি। ১৯২১ সালে গুরুদোয়ার সংস্কার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীকালে রাজনীতির সাথেও যুক্ত হন এবং ১৯২৪ সালে কারারুদ্ধ হন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা এবং নেতৃত্বদানের জন্যও তিনি ব্রিটিশের কোপানলে পড়েন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৭ এর ৯ই মার্চ তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি ছিলেন। ৫

এছাড়া জ্ঞানী গুরমুখ সিংও ছিলেন একজন বিশিষ্ট অকালি নেতা এবং জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী। তার পুরো নাম ছিল জ্ঞানী গুরমমুখ সিং মুসাফির। তিনি পাঞ্জাবের দশম মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন ১৯৬৬ সালে। অন্যান্য নেতাদের মতো তিনিও ১৯২০ দশকে জাতীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন।

ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে তিনি ১৯২০

থেকে ১৯৪৭ এর মধ্যে অনেকবারই কারাবরণ করতে বাধ্য হন। আইন অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত করান এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে জেলে যেতে বাধ্য হন। ভারত স্বাধীন হবার পর তিনি লোকসভার সদস্য হন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন, পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও হন। এছাড়া তিনি লাভ সিং এর মতোই পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীও হন। ১৯৭৬ এ তার মৃত্যুর পর তাকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ পুরষ্কারে ভারত সরকার তাকে সম্মানিত করে।৬

ভারতের দ্বাদশতম প্রধানমন্ত্রী আই.কে.গুজরাল ও জাতীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং যথারীতি ব্রিটিশের কোপানলে পড়ে কারাবরণ করতে বাধ্য হন।৭

আমাদের উপরের আলোচনা একথা প্রমাণ করে না যে, অকারি দলের সবাই এবং সব পাঞ্জাবী জনগণই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। আসলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা নিয়ে অকালি দলের এক প্রবল দ্বিধা ও জড়তা দেখা দেয় এবং এই প্রশ্নে অকালি দল চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে দেখা যায় যে, অকালি দল একদিকে যেমন জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করছে তেমনি অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারকেও সহযোগিতা করছে। এই দোলাচল থেকে মুক্তির জন্য অকালি দল একটি সম্মেলন আহ্বান করে ১৯৪২ এর ২৬শে এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর লায়ারপুর জেলার ভাহিলা গ্রামে। এই সম্মেলনে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল অনেক আলাপ আলোচনার পর। এই সিদ্ধান্ত যখন অকালি দলের চারটি গোষ্ঠীর গোচরে আনা হলো তখন একদল চাইল পূর্ণ জাতীয়তাবাদের পথে হাঁটতে, আরেক দল চাইল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবীদের অবস্থান ঠিক রেখে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে, আরেক দল চাইল পাঞ্জাবের সরকারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে। ফলে সেই দোলাচল অবস্থাই বজায় রইল। এইভাবে দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে শিখদের সমর্থন ছিল সবসময় ছিল দোলায়মান। "So the reaction of the sikhs was much tilting as they were not certain enough as to which side would have been more beneficial for them."8

পরিশেষে বলা যায়, শিখজাতি বা অকালি দল দুদিকেই তাদের সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়েছিল। কোন এক রৈখিক চিত্র অকালি দল বাা পাঞ্জাবীদের কাছ থেকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ছিল না। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অকালি দল যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছিল ১৯২৫ সালের পর শিরোমণি অকালি দলের আন্দোলনকে জাতীয় রাজনীতির মূলস্রোতের সাথে যুক্ত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা বিফল হয়নি। কংগ্রেস পাঞ্জাবে পরবর্তী কালে এই দলের হাত ধরেই জাতীয় রাজনীতির বিস্তার ঘটাতে পেরেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সূত্র নির্দেশ ঃ—

1. www.Sikh wiki.org./index.pup/Akali.
2. Mohinder Singh, The Akali Movement, Delhi 2008, P-6.
3. Ibid, P- 75.
4. Ibid, P- 77.
5. In wikipedia. org/wiki/ Labh - singh - saini.
6. In wikipedia. org/wiki/gaini.
7. In wikipedia. org/wiki/ I.K.Gujral.
8. www. Indianetzone.com > thome > Reference > History of India > Indian Freedom struggle > Quit India Movement.

মধ্যযুগে নদিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা

অধ্যাপক কাজল কুমার বাগ

ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে নদিয়ার নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। প্রাচীন শিক্ষাধারার শেষ পর্যায়ে হিন্দু শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে নদিয়া জেলার নবদ্বীপ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। বাংলার সেন রাজাদের সময় আনুমানিক ১০৬৩ খ্রীঃ নদিয়া নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা লক্ষণ সেন নবদ্বীপেই রাজধানী স্থাপন করেন। ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত এই নবদ্বীপ। আঞ্চলিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং নতুন জনসমাগমে নবদ্বীপের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ১১০৬ খ্রীঃ দিকে নবদ্বীপের শিক্ষাকেন্দ্র রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাবে খুবই সুখ্যাতি লাভ করেছিল। লক্ষন সেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হলায়ুধ। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছিলেন - স্মৃতি সর্বস্ব, মীমাংসা সর্বস্ব এবং ন্যায় সর্বস্ব, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ধয়ীর 'পবনদূত', উমাপতির 'কবিতা', শূলপাণির 'স্মৃতি বিবেক' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় খুবই উলে-খযোগ্য অবদান ছিল।

১১৯৭ খ্রীঃ বখতিয়ার খলজির আক্রমণের পর ক্রমশ নদিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে মুসলিম শাসকবর্গ, মুসলমান শাসনকালেও নদিয়ার খ্যাতি এতটুকু মলিন হয়নি বরং উজ্জ্বল হয়েছিল। কেননা মুসলমান রাজা হুসেন শাহ ছিলেন অসাধারণ পন্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি সত্যিকারের জ্ঞানের কদর বুঝতেন। তাঁর ছিল সমদর্শী ধর্মীয় মনোভাব। নদিয়ার অসামান্য উন্নতি হয়েছিল মুসলমান সম্রাটদের আমলে। এই সময়টি ছিল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার অন্তিমকাল। তাই নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা পতনের পর নবদ্বীপের শিক্ষার গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবে আরো বেড়ে যায়।

মধ্যযুগে মিথিলার নিদারুণ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবং নব্য ন্যায়ের কেন্দ্ররূপে এই সময় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। মিথিলার পন্ডিতগণ কোন পুঁথি বা টীকা লিখে নিয়ে অন্যত্র যেতে দিতেন না, কারণ তারা চেষ্টা করতেন মিথিলার বাইরে যাতে কোন নব্যন্যায়ের কেন্দ্র গড়ে না ওঠে। মিথিলার বাইরে নব্য ন্যায়ের শিক্ষা দেওয়া হত না বলে সকলকে এখানে এসে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে হতো, নবদ্বীপের বিখ্যাত পন্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলার বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের কাছে নব্যন্যায়ের পাঠ সমাপ্ত করেন এবং নব্যন্যায়ের সমস্ত বস্তু স্মৃতিতে ধারণ করে নবদ্বীপে ফিরে আসেন। তিনি নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন নব্যন্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্র। তত্ত্বচূড়ামণি, কুসুমাঞ্জলির মতো মহাসম্পদ তিনি নদিয়ায় বহন করে এনেছিলেন। স্মৃতিতে শাস্ত্রমন্ত্র ধরে নিয়ে এইভাবে প্রত্যাবর্তন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিরই যুগ যুগ সাধনার অভিব্যক্তি। পরবর্তী পর্যায়ে নদিয়ার অন্যতম পন্ডিত রঘুনাথ তর্কযুদ্ধে মিথিলার পন্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত করেন এবং নবদ্বীপকে নব্যন্যায়ের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত করেছিলেন।

নবদ্বীপের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল গবেষণামূলক। যে শিক্ষক সূক্ষবুদ্ধি বিচার বিশে-ষণের মাধ্যমে বিদ্বান সভায় বিপক্ষকে পরাস্ত করতে পারতেন তিনি উৎকৃষ্ট শিক্ষক হিসাবে গণ্য

হতেন। এইরূপ গুণ ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হত বিষয়বস্তুর উপর অগাধ পান্ডিত্য এবং মৌলিক চিন্তাধারার ক্ষমতা। নবদ্বীপের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এইরূপ দক্ষতা লাভ করে তৎকালীন ভারতে গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নদিয়ার শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় এক একজন অসাধারণ পন্ডিতের জ্ঞানভান্ডার ও তর্কযুদ্ধের ক্ষমতাই ছিল শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক, তার ভিত্তিতেই এখানকার অধ্যাপনা করার যোগ্যতা নির্ধারিত হতো।

নদিয়ার এই বিরাট শিক্ষাপীঠ-এ আমরা বিভিন্ন সময়ে যে সকল অসাধারণ পন্ডিতদের নাম পাই তাঁদের মধ্যে মথুরানাথ, রামভদ্র, জয়নারায়ণ, ন্যায় পঞ্চানন, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য, হরিনাম তর্ক সিদ্ধান্ত, রাম নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন, বুনোরামনাথ, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, শঙ্কর তর্ক-বাগীশ, শিবনাথ বাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়ামণি, দন্তি, শ্রীরাম শিরোমণি প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। শিক্ষা - বিজ্ঞান যুক্তিবিদ্যা তন্ত্র স্মৃতি ব্যাকরণ ন্যায় জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপন্ডিত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই সকল অসাধারণ পন্ডিতবর্গ নবদ্বীপ তথা নদিয়ার ভারতের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানপীঠ হিসাবে দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন, যার ধারা বাহিত হয়ে এসেছিল উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে। এখানে এই সময়ে চার হাজার শিক্ষার্থী ও ছয়শত মহামান্য পন্ডিত ছিলেন বলে জানা যায়। নদিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মূলত তিনটি প্রধান কেন্দ্র। যেমন - নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও গোপালপাড়া। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে গিয়েছিল বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি এলাকার সুদূর গ্রামাঞ্চলে।

ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাগুরুর অধীনে নদিয়ার সর্বত্র গড়ে উঠেছিল টোল বা চতুষ্পাঠী, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষা পঠন-পাঠনের জন্য টোল পিছু একশ টাকা করে বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন। অধ্যাপকগণ বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রাযশ্চিত্ত প্রভৃতি থেকে নানা দান পেতেন। স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিরা টোলের জন্য অর্থ সাহায্য করতেন। শিক্ষার্থীরা টোলে থেকেই পড়াশোনা করতে পারত, তার জন্য তাদের কোন অর্থ দিতে হত না। তখনকার টোলে বিশেষত ন্যায়ের চর্চা হলেও ব্যাকরণ ও স্মৃতির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলত, বেদ-বেদাঙ্গ ষড়দর্শন শিক্ষাও দেওয়া হতো।

জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নানা আলোচনা,পন্ডিত সম্মেলন তর্কযুদ্ধ প্রায়ই অনুষ্ঠিত হতো। ব্যাকরণের নানা কূট কাচালি। স্মৃতির নানারকম প্রশ্ন নিয়ে নানা ব্যাখ্যা ও আলোচনা হতো। প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করাই ছিল শিক্ষার্থীদের কাজ, শিক্ষার্থীদের বয়সের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। এই সময়কার টোলগুলি ছিল বাঁশের বেড়ায় তৈরি। পাশেই মাটির দেওয়াল দেওয়া শিক্ষার্থীদের আবাস ছিল। এক একটি টোলে পঁচিশ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে পারত। বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় ছাত্ররা কিছুদিনের জন্য পাঠে বিরতি দিয়ে ভিক্ষায় বেড়িয়ে পড়ত। উৎসব উপলক্ষ্যে যেসব তীর্থযাত্রী আসত তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু সাহায্য পাওয়া যেত এবং তাতে বেশ কিছুদিন শিক্ষার খরচ চলে যেত।

নবদ্বীপের মায়াপুরে আরেক বিস্ময় বালক ১৪৮৬ খ্রীঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে এই লেখনীতে কিছু না লিখলে অপূর্ণতা থেকে যায়। তিনি ভারত

তথা বিশ্বের দরবারে তাঁর দর্শন তুলে ধরেছেন। তিনি হলেন শ্রীচৈতন্যদেব, এখানকার সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই নিমাই বড় হতে থাকে। চঞ্চল অস্থির শিশু কারও কথা শোনে না। লেখাপড়ায় তার একটুও মন নেই। সারাদিন খেলা করে আর নেচে বেড়ায়।

পাঁচ বছরে নিমাইয়ের হাতেখড়ি হয়। হাতে খড়ির পর দেখা গেল বালকের মেধা ও প্রতিভা দুই বিস্ময়কর, বিদ্যালয়ের পাঠ অনায়াসেই সে আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু নিমাই যত বড় হতে লাগল ক্রমশ দুরন্তত বালকে পরিণত হলেন। তাঁর অত্যাচার ও দুষ্টুমিতে নবদ্বীপের সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কলাবাগান থেকে কলা চুরি করা, কখনও বা গঙ্গারজল তোলপাড় করে সাঁতার কাটা আবার গঙ্গাস্নানরত ব্রাহ্মণদের চাদর জলে ভিজিয়ে দেওয়া। কখনো বা সেগুলি অন্যত্র লুকিয়ে রাখা। নৈবেদ্যর ফলমূল খেয়ে পালিয়ে যাওয়া আবার কখনো কোন ব্রাহ্মণের শিবলিঙ্গ চুরি করা। এমনি আরও অনেক দুষ্টুমি করে বেড়াত নদিয়ার নিমাই।

বাবা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী বাধ্য হয়ে নিমাইকে গঙ্গাদাস পন্ডিতের টোলে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়ে দেন, গঙ্গাদাস, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সুদর্শন এই তিন পন্ডিতের চতুষ্পাঠীর পড়া শেষ করেন আঠারো বছর বয়সে। অসাধারণ তাঁর প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা। নানা কূট প্রশ্ন তুলে লোক বিব্রত করা। অপদস্ত করে রঙ্গ দেখা এখন তার বিলাস। নবদ্বীপের নবীন ও প্রবীণ পন্ডিতগণ তাঁর ভয়ে ভীত, সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলেন।

নবদ্বীপ শহরে মুকুন্দ সঞ্জয় নামে একজন বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাড়ির চন্ডীমন্ডপে নিমাই টোল খুলে অধ্যাপনা করতে বসলেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ও পান্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হতে লাগল। দূর দূর থেকে ছাত্ররা নিমাই পন্ডিতের টোলে আসতে লাগল। অচিরে নিমাই ধনী ও প্রতিপত্তিশালী নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ গণ্যমান্য হয়ে উঠলেন। তিনি আর সেই পরিহাস প্রিয় চঞ্চল যুবক নন, রাতারাতি হয়ে উঠেছেন গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি। এরপর তাঁর মধ্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়, তাঁর মধ্যে জন্ম হল কৃষ্ণ অনুরাগী এক প্রেমিক সাধকের। অহংকারী পন্ডিত নিমাই হলেন কৃষ্ণসাধক। কৃষ্ণ নাম করতে করতে তিনি কাঁদেন, কখনও বা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। নিমাইয়ের ভগবদভক্তি ও মধুর নাম গান হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মন জয় করে নেয়।

"চন্ডাল ও যদি হরি ভক্ত হয় তাহলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ হতে পারেন।" শ্রী চৈতন্যদেবের এই মহাবাণী উচ্চারিত হয়েছিল নবদ্বীপের ভূমি থেকেই। তিনি সকল মানুষের জন্য যেয মহানাম প্রচার কররে গেছেন তা হল —

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম,, রাম রাম হরে হরে।"

ফলে নদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ধারাতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ইসলাম সংস্কৃতির এক সমন্বয়ী ধারার পথ খুলে দিয়েছিল। ইংরেজ শাসনাধীন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নদিয়ার গৌরব হ্রাস পায়। কিন্তু বহু ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে নবদ্বীপ আজও প্রাচীন শিক্ষার ধারা বহন করে চলেছে। তাই নবদ্বীপের টোল বা চতুষ্পাঠী ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার দৃষ্টান্ত

বর্তমানেও অক্ষুন্ন আছে। এগুলি বর্তমান সরকারী অনাদারে পরিচালিত হচ্ছে। তবে নবদ্বীপে বা নদিয়ার শিক্ষাধারা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বহুস্থানে আজও ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত। প্রসঙ্গত ভাটপাড়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকার সারস্বত সমাজ, বরিশাল জেলার আশুতোষ চতুষ্পাঠী, কবীন্দ্র কলেজ ধর্মরক্ষিনী সভা (বরিশাল) ইত্যাদি চতুষ্পাঠীর নাম বর্তমানে বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য।

ঐতিহাসিক নদিয়া

গোপাল দে

নদিয়ার ইতিহাস খুব আকর্ষনীয়। প্রথমে এই জেলাটির নাম নদিয়া ছিল না। ৯টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত এই ভূখন্ডের নাম ছিল নবদ্বীপ। আবার কারো কারো মতে প্রদীপ বা দিয়া থেকে এ নাম এসেছে বলে ধরে নেওয়া হয়। আরো চিত্তাকর্ষক এই যে, স্বাধীনতার পর ভুলবশত এই জেলাটি তিনদিন পাকিস্তানের অংশ রূপে বিবেচিত হয়েছিল। এই জেলার পূর্বদিকে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। এছাড়া এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ভাগিরথী, চূর্ণী, মাথাভাঙা মতো নদনদীগুলি। এছাড়া এই জেলার কিংবদন্তী রাজারূপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম প্রচলিত আছে।

এই জেলার অন্যতম শহর কল্যাণী। এখানে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। এই শহরটির প্রাণপুরুষ তথা প্রতিষ্ঠিত হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এখানে ঘোষপাড়া রেলষ্টেশনের কাছে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অবস্থান। এখানে প্রচুর বাউল সম্প্রদায়ের লোকেরা উপস্থিত হয়ে দোল উৎসবের সময় মেলাকে কেন্দ্র করে। এছাড়া রয়েছে সতীমার প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে সতীমার অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এরই কাছাকাছি হরিণঘাটা অবস্থিত। এখানে ভারতের সবচেয়ে বড় দুগ্ধাগার অবস্থিত। এছাড়া এখানে একটি মহাবিদ্যালয় ও একটি কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এর উপর দিয়ে প্রবাহিত যাওয়ার কাহিনী আছে।

কলকাতা থেকে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে বহরমপুরের পথে ১৭২ কিমি উত্তরে পলাশি। ১৭৫৭ সালে ২৩শে জুন লর্ড ক্লাইভের সাথে মীরজাফরের গোপন আঁতাতের ফলে পলাশির ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌলা পরাজয় বরণ করেন। ব্রিটিশের তৈরি "ব্যাটেল ফিল্ড অফ পলাশি" নামে ১৫ মিটার উঁচু বিজয় তোরণটি নির্বাক মুখে বহন করে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার সেই কাহিনী। রানি ভবানী আমবাগানটি যেখানে ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়েছিল,তা আজ আর নেই। শেষ আমগাছটি শুকানো গুঁড়ি ১৮৭৯ সালে পলাশির বিজয় স্মারক হিসাবে ইংরেজরা বিলাতে নিয়ে যায়।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব মায়াপুরে। আবির্ভাব স্থলে মন্দির গড়ে উঠেছিল। মায়াপুরের মূল আকর্ষণ ইসকনের তৈরি চন্দ্রোদয়মন্দির। এছাড়া শ্রীবাসঅঙ্গন, অদ্বৈতভবন, শ্যামকুন্ড়ু, শ্রীচৈতন্য মঠ উলে-খযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন দোলপূর্ণিমায় মায়াপুরে উৎসবে রূপ নেয়। মায়াপুরের কাছে বামুনপুকুরে চাঁদকাজীর সমাধিপীঠ। এর দেড় কিমি দূরে বাজারের পিছনে বল-াল সেনের ৪০০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট চওড়া বল-াল ঢিপি। খননকার্যের ফলে এখানে রাজপ্রাসাদ আবিস্কৃত হয়েছে।

মায়াপুরের ওপারে রয়েছে নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপকে বলা হয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড, এখানে সংস্কৃত চর্চার প্রাচীন অনেক টোল ছিল। এছাড়া এখানে পোড়ামা দেবীর মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গমন্দির সহ ১৮৬টি মন্দির আছে। এজন্য এই শহরকে প্রাচীন নদিয়ার শ্রেষ্ঠ

তীর্থক্ষেত্র ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র রূপে বিবেচনা করা হতো।

মহকুমা শহর শান্তিপুর ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে কলকাতা থেকে ১০১ কিমি দূরত্বে এবং কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণে ২০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। শান্তিপুরের উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণে তিনদিকে গঙ্গা প্রবাহিত। শান্তমুনির অবস্থান এখানে ছিল বলে এর নাম শান্তিপুর। নবদ্বীপ ও মায়াপুরের মতো এখানে বৈষ্ণবদের অবস্থান। সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান শান্তিপুরে। এখানে শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ প্রভৃতি নানামন্দির ও মসজিদ আছে। তাঁত বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত শান্তিপুর। এখানকার আরেক আকর্ষণ কার্তিক পূর্ণিমায় রাস উৎসব। এছাড়া এখানকার নিখুঁতি মিষ্টান্ন হিসাবে যথেষ্ট বিখ্যাত।

কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুরের পথে ২৮ কিমি এবং সড়কপথে কলকাতা থেকে ১৪৮ কিমি দূরে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অভয়ারণ্য বেথুয়াডহরী। নামে অভয়ারণ্য হলেও মূলত উদ্যান। ১৬৫ একর ভূমি জুড়ে অর্জুন,শিরিষ, বাবলা, মেহগিনির এই অরণ্যে ৫৫টি হরিণের বাস। এছাড়া এখানে রয়েছে শেয়াল, খরগোশ, হনুমান ও শম্বর। এরই কাছে বিল্বগ্রামে পন্ডিত মদনমোগন তর্কালঙ্কারের জন্মস্থান। এছাড়া রয়েছে ২০০ বছরের পুরানো বিলেশ্বরী মন্দির।

নদিয়ার আরেক আকর্ষণ কৃষ্ণনগর থেকে ২৪ কিমি দূরে মাজদিয়ার কাছে শিবনিবাস। বর্গির আক্রমণ থেকে রাজ্য বাঁচাতে ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে চূর্ণীর পাড়ে রাজধানী গড়েন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। বড়ছেলে শিবচন্দ্রের নামে শিবনিবাস। কালের গ্রাসে সেই রাজধানী বিলুপ্ত হলেও রাজ - রাজেশ্বর, শিবমন্দির, বাগিশ্বর, শিবমন্দির, রামসীতা মন্দির আজও অটুট। তার সাথে জাফর খাঁর দরগা। রাজ রাজেশ্বরের শিব মন্দিরের শিবলিঙ্গটি ৯ ফুট উঁচু। প্রতিবছর ভীম একাদশীতে এখানে মেলা হয়।

নদিয়ার আরেক উলে-খযোগ্য স্থান হল চাকদহ-এর ঐতিহাসিক স্থানগুলি, চাকদহ থানার মোড় থেকে বিপিন বিহারী স্কুলের সামনের দিক কিছুটা গেলেই রয়েছে জগন্নাথ দেবের মন্দির। ওর পাশেই ৮০০ বছরের দোলমঞ্চটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাকদহের পুরানো বাজারে ৮০০ বছরের গণেশজননীর মেলা ঐতিহ্যে সুমহান। এছাড়া পালপাড়া ষ্টেশনের কাছে পালপাড়া শিবমন্দিরটি রয়েছে। একটি রাজা গান্ধর্বরায়ের আমলে নির্মিত। এছাড়া শিমুরালীতে সাধক শচীনন্দন-এর নামে মঠ ও বি.এড কলেজ রয়েছে। এছাড়া ভাগিরথী শিল্পাশ্রম নামে ব্রিটিশ আমলের অনাথ আশ্রম ও সি.পি.টি বাংলো রয়েছে মনসাপোতার কাছে। এই বাংলোর পাশ অবধি এককালে গঙ্গা ছিল। এছাড়া কামালপুর গ্রামে তিনটি শিবমন্দিরই ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ।

নদিয়ার সদর শহর কৃষ্ণনগর। এখানেন রয়েছে ব্রিটিশ আমলের গভর্নমেন্ট কলেজ (১৮৪৬ খ্রীঃ)। এছাড়া ক্যাথিড্রাল চার্চ, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বসতভিটে। এছাড়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজবাড়ী। এই বাড়ীর সামনে বারো দোলের মেলা বসে। যাবতীয় সামগ্রী এই মেলায় পাওয়া যায়। এছাড়া ঘূর্ণীর মাটির পুতুল উলে-খযোগ্য, সরভাজা ও সরপুরিয়াও ইতিহাসগতভাবে সমাদৃত। এছাড়া চাপড়ার গীর্জা উলে-খযোগ্য। ফুলিয়ার শাড়ি ও কৃত্তিবাসের জন্মভিটা নদিয়ার গর্ব। বীরনগরে সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর জন্মস্থান।

নদিয়ার সুপ্রাচীন স্থানগুলির আলোচনায় হয়ত কিছুটা তথ্য লেখক দিতে পেরেছেন। কিন্তু অনেক তথ্য এখনো অজানা আমাদের কাছে। ইতিহাসগতভাবে তথ্য আরো আবিস্কৃত হবে এই আশা রাখছি। তবে বাংলার নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে যে শিল্প সংস্কৃতির প্রসার নদিয়ার প্রাচীন ও মধ্যযুগে হয়েছিল, তার কথা অনস্বীকার্য। তবে রূপ রস গন্ধে ইতিহাসে নদিয়া আজও পাঠকের কাছে রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণের বিষয়।

তথ্যসূত্র ঃ —
(১) শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের - 'ঐতিহাসিক মানচিত্রে নদিয়া'।
(২) Nadia District Wikipedia,, the free encyclopedia.

যা পড়েছি

সঞ্জিত দাস

কাব্যগ্রন্থ ঃ— কুশপুত্তলিকা - দেবজ্যোতি রায়
প্রকাশক ঃ মিত্রাবসাক, অস্ট্রিক ৭০.০০ (সত্তর টাকা)
প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১৪

অনায়াস দক্ষতায় কবিতা নির্মাণের ব্যতিক্রমী অনুশীলনে ব্যাপ্ত কবি দেবজ্যোতি রায়। ছন্দ এবং মাত্রা ব্যবহারে কোনো আরোপিত অনুধ্যান তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষীত হয় না। প্রয়োজনীয় শব্দবন্ধ সাবলীল গতিতেই বয়ে চলে তার কবিতায়। 'কুশপুত্তলিকা' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থের ৬১টি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিই শুধু কাব্যরসসিক্ত নয় বরং সার্থক কবিতার বেগবান ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। একদিকে সময়কে ধরার স্পর্ধা 'ভক্তের হৃদয়ে প্রভু আর কেন সন্দেহ জাগাও/ সবই তো গট আপ খেলা কীর্তনের অনুমতি দাও।' অন্যদিকে জীবনের গভীরে প্রবেশ - 'উড়ে আসে মৃত্যুতিথি। উদ্ভ্রান্ত দর্পণে তোমার মুখের পাশে আহত ঘোড়ার মুখ/ নিস্তেজ হয়ে আসে খুরের রোমাঞ্চ।' এই কাব্যিক মিশ্রণ, বৈপরীত্যের অকৃত্রিম মেলবন্ধন এবং বিষয় বৈচিত্র্যের সমাবেশ কাব্যগ্রন্থটিকে কাব্যসম্পদে রূপান্তরিত করেছে। 'বিচিত্র সংকটের হাত থেকে খসে পড়ে বাজারের থলে/ বিভোর সন্ধ্যায়/ পোড়া চামড়ার গন্ধে মিশে যাচ্ছে চামেলি সুবাস।' শৈল্পিক আবরণে এই সাহসী উচ্চারণের কোনো তথাকথিত তুলনা হয় না। আবার সমকালীন মূল্যবোধহীনতার অন্তঃসলিলা ব্যথায় জারিত হয় কবির হৃদয়। 'এতদিনের জীবনযাপন মায়া রেশমি সুতো, কলকা পাড়ের কাজ, ক্রোধের ভিতর, ভালোবাসার ভিতর, বেঁচে থাকার উদাসীনতা, লোভ কয়েক ছত্র আত্মপ্রতারণা সন্তানের বিলীয়মান মুখ উড়ে যাচ্ছে বিপুল নভোযানে।' কাব্যগ্রন্থে নির্মাণ শৈলীর এক ভিন্ন মাত্রা প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতায় - (প্রসঙ্গ শ্রাবণী ঘোষাল, কয়েকটি নির্জন পংক্তি, বুলফাইট, গুঞ্জন, আতঙ্ক টাওয়ার, মধ্যমণি) শাণিত ও তির্যক শব্দধারা এই কবিতাগুলোকে পৌঁছে দিয়েছে আধুনিক কাব্য অনুশীলনের এক অনাঘ্রাত স্তরে। বর্তমান প্রতিবেদকের বিশ্বাস এই শক্তিশালী লেখনী বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট কররবেই যতই তিনি লেখেন না কেন — 'আর আমি প্রতিদিন বাজি হেরে ফিরে আসি দেউলিয়া হয়ে পলাশপুরের চরে/ মুঠো ভরে আছে চৈত্র দুপুরের নিঃসঙ্গ দুপুরে আর শুকনো পাতায়। পরিশেষে বলা যায়, কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক সমাজ কাব্যরসের ভিন্ন মাত্রার স্বাদ পাবেন।

‘নিস্তব্ধ উপত্যকার’ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণতা

দীপাঞ্জনা রুদ্র সরকার

অবস্থান ঃ—

ভারতের কেরালার পালঘাট জেলায় Kandhipuja নদী উপত্যকায় অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সমৃদ্ধতম একটি আদিম ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যে ঢাকা বনভূমি হল Silent Valley, যার আয়তন ৮,৫৯২ হেক্টর।

তাৎপর্যতা ঃ —

এই অববাহিকা অঞ্চলটি দেশের অবশিষ্ট সেই সামান্যতম অতি সমৃদ্ধ আর গুরুত্বপূর্ণ বর্ষা অরণ্য সম্পদের অংশ যা এতদিন পর্যন্ত উন্নয়ণ নামক খর্গটির ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে।

সুদীর্ঘ ৫ কোটিরও বেশি জৈব বিবর্তনের ফসল Silent Valley এই অঞ্চলটিতে বা উপত্যকাটিতে মজুত রয়েছে —

পৃথিবীর সমৃদ্ধতম জীববৈচিত্র আর জীনসম্পদের ভান্ডার।

জৈববৈচিত্রের ভান্ডার Silent Valley ঃ—

* মাত্র ৯০ বর্গ কি.মি. ব্যাপী এই গন্ডোয়ানা ভূমিতে ছড়িয়েরয়েছে কম করেও ১,১০০ প্রজাতির গাছপালা, যাদের মধ্যে ৯৯৬টি প্রজাতিই সপুষ্পক।
* এদের মধ্যে এমন অনেক প্রজাতিই রয়েছে যারা পৃথিবীর অন্য সব অঞ্চল থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে এমনকি তাদেরকে একমাত্রই এই Silent Valley ছাড়া আর কোথাও বর্তমানে দেখা যায় না।
* অসংখ্য ঔষধি গাছপালা ছাড়াও রয়েছে মশলা ও ডাল উৎপাদনকারী শস্যের জ্ঞাতি প্রজাতিরা।
* এখানে উপস্থিত গাছপালাগুলির রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা ও উচ্চ প্রোটিনযুক্ত সংকর প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় জীন বৈচিত্রের বিপুল ভান্ডার হিসাবে কাজ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
* এই অরণ্যভূমির প্রাণী সম্পদও বিপুল। তাছাড়া এখানে বসবাস করে উপদ্বীপীয় অঞ্চলের প্রায় সব বাসিন্দাই।

Silent Valley-এর প্রাণীকূলের মধ্যে রয়েছে অতি বিরল ও লুপ্ত প্রায় বেশ কয়েকটি প্রজাতি। এই প্রাণীদের মধ্যে পড়ে - **সিংহপুচ্ছ কেশরী বানর, নীলগিরি থর, নীলগিরি হনুমান ইত্যাদি।** এছাড়া রয়েছে **বাঘ, উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি, মেছোবিড়াল, মালবারের ভাম, মাউজ ডিয়ার** প্রভৃতি বিশেষ উলে-খযোগ্য।

Silent Valley-কে আন্দোলনে বিবেচিত করার কারণ ঃ-

পশ্চিমঘাটের পর্বতমালার সমৃদ্ধতম আদিম অরণ্যভূমির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিতা খরস্রোতা নদী Kandhipuja ৮৫৭ মিটার উচ্চতা হতে হঠাৎ অবতরণের কারণে (কেরলের সর্বোচ্চ) একে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বাঁধ ও সংলগ্ন জলধার নির্মাণের জন্য আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, ইংরেজ আমলেই কিন্তু অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণে তা রূপায়িত হয়নি। ১৯৬৩ সালে পুনরায় সেই উদ্যোগ আবার নেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যার ফলে Silent Valley টি — **“পরিবেশ সুরক্ষা না উন্নয়ণ”** - এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে। যদি জলাধার, বাঁধ নির্মাণ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্ত বায়িত হয় তবে Silent Valley টি-এর অতি সমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ বর্ষাবনের অনেকটা অংশ প্রায় ৮৫০ হেক্টর চিরহরিৎ অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে শুরু হল **“Protect Silent Valley Movement”** যার পুরোধা **কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (KSSP)** - কে দেওয়া যায়। **KSSP** হল একটি গুরুত্বপূর্ণ **N.G .O.** সংস্থা যেটি ভারতের পরিবেশ আন্দোলনে এক বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে। সমগ্র কেরালা জুড়ে বিস্তৃত ২৫,০০০-এরও অধিক সদস্য ১৯টি শাখায় ভাগ হয়ে বাস্তব্য উন্নয়ণ, জল ও শক্তি সংরক্ষণ বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ণের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। বিশেষত Silent Valley কে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার স্বীকৃতি রূপে **১৯৯৮ সালে KSSP-কে ইন্দিরাগান্ধী পর্যাবরণ পুরষ্কারে** ভূষিত করা হয়।

KSSP- এর বিবররণের ফলে **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ,BSI, GSI** ঐ এলাকায় তথ্য অনুসন্ধান করে এবং সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় এরাও প্রকল্প বাস্তবায়নে বিরোধিতা করে। প্রস্তাবিত বাঁধ বা জলাধারটি শুধু বনাঞ্চল ধ্বংস করবে তা নয় তার সাথে সাথে প্রাণী ছাড়াও পরিযায়ী পাখী ও মাছেদের বংশবিস্তার, তীরবর্তী শাকসব্জীও ধ্বংস করবে। সবদিক বিচার করে কেরল তথা সমগ্র দেশবাসী, ছাত্র, শিক্ষক, বিজ্ঞানী সংগঠন সকলের প্রতিবাদ **KSSP**-এর নেতৃত্বে ব্যাপক গণ আন্দোলনের রূপ নিল, এবং অচিরেই সেই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। এছাড়া যে যে উলে-খযোগ্য সংস্থাগুলি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তারা হল **ন্যাশনাল কমিটি অফ এনভায়রনমেন্টার প-্যানিং (NCEP), বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি (BNHS), WWF -India** ইত্যাদি এবং সর্বোপরি সংবাদপত্র সমূহ। যা এই আন্দোলনকে এক আন্তর্জাতিক মাত্রা দিল। অবশেষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী - **ইন্দিরাগান্ধীর** হস্তক্ষেপে **Silent Valley Protect Movement** ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সফল পরিবেশ আন্দোলনে পরিণত হল। আজ এটি **ভারতবর্ষের সমৃদ্ধতম জাতীয় উদ্যানগুলির অন্যতম** এবং **নীলগিরি জীব পরিমন্ডলের কোর অঞ্চল** হিসাবে স্থান করে নিয়েছে এই **Silent Valley Region.**

কাব্যবীক্ষণ (জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা - ২)

বিকাশ মৈত্র

কবি জীবনানন্দ দাশ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সময় কাল থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাব্যচর্চা করেছেন। মধ্যবর্তী সময়ের বিশ্বযুদ্ধকে পার করে এসেছেনন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র কাব্য ভাবনার বিকল্প পথত পরিক্রমা শুরু হয়ে গেছে এবং তা এস্টাবলিস-ও হয়ে গেছে। কলে-ল - কালিকলম - পরিচয় পত্রিকার যুগ পরিক্রমাগত কবিকুল নবযুগের সূচনায় আর পরিণতিতে মুখর হয়ে উঠেছেন। সুধীন্দ্রনাথ - বুদ্ধদেব বসু থেকে বিষ্ণু দে অন্যদিকে নজরুল সুকান্ত কাব্য কবিতার নতুন স্বাদ ... সমাজবাদের প্রেক্ষিতে পাঠক সমাজকে আলোড়িত করেছে। জীবনানন্দের কাব্যজগত এই সময়কালের। এ যুগের কবিতা পাশ্চাত্য কবিদের কবিতার মতন মুখ্যত ইন্দ্রিয় নির্ভর ও ব্যক্তিমন নির্ভর। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, হরপ্রসাদ মিত্র এদের কবিতা আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যের দুরুহতার সমর্থক। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতাকে সেইভাবে দুরুহতার দোষে দুষ্ট বলা যায় না। জীবনানন্দের কবিতায় ভাব ও প্রকৃতির সৌন্দর্য ভাবনার শরীরী প্রকাশ ভঙ্গীমায় আবদ্ধ। অনবদ্য ভাবরূপ ... চিত্ররূপ। রূপময় ভাবনার প্রকাশ একেবারে নিজস্ব। একেই বোধহয় বলা যায় কাব্যের আত্মা ও শরীর। কবির চেতনা জগত আমাদের চেনা জগতের মধ্যেই বিস্তৃত। কোন দুরুহতার শে-ষ কবিতার প্রাপ্য সম্মান নয়। কবির চেতনা জগত অচেনা কিন্তু তার চিত্ররূপ শিল্পিত রূপে তার প্রকাশ। কিন্তু তা আমাদের চেনা। চেনা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি। এটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সত্য। ভাব জগতের কাব্যরূপ ... পাঠকের কাছে দৃশ্যরূপ। কারণ তার শরীরী ভাষা। কবির চিন্তা ও ভাবলোকের কবিতাত্মক প্রয়োগ-এর দিকটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়। এই কবিতাত্মক প্রয়োগ আসলে সৌন্দর্য্যের সর্বোচ্চ দিক।

রূপসী বাংলার প্রধান বিষয় প্রকৃতি। সৌন্দর্য্যের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে বোম গার্ডেন মনে করেন সৌন্দর্য্যের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি প্রকৃতিতে দেখা যায় (শিল্পের স্বরূপ — টলস্টয়, পৃঃ-১৭)। আবার সুলতসার, মেলডেলসন, মরিতস - এর মূল বক্তব্য সৌন্দর্য্যের স্থলে মঙ্গলকে শিল্পের লক্ষ্য বলেছেন। যে বস্তু নৈতিক অনুভূতিকে উদ্রিক্ত ও পরিশীলিত করে তাই সৌন্দর্য্য। কিন্তু এই মঙ্গল তত্ত্ব পরবর্তীতে অন্য রূপ ধারণ করে। যে সৌন্দর্য্য মঙ্গল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিরপেক্ষ। তিন রকম সৌন্দর্য্যের কথা বলা হয় — ১/ গঠনগত সৌন্দর্য্য ২/ ভাবের সৌন্দর্য্য ৩/ প্রকাশের সৌন্দর্য্য। প্রকাশের সৌন্দর্য্যই শিল্পের চরম লক্ষ্য। সেদিক থেকে প্রাচীন শিল্পের অনুকরণই আধুনিক শিল্পের আদর্শ বলা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ সত্য শিব সুন্দরকেই শিল্পের আত্মা হিসাবে নিয়েছেন। আর এটাই সবচেয়ে বেশি গ্রহণ যোগ্য। জীবনানন্দের কাব্যের সময় চেতনা - কাল চেতনা - সমাজ চেতনার মধ্যে তা বিধৃত। যদিও রূপসী বাংলার মধ্যে সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল পৃথক হলেও তারা পরিণামে অভিন্ন ও একাত্ম।

রবীন্দ্র কাব্যে দার্শনিকতা এসেছে — শব্দ চয়নে, উপমা প্রয়োগে তা অতি

সরলীকরণ ঘটেছে - যা পরবর্তীতে বিশেষত অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত এসে অনেক জটিল রূপ ধারণ করেছে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এই সময়কার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বিশেষত ইয়েটস ও মারলামের কাব্যে রূপকতা ও প্রতীকতার ব্যবহারের প্রভাব এদের কাব্যের একটা বড় দিক। ভাবের ব্যঞ্জনার দিকে এদের অতি সচেতন কবিতার শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের একটা দিক। ফলে দুর্বোধ্যতা এসেছে একই সাথে। আর একটি বিষয় এখানে উলে-খ্য — ভাব প্রকাশের উচ্ছ্বাসহীনতা যথার্থ বোধ আধুনিক কবির অভিপ্রেত হওয়ার সংযত কথন ও মৌখিক ভাষাকে কবিরা আশ্রয় করে থাকেন। নতুন নতুন শব্দ প্রয়োগ করেন পুরানো শব্দের বদলে। কাব্য রচনায় আধুনিক কবির লক্ষ্য ছন্দের দোলার চেয়ে অনুভূতির প্রকাশে। ফলে ভাব প্রকাশে চিত্রকল্পের উপরেই বেশি নির্ভরশীল। জীবনানন্দের কবিতায় এই দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্ব কাব্য সৌন্দর্য্যের প্রাণ সঞ্চার করেছে জীবনানন্দের কবিতায়।

কবি যেযমন রসের স্রষ্টা, পাঠকও তেমনি রসের বোদ্ধা। পাটক রসের বোদ্ধা - যেহেতু পাঠকের ভেতরেও আছে টইটম্বুর রস। কবির রস সহৃদয় পাঠকের মনের বিচারে অবস্থান করে। আর রস হল সহৃদয় সংবাদী। রসোত্তীর্ণ হতে গেলে কোনো একটি সীমারেখা অতিক্রম করতে হবে। সেই সীমারেখা - কাব্য - শব্দ - উপমা - অলংকার ছন্দ কে ধরে আর তাকে অতিক্রম করে। কোথায় যেন এসব ছাড়িয়ে কবিতার গতি উৎসেচিত ও উদ্বেলিত হতে হয়। আর তা যত বেশি হবে সেই কবির কবিতা তত কালাতিক্রম করবে। আর সেই সীমারেখাকে অতিক্রম করলে বলা যাবে তা রসোত্তীর্ণ কবিতা। কবিতার আবেগ ও প্রজ্ঞার সমতা থাকলে তা হবে হৃদয়গ্রাহী। জীবনানন্দের কবিতায় এই দিকটি একশোতে একশো। জীবনানন্দের রূপসী বাংলার কবিতাগুলি সেই রূপের বাঙময় প্রতিমা নিদর্শন বলা চলে। রূপসী বাংলার কয়েকটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি উপস্থিত করলে রসবোদ্ধা পাঠক এ বিষয়ে একমত হবেন বলে মনে হয়। .... যদিও নমুনা হিসাবে মাত্র কয়েকটি কবিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

৬ সংখ্যক ..... ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা

১১ সংখ্যক — আমি এই বাংলার পাড়া গাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর

২০ সংখ্যক —যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে .... দূর কুয়াশায় চলে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর ভিক্ষা করে লয়ে যাবে।

৩৯ সংখ্যক — মানুষের হৃদয়ের পুরানো নীরব / বেদনার গন্ধ ভাসে

৪৪ সংখ্যক — ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর যতদূর যাই আমি, আরো যতদূর পৃথিবীর নরম পায়ের তলে যেন কত কুমারীর বুকের নিঃশ্বাস / কথা কয়

৫১ সংখ্যক — নদীর গোলাপি ঢেউ কথা বলে,
তবু জানি তার কথা কুয়াশায় ফুরায় না ...

৫৩ সংখ্যক — একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রান থেকে এই বাংলায় জেগেছিলঃ বাঙালী নারীর মুখ দেখে রূপ চিনে ছিল দেহ একদিন এই সমস্ত অনবদ্য পংক্তিগুলোর

মধ্যে স্থায়ী হৃদয় বৃত্তিগুলো (অনুতাপ,বিষাদ ইত্যাদি) সঞ্চারী হৃদয় বৃত্তির দ্বারা গাঢ় ও উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকের হৃদয় বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সঞ্চারী হৃদয় বৃত্তি স্থায়ী ভাবকে উজ্জ্বল করেছে ও গাঢ় করেছে বলেই কবিতাগুলি অনবদ্য। স্থায়ী হৃদয় বৃত্তি রূপসী বাংলার কম বেশি বিষাদ - মৃত্যু- করুণ- অতিক্রান্ত চিরন্তন সুর। আর এটা প্রায় প্রতি কবিতাতেই বর্তমান। আর এটাই কবিতাগুলোর মূল সুর। জন্ম জন্মান্তর ও প্রকৃতির সাথে মিশে থাকা প্রকৃতি প্রেম (বাংলায় বর্ণিত) এক নতুন স্বাদ এনেছে। "পাড়া গাঁয় ঘর বাঁধা" কবির জন্মান্তরে সত্য হয়ে ওঠে। যখন কবি বলেন "অন্ধকারে আমার শরীর ভিক্ষা করে লয়ে যাবে" .... কিন্তু কবি সেই বাংলার ঘাস হয়ে কিম্বা ঘাসের শরীর নিয়ে বুকে করে ফিরে আসেন, ... "পুরানো নীরব / বেদনার গন্ধ ভাসে" - নদীর ঢেউ-এর কথা কুয়াশায় ফুরায় না। বাংলার নারীর মুখ দেখেই কবির দেহ চেনা — এসবই কবির স্থায়ী হৃদয় বৃত্তির রূপ এর সাথেই বাংলার প্রকৃতি সমানভাবে নির্মাণ। আর এই নির্মাণই রূপসী বাংলার নির্মাণ।

জীবনানন্দের রূপসী বাংলার ৬০টি কবিতার মধ্যে ৫৬টি কবিতা চতুর্দশপদী কবিতা। কবিতাগুলোর মধ্যে দুটি কবিতা ১ নং ও ৫৯ নং কবিতা যৌগিক মাত্রিক মুক্তক ছন্দে লেখা তবে এই মুক্তক ছন্দ রবীন্দ্রনাথের বলাকার মুক্তক ছন্দের আদলে নয়। এলোমেলোভাবে কোথাও কোথাও অন্ত্য মিল আছে। ১ নং কবিতাটি ১৩ পংক্তির কবিতা। প্রথম স্তবক ৯ পংক্তির শেষ অংশ চার পংক্তি। অসম লাইন থাকলেও দীর্ঘ পয়ারের মতো আটটি পংক্তি। পয়ারের মতো হলেও পয়ার নয়। আবার সাধারণ মুক্তক বলা মুশকিল। ৫৯ সংখ্যক কবিতাটি আট পংক্তির। ৪+৪ মোট আট। প্রথম চারে অন্ত্য মিল কখ,গখ, পরের চারে ঘঙ,ঘঙ। এছাড়া মাঝে মাঝে অন্ত্য মিল আছে ৩৩ সংখ্যক কবিতাটি, প্রথম স্ত বক আট পংক্তি হলেও শেষ স্তবক ৫ পংক্তির। প্রথম আট লাইনে অন্ত্য মিল ক খ খ ক, ক খ খ ক। পেত্রার্কিয় সনেটের সাথে মিল আছে। শেষ ৫ স্তবকে মিল - গ ঘ গ ঘ ঘ। অধিকাংশ চতুর্দশপদী পংক্তিতে ২২ মাত্রা। কিন্তু সর্বত্র এই নিয়ম মানা হয়নি। বাকি ৫৬টি কবিতা মোটামুটিভাবে পৈত্রার্ক এর অনুসরণে সনেট ধর্মী লেখা, তবে সবসময় যে কবি তা অনুসরণ করেছেন তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ২২ মাত্রার পংক্তি নির্মাণ করেছেন। যতি ৮+৮+৬ আবার সব সময় তাও নয়। কোথাও ৮+১০, আবার এমন কবিতাও আছে যেখানে ২৮ মাত্রার কিম্বা ৩০ মাত্রার পংক্তি আছে। জীবনানন্দের কবিতা ধীর লয়ের, টেনে পড়তে হবে। ধীর গতিতে। তার কবিতায় গদ্যের প্রসাদ গুণ লক্ষ্য করার মতন। ধ্বনি ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই মৃদু গম্ভীর। একদিকে ধ্বনি মাধুর্য অন্যদিকে ধ্বনি বিস্তার কবিতার ভাব জগতকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতায় নিয়ে আসে। অনেক সমালোচক কবিতাগুলোকে সনেট বলতে দ্বিধা করেন। কারণ সনেটের সব শর্ত তিনি মেনে চলেন নি। যদিও আমি এই কবিতাগুলোকে সনেট বলতে দ্বিধান্বিত নই। বিভিন্ন কবি তারা নিজেদের মতো করে সনেটের রূপ ভেদ করেছেন। সনেটের বিশ্বস্ততা অন্তরের গভীর ভাবকে সীমিত কাঠামোয় আন্তরিকতায় প্রকাশ করা। সেই কাজটা এই সনেটগুলোর মধ্যে দেখা যায়। তবে কবিতাগুলোর মধ্যে অন্ত্য মিল সবসময় করেননি। তবে যতি চিহ্ন তিনি যথাযথ ভাবে করায় কবিতা মাধুর্য্য বজায় আছে।

কবিতার ভাষা ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। দেশী বাংলা শব্দের পাশে তৎসম শব্দ, কথ্য বাংলার পাশে সাধু ভাষায় ক্রিয়া পদের প্রয়োগ জীবনানন্দের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর আগে কোন বাংলার কবি এত দীর্ঘ মাত্রার পংক্তি ব্যবহার করেন নি। নতুন ভাবনাকে নতুন ডানায় চড়িয়ে কবিতার যে আঙ্গিক রচনা করবেন তা পরবর্তীতে বাংলার কাব্য ইতিহাসে একটা নতুন দিগন্ত। আর একটি কথা বিশেষ ভাবে উপলব্ধ ছন্দের বিশিষ্টতা তার ভাবের বৈচিত্রের উপর নির্ভর করে। কবি মনের ভাব বিষয়ভিত্তিক ভাষা প্রয়োগে পাঠকের অন্তর জগতকে অনুরণিত করে। পাঠক নিজেই উদ্বেলিত হন। তার অন্তরভাবের ও জ্ঞানের আন্দোলনে আন্দোলিত হয়। সেখানেই ছন্দের দোলা পাঠক চিত্তকে রসাবদ্ধ করে। জীবনানন্দের কবিতার ভাষা মাধুর্য্য মানুষের চিত্তকে রসের সন্ধান দেন। সেটাই তার শক্তি।

আর সেই শক্তির মূলাধার তার চিত্র রচনায়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন চিত্রকল্প। তবে চিত্র আর চিত্রকল্প এক নয়। চিত্রকল্পের সাথে মন ও মননের সংযোগ থাকে। সেখানে টুকরো ছবি নয়। প্রাচীন পুরাণ, কল্পনা, ইতিহাসের কাহিনী, ধর্ম, দেশি-বিদেশি কোনো কাহিনী এসবের এলোমেলো সংযোগে কোনো একটি অনুষঙ্গ গড়ে ওঠে যা চিত্রকল্প। এলোমেলো কথাটি বললাম এ কারণে আপাত ভাবে এলোমেলো হলেও তা কিন্তু নয়। একটা বিশেষ অনুভূতির আশ্রয় এটা। কবিতায় মানুষ এখন শুধু ভাব খোঁজেন না। তিনি আরো কিছু চান। চিত্র রচনা আর চিত্রকল্প রচনা ভিন্ন রূপ ভিন্ন দিক। চিত্র, উপমা, রূপক এগুলি কবিতাকে অলংকৃত করে। কিন্তু এগুলো কবিতা নয়। চিত্রকল্প কবিতাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। ইম্প্রেশনিস্ট কবিদের মতোই কবি চিত্র রচনায় কবিত্ব শক্তিকে যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। কবিতায় বিভিন্ন সময়ের যে রঙ ব্যবহার করেছেন তা অতুলনীয়। ঘাস, ফড়িং, ধান ক্ষেত - এসবের মধ্যে তিনি শব্দের রঙ এঁকেছেন। রূপসী বাংলায় দেখুন "কাকের তরুণ ডিম পিছলায়ে পড়ে যায় শ্যাওড়ার ঝাড়ে।" কিংবা টুকরো ছবি আঁকলেন বিবর্ণ বাদামী পাখী বলার মধ্য দিয়ে ঝড়া শীতের সংকেত নিয়ে আসলেন। কবির প্রাণের প্রতি মমতা, অনবদ্য চিত্র — "ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন - ক্ষেতের মাঠে পড়ে আছে খড়/ পাতা কুটো ডাঙ্গা ডিম - সাপের খোলস নীড় শীত।" এর মধ্যে দিয়ে বিচ্ছেদ কাতরা শূন্যতাবোধ আর কবির বিষন্নতার চেতনা। শুধু কবি নয় পাঠকের চিত্তকে মর্মরিত করে সন্দেহ নাই। চিত্র রচনায় দেখি কবির হৃদয়ের বেদনাহত এক জগতকে কবি ধূসর জগতের মধ্যে বাস্তবতাকে অনুভব করেন। ইম্প্রেশ্নিজমের ধারাকে কবি অস্বীকার করতে পারেননি। গোটা বিশ্বের যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে কবির কাছে আর আমাদের কাছেও যে জগতটা প্রতীয়মান হচ্ছে তাকে তিনি কীভাবে অস্বীকার করবেন। এ শুধু মৃত্যু চেতনাই নয়। এ আমাদের জগত ও পৃথিবী চেতনা। যদিও রূপসী বাংলায় কবির মৃত্যু চেতনাই অধিক। সে বিষয় অন্যত্র আলোচনা করেছি। জীবনানন্দের কবিতায় কথা দিয়ে যে চিত্র এঁকেছেন বাংলা সাহিত্যে প্রায় বিরল বললেই চলে। আসলে কবিতায় এত রঙের ব্যবহার খুব কম কবির ক্ষেত্রে দেখি। কিছু চিত্রের উদাহরণ উপস্থিত করছি — ১/ বাংলার নীল সন্ধ্যা ... কেশবতী যেন এসেছে আকাশে, ২/ অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত, ৩/ সাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে, শঙ্খের মতো কাঁদে; সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে। ৪/ নকশাপেড়ে

শাড়িখানা মেয়েটির রৌদ্রে ভিতর / হলুদ পাতার মতো সরে যায়, জলসিড়িটির পাশে। ৫/ রৌদ্রে যেন ভিজে বেদনায় / গন্ধ লেগে আছে, ৬/ কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি বারুণীর প্রাণে / বিনুনি খসায়ে বসে থাকিবার স্বপ্ন আনে .... পৃথিবীর পথে, ৭/ এসেছে সন্ধ্যার কাক ঘরে ফিরে, দাঁড়ায়ে রয়েছে জীর্ণ মাঠ/ মাঠের আঁধার পথে শিশু কাঁদে/ এরকম বহু দৃষ্টান্ত ছত্রে ছত্রে আছে।

চিত্রকর রচনার ক্ষেত্রে টি.এস এলিয়ট বলেছেন শিশু বয়স কৈশোর কালের স্মৃতিকে মানুষ ভুলতে পারেনা। তাই জীবনের নানান সময় মানুষ ঐ স্মৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়। কবিরাও বিশেষত সু-রিয়ালিষ্ট কবিরা পরাবাস্তবতাকে তুলে আনেন তাঁদের কবিতায়। কবি যেন সচেতনভাবে কবিতা লিখছেন না। মনের কোনো অতলান্ত থেকে অভিজ্ঞতার বাইরের জগত জীবিন সম্পর্কে জ্ঞান পেতে পারেন। ফলে চিত্রকল্প রচনার বিষয়টি সেই দিক থেকে করা দরকার। ফ্রয়েডেরর শিশু মনস্তত্ত্ব এই ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা যাবে।

(খন্ডিত অংশ)

পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার বিকাশ ও বিবর্তন প্রসঙ্গ তপশিলি জাতি (১৯৪৭-২০১৩) একটি পর্যালোচনা

সমরেশ পাল

সারাংশ (Abstract) ঃ— শিক্ষা **(Education)** জাতির মেরুদন্ড। মানুষের আদর্শ শিক্ষা দিলে তবেই আদর্শ সমাজ গঠন হবে। দেশ গঠনের প্রধানতম হাতিয়ার হল আদর্শ শিক্ষা। স্বামীজি বলেন, 'Education is the manifestation of the perfection already in man অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত সত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের দেশ ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে যারা পিছিয়ে আছে তাদের শিক্ষার আওতায় এলে সমতার নীতিতে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালু করলে দেশ তথা রাজ্যের আর্থিক উন্নতিত ঘটবে। সরকারী - বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে শিক্ষার প্রসার ঘটালে সমান্তরাল গতিতে সমাজের সকলেই শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হবে। সরকারী পদক্ষেপ যথা ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষাবিষয়ক ধারা - উপধারা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮ - ১৯৫৯) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩), কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮), জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬), জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৯০), ঈশ্বরভাই প্যাটেল কমিটি (১৯৭৭), জাতীয় সাক্ষরতা মিশন (১৯৮৮), রামমূর্তি কমিটি (১৯৯০), সর্বশিক্ষা অভিযান (২০০০) NCF - 2005, NCF - TE - 2009, NKC - 2009, RMSA - 2009, RTE - 2009। কন্যাশ্রী প্রকল্প - ২০১৩ প্রভৃতি জনমুখী সরকারী পদক্ষেপ গুলি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তপশিলি নারীদের শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করে চলেছে, যা রাষ্ট্র তথা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে চলেছে। ফলে তপশিলি নারী শিক্ষার বিস্ত ার ও বিবর্তন ঘটেই চলেছে।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ঃ— ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ, অবিভক্ত, চব্বিশ পরগণা জেলা, শিক্ষা, নারী, স্বাধীনোত্তর, বিকাশ, বিবর্তন, তপশিলিজাতি।

শিরোনাম ঃ — পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার বিকাশ ও বিবর্তন - প্রসঙ্গ তপশিলি জাতি (১৯৪৭ - ২০১৩) ঃ একটি পর্যালোচনা।

যে কোন রাষ্ট্র - রাজ্য - অঞ্চল - গ্রাম - সমাজ তথা মানুষের আর্থ- সামাজিক ও সংস্কৃতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিক্ষা। শিক্ষা কোন পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর বিকাশ ও বিবর্তনে সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি নারীদের শিক্ষার সার্বিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। শিক্ষা পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি নারীদের কেবল অর্থনৈতিক উন্নতিতে নয়, তপশিলি নারীদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে দৃঢ় করতে এবং সমাজে চলার পথকে মসৃণ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

স্বাধীনতা পূর্ব পশ্চিম বঙ্গ এবং স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তপশিলি নারীদের শিক্ষার বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ সরকার সর্বদা কেরানী তৈরীর শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল, সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষের শোষণ করত সেখানে তপশিলি শ্রেণীর নারীরা তো অবহেলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে জহরলাল নেহেরু বলেন সমাজে যা পিছিয়ে পড়া শ্রেণী তাদের বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের মতো থাকতে দেওয়া যায় না। ফলে তাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়। ১

গান্ধীজিও সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের কথা চিন্তা করতেন তার প্রতিফলন আমরা পাই বিভিন্ন গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া তপশিলি নারীরা অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। যদিও জহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী পূর্ব ও প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীতে নানা পর্বে তপশিলিদের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। বৃহত্তর নানা বিষয় নিয়ে তারা সর্বদা চিন্তা ভাবনা করেন। ২

স্বাধীনোত্তর পর্বে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ বুঝলেন যে সমাজের পিছিয়ে পড়া তপশিলি নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বৃহত্তর ভারতীয় গোষ্ঠীর একটা সুসমৃদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। একারণে স্বাধীন ভারতবর্ষ সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিক্ষার উন্নতিতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। যার শুরু হিসাবে ভারতীয় সংবিধান রচনা থেকে বর্তমানে কন্যাশ্রী প্রকল্প এর মাঝখানে যতগুলি পদক্ষেপ সবই তপশিলি শ্রেণীর নারীদের শিক্ষা নিয়ে নানা নির্দেশ দিয়েছে। আদর্শ ভারত গঠনের জন্য সমাজ গঠনের যে প্রচেষ্টা তার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।৩

ভারত সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল তপশিলি নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে নারীদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। ভারত সরকার সর্বদা শিক্ষা বিষয়ক নানা পদক্ষেপ নিলেও তা পশ্চিমবঙ্গে প্রসার লাভ করে ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও উপধারার এবং Directive Principles of State Policy -তে শিক্ষার নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে, যা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দায়িত্ব সহকারে পালন করে চলেছে।৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে রাজ্য প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সরকার স্বীকৃত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তপশিলি জাতিভুক্তদের জন্য ২২ শতাংশ এবং তপশিলি উপজাতিদের জন্য ৬ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।৫

ইঞ্জিনিয়ারিং, পলিটেকনিক্যাল, নার্সিং, অ্যালোপ্যাথি, হোমিয়োপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক কলেজেও এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে। এই সংরক্ষণ নীতি থেকে তপশিলি নারীরা কিন্তু বিরত থাকেনি। ফলে নারী শিক্ষায় উন্নতি হতে থাকে।

ভারতীয় সংবিধানে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ১৫(৪), ১৬(৪), ১৭ এবং ১৯ (৫) নং ধারায় তপশিলি শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে।৬

সংবিধানের ৪৬ নং ধারায় তপশিলি জাতি ও উপজাতি সমেত অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং সংখ্যালঘুদের জন্য জেলায় জেলায় বিশেষ আদালত গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয় (১৯৯০)। উপরিউক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি তপশিলি নারীদের শিক্ষায় সহায়তা করে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য কী হওয়া উচিৎ তা আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উলি-খিত হয়েছে। ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র রূপে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। স্বাধীনতা, সাম্য, সামাজিক ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ব বোধের ভিত্তিতে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানীক প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই স্বাধীন ভারতের দু-দশকের মধ্যে দেশে শিক্ষা সংস্কারের জন্য রাধাকৃষ্ণান কমিশন (১৯৪৮-১৯৪৯)৭, মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-১৯৫৩)৮ এবং কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-১৯৬৬)৯ গঠিত হয়েছে। কমিশনগুলির সুপারিশ ও পরামর্শ জাতীয় শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আবার কমিশনগুলির সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতে একাধিক শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছে ১৯৬৮ - ১৯৭৯ এবং ১৯৮৬ তে। এসব নীতিকে কেন্দ্র করেই স্বাধীন ভারতে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনঃগঠন চলছে। এক্ষেত্রে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নারীরা শিক্ষা গ্রহণে উদগ্রীব হতে থাকে ফলে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটছে এটা আশা করা যায়।

Drop-Out বা বিদ্যালয় ছুট ভারতীয় শিক্ষা প্রসারের অন্যতম একটি বিরাট বাধা কিন্তু NPE-এর বিভিন্ন পদক্ষেপে তপশিলি শ্রেণীর নারীদের শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ১৯৮৬ খ্রীঃ NPE- তে বলা হয়েচে ১৯৯৫ খ্রীঃ মধ্যে ২৫% শিক্ষার্থীদের কৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে প্রতিটি রাজ্যই সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী ও বেসরকারী অনেক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তবে যতটা প্রত্যাশিত ছিল ততটা হয়নি। সঠিকভাবে রূপায়িত হলে একদিন ৫০% কারিগরি বিদ্যালয় পারদর্শী হয়ে উঠত, যা হয়নি। কারিগরি বিদ্যার মধ্য দিয়ে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো যেতে পারে।

NPE-১৯৮৬ তে দূরশিক্ষা, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি রয়েছে। এগুলি কিছুটা কার্যকরী করা হয়েছে। জাতীয় স্তরে যেমন রয়েছে GNOU (Indira Gandhi National Open University) তেমনি প্রতিটি রাজ্যেও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র মুক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়, NPE১৯৮৬ সুপারিশ মতোই National Council for Teacher Education (NCTE)-এর দায়িত্ব বেড়েছে। NPEএর পরামর্শ মতোই শিক্ষক - শিক্ষন পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করা হয়েছে।১০

স্বাধীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে অনেক বেড়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ৫৫ লক্ষ শিক্ষক, ১০ লক্ষ স্কুল, ২০২৫ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ৪২ শতাংশ অধিবাসীর জন্য ১ কিলোমিটারের মধ্যে একটি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। ৭৫ শতাংশ দেশবাসীর জন্য ৩ কিলোমিটারের মধ্যে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়, তাদের অন্তত ৫০ শতাংশ উত্তীর্ণ হয়। এই প্রবণতা সত্ত্বেও ভারতের ৩৭% মানুষ এখনো অক্ষর পরিচয়হীন, ৫৩% শিশু প্রাথমিক স্তরে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া আমাদের প্রায় ৭৫ বাগ গ্রামীণ স্কুলই নিম্নমানের।

NCF(National Curriculum Frame Work - 2005) অনুসারে শিক্ষার একটি সার্বিক দিকের কথা বলেছেন। আমাদের সমাজের দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক শ্রেণীকে ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করার সক্ষম করে তুলতে হলে মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেশের প্রতিটি শিশুকে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তুলতে হবে। একটি দেশের নাগরিককে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষালাভে সক্ষম করানো বিদ্যালয় ব্যবস্থার সাফল্যের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সামাজিক বিভিন্ন বাধাগুলি অপসারণ করতে হবে।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে এবং বিভিন্ন Talent Search এর যথেষ্ট Constructivism এর কার্যকলাপ তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। এর দ্বারা এটি বলা যায় যে বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে এক অন্য মাত্রা দান করে।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যক্তির প্রত্যাশাগুলির সার্বিক মূল্যায়ণ করতে থাকে। প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে শিশুদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এখানেও মানবিক মূল্যবোধও হ্রাস পেতে থাকে। সর্বদা বিচ্ছিন্নতা ও পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মনোভাব আসল শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীদের মুখ ঘুরিয়ে দেয়। ভারতের বৈচিত্র্যময় এবং বহুমুখী সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজে মানবিকতা, সহযোগিতা ও সহিষ্ণুতা জাগ্রত করে তোলা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য।

National Curriculum Frame Work - 2005 থেকে সর্বদা স্কুলের শিক্ষক,শিক্ষার্থী, পাঠ্যক্রম এর বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়। সর্বদা শিক্ষার্থীদের উপর থেকে একটি পাঠ্যক্রমের বোঝা (Curriculum Load On Children) হ্রাস করার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম ফ্রেম ওয়ার্ক - এর পর্যালোচনা করা হয় ২০০০ খ্রীঃ MHRD বা মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক কর্তৃক নিয়োজিত একটি কমিটি ১৯৯০ খ্রীঃ। পাঠ্যক্রমের বোঝা সম্পর্কে বলে তথ্যকে জ্ঞান হিসাবে গণ্য করার প্রবণতাই এর বিষয় Learning Without Burden এর প্রতিবেদন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা এবং পাঠ্যপুস্তকের বিপুল পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ঐতিহ্য, শিশুর সৃজনশীলতা, যান্ত্রিক

পরীক্ষাভিত্তিক পরীক্ষা থেকে দূরে সরে আসা, সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে শিক্ষার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে।১১

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মতে, শিক্ষার কাজ হল আমাদের সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, হিংসা ও অসাম্যের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনা গড়ে তোলা। গান্ধীজির National শিক্ষা পদ্ধতি ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা ও ব্যক্তির মর্যাদার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুদের সামাজিকি করণের মাধ্যমে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পরিবেশ, মাতৃভাষা ও হস্তশিল্প কেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলেছেন। ২৪ পরগণা জেলায় এই ধরণের বার্তা তপশিলিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

গান্ধীজি সর্বদা সকলে মিলে একযোগে কাজ করার কথা উলে-খ করেছেন। যেকোন নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটবে যথাযথ ভাবে। এক্ষেত্রে জেকব ডেলর্স এর 'Four Pilars off Education' এর 'Learning to live together' এ উলে-খ করেছেন, যেখানে সকলে মিলেমিশে একসাথে বসবাসের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে তপশিলিদের সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে একাত্ম করে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য বলা হয়েছে।

NCF- 2005 প্রতিবেদনে দ্বিভাষা বা বহু ভাষার কথা বলা হয়েছে। আমরাা যদি মাতৃভাষার কথা বলি তাহলে আমাদের বিষয়টি বোধগম্য হতে সুবিধা হবে। ভারতে বহু ভাষার দেশে একটি ভাষার প্রাধান্য দিলে অন্য ভাষার ব্যক্তিবর্গ অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। এক্ষেত্রে যেহেতু বহু ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেহেতু ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে NCF- 2005 এর অবদান অনস্বীকার্য।

ভারতীয় জনগণনা অনুযায়ী ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে নারী স্বাক্ষরতার হার ছিল ১৫.৩৫% ,১৯৭১ এ ২১.৯৭%, ১৯৮১ তে তা হয় ২৯.৭৬%, ১৯৯১ তে তা বেড়ে হয় ৩৯.২৯%, ২০০১ সালে তা হয় ৫৪.১৬% এবং ২০১১ সালে নারী সাক্ষরতার হার হয় ৬৫.৪৬%।১২ তাহলে দেখা যাচ্ছে নারী শিক্ষার ধারাবাহিক বিবর্তন ঘটেই চলেছে। কিন্তু জেলা ভিত্তিক দেখলে দেখা যাবে উদ্বাস্তু সমস্যার কারণে অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলায় বেশী সংখ্যক তপশিলি নারীদের শিক্ষার হার কম ছিল। যদিও ১৯৮৬ সালের ১লা জুলাই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা বিভক্ত হয়ে যায়।১৩

'সর্বশিক্ষা' - সবার শিক্ষা - সবার উন্নতি চালু ২০০২ হওয়ায় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, মিড ডে মিল ও ৬ থেকে ১৪ বছর শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রকল্প চালু হওয়ায় সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী তথা তপশিলি নারীরা বিশেষভাবে শিক্ষার আওতায় চলে আসে ও শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয়। ফলে শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। Mandal Commission সর্বদা তপশিলিদের শিক্ষার কথা বলেছেন।১৪

কন্যাশ্রী প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটি চালু করেন DWD এবং SW এটির তত্ত্বাবধান করেন। এই প্রকল্প সমগ্র নারী তথা সমাজের পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে তপশিলি নারীদের শিক্ষায় এক উৎসেচকের কাজ করেছে ফলে নারী শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Right to Education Act- 2009 শিক্ষাকে যেহেতু মৌলিক অধিকারের

মধ্যে ফেলেছে, তাই কেউ আর নারীর প্রতি অবহেলা বা অধিকার হনন-এর থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছে ফলে স্বাভাবিকভাবেই তপশিলি শ্রেণীর নারী শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এমনটা আশা করা যায়।

স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার তপশিলি নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য নানা পরিকল্পনা, সাংবিধানিক ধারার প্রয়োগ, বিভিন্ন কমিশন, কমিটির গঠন ঘটিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তপশিলি নারীদের শিক্ষার অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। কেননা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর প্রতি সকলে সদ্ মানসিকতার বড়োই অভাব দেখা দিয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকারের আরো সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। যাতে করে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি নারীরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

সূত্রনির্দেশ ঃ—

১) Jawaharlal Nehru, **Foreword to the first Edition of verrier Elwins,**A philosophy for NEEA; Isha Books, Delhi. 1957.

২) K.S. Singh, Jawaharlal Nehru, **Tribes and Tribal Policy,** Anthropological Sarvey if India, Calcutta, 1989.

৩) Amal kr. Das, **West Bengal Scheduled castes and scheduled Tribes: Facts and Information,** special series No.32 Bulletin of the CRI. Govt. of W.B. Calcutta,1989.

৪) T.A. Koshy, **Tribal Education in India,** Tribal Education unit, Dept of Adult Education, New Delhi, 1967.

৫) শিক্ষায় সংরক্ষণ, অনগ্রসর কল্যাণ অনুষদ, কলকাতা, ৭০০০৭৩, ২০১১।

৬) P.K. Bakshi, **The Constitution of India,** Universal law publishing co. New Delhi.

৭) Govt. of India, **Indian University Education Commission,** MHRD, New Delhi, 1952.

৮) Govt. of India, **The Secondary Education Commission,** New Delhi, 1952.

৯) Govt. of India, **The Indian Education Commission,** New Delhi, 1964-1966.

১০) Govt. of India, **National Policy of Education ,** department of Education, 1986.

১১) জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, (পঃবঃ) কলকাতা - ৭০০০১৯, মার্চ ২০০৯।

১২) Census report, **Growth of Female literacy in West Bengal 1951 - 2011.**

১৩) কমল চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগণার ইতিবৃত্ত, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৭।

১৪) Govt. of India, **Sarva Siksha Abhiyan : A programme of universal Elementary Education ,** Ministry of Education, New Delhi, MHRD.

১৫) Govt. of India, **Mandal Commission,** New Delhi, 1980.

১৬) **Kanya Shree Prakalpa,** 2013, http://wbkanyashree.gov.in / kp. Date - 12/10/2015.

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গান্ধীজি

- বিপুল রঞ্জন সরকার

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ভারতের মহাকাশে দুই সূর্য। উভয়েই ভারতপথিক। কিন্তু একে অপরের প্রতিলিপি নন। বরং পথ ও মতের যথেষ্ট ব্যবধান। দুই মহৎ চিন্তানায়কের মধ্যে পার্থক্য থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। আবার অনেক মৌলিক বিষয়ে ছিল গভীর মতৈক্য। স্বাধীনতা, হিংসা বর্জন, উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রাঙ্গণে সৃজনশীল শিক্ষা সহ মানবিকতায় উভয়ের গভীর সাযুজ্য। মতপার্থক্য ছিল চরকা, বিদেশী বস্ত্র বর্জন, বিদেশী পণ্যের বহ্নুৎসব প্রভৃতি বেশ কিছু বিষয়ে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন কর্মসূচিতেও উভয়ের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একে অপরের প্রতি কী অপরিমেয় শ্রদ্ধাবোধ! পরস্পরকে জানার কী অদম্য কৌতূহল! সহানুভূতি, সহমর্মিতা! শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ''এই বিরোধে-মিলনে, রাগে-অনুরাগে ও আকর্ষণে-বিকর্ষণে বিংশ শতাব্দীর ভারতের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মত দুই লিভাইঅ্যাথন্ (বিরাট আকৃতি ও প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন সমুদ্রসম মানব) সদৃশ মানবের পারস্পরিক সম্বন্ধের চিত্তাকর্ষক কাহিনির সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা একালেও সমান আকর্ষণীয়।''

অন্নদাশংকর রায়ও মন্তব্য করেন, ''রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মধ্যে মিল অমিল দুটোই ছিল। আমার মনে হয়েছে পরাধীন ভারতে গ্রামের কাজ, পল্লী উন্নয়ন, শ্রীনিকেতন এসব রবীন্দ্রনাথের মানবোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। গান্ধীজির কনস্ট্রাকটিভ্ ওয়ার্ক কর্মসূচিও সেই একই ধারার এক্সটেনশন্। তাঁর স্বদেশীর ডাক রবীন্দ্রনাথের সুরেই। দু'জনের চোখেই স্বরাজের মূলে থাকবে কর্মপ্রচেষ্টা। ঐক্যবোধ, পারস্পরিক স্বার্থের সমন্বয়, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। দু'জনেরই বিশ্বাস ছিল পঞ্চায়েত প্রথায়। প্রত্যেক গ্রাম আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। স্বরাজের বুনিয়াদ এই ভাবেই গড়ে তোলার সাধনা ছিল তাঁদের।''

আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উভয়ের সাক্ষাৎকার সহ গান্ধীজির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব। গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি ঘটে ১৯১৫ সালের ৫ই মার্চ শান্তিনিকেতনে। অবশ্য গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে প্রথম পদার্পণ করেন ১৭ই ফেব্রুয়ারি। কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর স্থাপিত ফিনিক্স আশ্রমের কুড়িটি ছেলেকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। কিন্তু অকস্মাৎ গোপালকৃষ্ণ গোখলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি পুনা যাত্রা করেন। ফলে পরে যখন তিনি পুনা থেকে ফিরে আসেন, তখনই উভয়ের মহতী সাক্ষাৎকার ঘটে।

অবশ্য রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, একে অপরকে না জানলেও এর আগে দুজনের একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ক্ষিতীশ রায়ের মতে ১৮৯০ সালে সম্ভবত উভয়েই একই সময়ে অথবা খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্যারিস এগ্‌জিবিশনে উপস্থিত হয়ে সেপ্টেম্বর মাসে আইফেল টাওয়ার আরোহণ করে থাকতে পারেন। দ্বিতীয় একটি সম্ভাবনার কথা বলেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯০১সালে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের দুরবস্থার বিবরণ তুলে ধরবেন বলে। তখন তিনি একমাস কলকাতায় অবস্থানকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আয়োজিত মাঘোৎসবে যোগ দিয়ে কয়েকটা সুন্দর বাংলা গান শোনেন। তারপর তিনি আজীবন বাংলা গানের অনুরাগী। শেষ জীবনে বাংলা ভাষা শেখায় যত্নবান হন। ''আমার জীবনই আমার বাণী'' শব্দক'টি তিনি বাংলায় লেখেন। সেখানে আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন রবীন্দ্রনাথ। সাধারণত সে অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের রচিত গান তাঁরই নেতৃত্বে গাওয়া হত। অনুমান, ভাষা না বুঝলেও গান্ধীজি রবীন্দ্রগীতির আকুতিতে মুগ্ধ হয়ে থাকবেন। তখনও পরস্পরকে জানেন না এবং তার কারণও ঘটেনি। তবে তার আগেই কবি মহাত্মাজীর দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ, কারাবাস সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল। এক গভীর শ্রদ্ধাবোধে তিনি তখন আপ্লুত। তিনি গান্ধীজিকে লেখেন ঃ ''আপনার ফিনিক্সের ছেলেদের জন্য ভারতে আমাদের বিদ্যালয়কে উপযুক্ত স্থান রূপে যে আপনি নির্বাচন করেছেন, এতে আমি যথার্থ আনন্দ অনুভব করেছি।...আমরা সবাই মনে করি যে তাঁদের প্রভাব আমাদের ছেলেদের উপর মূল্যবান প্রভাব ফেলবে ও সঙ্গে সঙ্গে আমি আশা করি যে তারা এখান থেকে এমন কিছু পাবে যাতে তাদের শান্তিনিকেতনবাস সুফলদায়ী হবে।''

গান্ধীজির মত এবং পথ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাতটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সর্বশেষ রচনা কবিতা 'শিশুতীর্থ'। এই সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন, তারিখ ও শীর্ষকবিহীন গদ্য কবিতাটি বস্তুত এক রূপক কাহিনি-আশ্রিত গান্ধীতত্ত্বের অথবা বরং বলা ভাল চিরচলমান মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাহিনি। গান্ধীজি সম্পর্কে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত কিছু উদ্ধৃতি দেবার পূর্বে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। বেশ কৌতুককর। ১৯১৫-এ শান্তিনিকেতনে পৌঁছনোর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে যান ফুলে মালায় সাজানো একটি শোয়ার ঘরে। গান্ধীজির বয়স তখন ছাপ্পান্ন। ঘরে ঢুকে গান্ধীজি কবিকে প্রশ্ন করেন - আমাকে এই বাসরঘরে নিয়ে এলেন কেন? রাণী কই?

রবীন্দ্রনাথ হেসে উত্তর দেন ঃ আমাদের হৃদয়ের চিরতরুণী রাণী শান্তিনিকেতন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। তদুত্তরে গান্ধীজির সরস মন্তব্য ঃ কিন্তু আমার মতো দন্তহীন নিঃস্ব লোকের দিকে ফিরে তাকাবার কষ্টটুকুও তিনি করবেন না।

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দেন ঃ না, আমাদের রাণী সত্যকে ভালবেসেছেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাকে অকপটে পুজো করে এসেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য গাঁন্ধীজি যখন ঘরে প্রবেশ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পাশে সোফায় বসার আমন্ত্রণ জানান। মেঝেয় ছিল চমৎকার কার্পেট। গাঁন্ধীজি সোফায় না বসে নীচে বসে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ সেই পথই অনুসরণ করেন।

গাঁন্ধীজি যে ঘরে থাকতেন, সে ঘর নিজে সাফাই করে বিছানাপত্র নিজেই করে নিতেন, বাসনপত্র নিজে ধুতেন। এর ফলে আশ্রমিকদের উপর তার প্রবল প্রভাব পড়ে। কেউ কেউ গাঁন্ধীজির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চান। শান্তিনিকেতনের রান্নাঘর এবং রন্ধনপ্রণালী লক্ষ্য করে সেখানে স্বনির্ভর ব্যবস্থা চালু করেন। একদিন গাঁন্ধীজি দেখেন রবীন্দ্রনাথের প্লেটে লুচি সাজানো। তিনি মন্তব্য করেন, ''সাদা ময়দা বিষ''। কবি শান্তভাবে উত্তর দেন, ''বিষ বটে, তবে তার ক্রিয়া হয় খুব মন্থর গতিতে।'' শান্তিনিকেতনে গাঁন্ধীজি যে স্বনির্ভর রন্ধনশালা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন, প্রবল উদ্যমে সব আশ্রমিক ১০ই মার্চ, ১৯১৫ তা শুরু করেন। তাতে রাঁধুনি, ভৃত্য, সাফাইকর্মী ছিল অপ্রয়োজনীয়। গাঁন্ধীজি শান্তিনিকেতন ছাড়ার পরও বেশ কিছুকাল এই ব্যবস্থা চালু ছিল। ৪০ দিন একাদিক্রমে এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। তারপর গরমের ছুটি। এর পর আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেনি। কিন্তু অদ্যাবধি ১০ই মার্চ তারিখটিকে শান্তিনিকেতনে আশ্রমিকরা গাঁন্ধী দিবস রূপে উদ্‌যাপন করেন ।

গান্ধী চরিত্রের সত্যনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বলেন, পূর্বসুরীদের ''আরদ্ধ সাধনাকে যিনি প্রবল শক্তি তে দ্রুত বেগে আশ্চর্য সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন, সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি - তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।... পোলিটিশ্যানদের, এসব চতুর বিষয়ীদের আমরা প্রশংসা করতে পারি, কিন্তু ভক্তি করতে পারি না। ভক্তি করতে পারি মহাত্মাকে, যাঁর সত্যের সাধনা আছে। মিথ্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সত্যের সার্বভৌমী ধর্মনীতিকে অস্বীকার করেননি। ভারতের যুগ সাধনায় এ একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই একটি লোক যিনি সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, তাতে আপাতত সুবিধে হোক বা না হোক; তার দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য লাভের ইতিহাস রক্ত ধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন।...মহাত্মা যদি বীর পুরুষ হতেন, কিংবা লড়াই করতেন, তবে আমরা আজ ওঁকে স্মরণ করতুম না। কারণ, লড়াই করার মত বীর পুরুষ এবং বড় বড় সেনাপতি পৃথিবীতে অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ।... ধর্মযুদ্ধের ভিতরেও নিষ্ঠুরতা আছে তা গীতা ও মহাভারতে পেয়েছি।...কিন্তু এই যে একটা অনুশাসন,

মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব - এ একটা মস্তবড় কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্ম যুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়েও নয় মৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।''

১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অসুস্থতা যখন খুব বেশি, তখন চিকিৎসকরা তাঁকে দুপুরে দু'ঘন্টা ঘুমুতে, নিদেনপক্ষে শুয়ে থাকার অনুরোধ করেন। সবার অনুরোধ ব্যর্থ হবার পর তাঁর প্রিয়জন গান্ধীজির শরণাপন্ন হন। তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শেষে একটা কথা বলেন ঃ একটা ভিক্ষা আছে, দিতে হবে।

কী ভিক্ষা ?

গান্ধীজি ঃ আগে বলুন দেবেন। এরপর কিছুক্ষণ দর কষাকষি। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ কথা দেন।

গান্ধীজি বলেন ঃ ডাক্তার বলেছেন, দুপুরে দু'ঘন্টা ঘুমুতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঃ ঘুম আসে না।

না আসুক, চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতে হবে। আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন।

এরপর বাধ্য হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘরের দরজা বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে থাকেন। ক্ষিতিমোহন সেন বাইরে দিয়ে যাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন - কে ঠাকুরদা নাকি ?

ক্ষিতিমোহন সেন ঃ হ্যাঁ, আপনি কী করছেন ?

রবীন্দ্রনাথ ঃ মহাত্মার খাজনা দিচ্ছি।

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, গান্ধীজি যাবার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাতে একটা খাম তুলে দেন। তিনি বোলপুর স্টেশনে গিয়ে খামটি খোলেন। কবির লেখা চিঠি। তাতে তিনি লিখেছেন - ''এই প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি আপনার রক্ষণাধীনে আশ্রয় দিন। আর একে যদি আপনি জাতীয় সম্পদ বলে মনে করেন, তাহলে একে স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করুন। বিশ্বভারতী একটি অর্ণবযানের মত। যা কিনা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বহন করছে...।''

গান্ধীজি ট্রেনে বসে উত্তর দেন, ''বিশ্বভারতী এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। নিঃসন্দেহে এ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিকও বটে। এটির স্থায়িত্বের জন্য আমাদের প্রয়াসের মধ্যে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, তার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।''

গান্ধীজি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি উদ্যোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সক্রিয় হয়ে বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দানের জন্য বলেন। তাঁরা অতঃপর প্রতিষ্ঠানটির যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের

স্থায়িত্ব নিশ্চিত করেন।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে কবি উৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন ঃ ''আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে আশ্রমবাসী আমরা সকলে আনন্দোৎসব করব। আমি আরম্ভের সুরটুকু ধরিয়ে দিতে চাই।...ক্ষণজন্মা লোক যাঁরা, তাঁরা শুধু বর্তমান কালের নন। বর্তমানের ভূমিকার মধ্যে ধরাতে গেলে তাঁদের অনেকখানি ছোট করে আনতে হয়, এমনি করে বৃহৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাশ্বত মূর্তি প্রকাশ পায়, তাকে খর্ব করি।...আমাদের প্রণম্য যাঁরা, তাঁদের একটি সংহত সম্পূর্ণ মূর্তি সংসারে চিরন্তন হয়ে থাকে। যাঁরা আমাদের কালে জীবিত, তাঁদেরকেও এইভাবে দেখবার প্রয়াসেই উৎসবের সার্থকতা।...আজকের দিনে ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রকি বিরোধ পরশুদিন হয়তো তা থাকবে না, সাময়িক অভিপ্রায়গুলি সময়ের স্রোতে কোথায় লুপ্ত হবে। ধরা যাক, আমাদের রাষ্ট্রকি সাধনা সফল হয়েছে, বাহিরের দিক থেকে চাইবার আর কিছুই নেই, ভারতবর্ষ মুক্তি লাভ করল - তৎসত্বেও আজকের দিনের ইতিহাসের কোন্ আত্মপ্রকাশটি ধূলির আকর্ষণ বাঁচিয়ে উপরে মাথা তুলে থাকবে, সেইটিই বিশেষ করে দেখবার যোগ্য। সেইদিক থেকে যখন দেখতে যাই, তখন বুঝি আজকের উৎসবে যাকে নিয়ে আমরা আনন্দ করছি, তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর বিশিষ্টতা কোনখানে।'' কবি এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গান্ধীজির মূল্যায়ন করে বলেন, ''যে দৃঢ় শক্তি র বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তি র মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে; কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেল। ইনি আসবার পূর্বে, দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল; কেবল ছিল অন্যের অনুগ্রহের জন্য আবদার-আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।...স্থানে স্থানে লোকমান্য তিলকের মত জনকতক সাহসী পুরুষ জড়ত্বকে প্রাণপণে আঘাত করেছেন, আত্মশ্রদ্ধার আদর্শকে জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই আদর্শকে বিপুলভাবে প্রবল প্রভাবে প্রয়োগ করলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি অসামান্য তপস্যার তেজে নূতন যুগ গঠনের কাজে নামলেন। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এতদিনে যথোপযুক্ত রূপে আরম্ভ হল।...আমাদের আত্মকৃত পরাভোগ থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি; নববীর্যের অনুভূতির বন্যাধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত করলেন।''

তিনি গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের বিষয়গুলি মোটেই বিস্মৃত নন। তিনি তার উল্লেখ, তার সমালোচনা সবই করেন। তথাপি সব ছাপিয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত, ''সাময়িক যেসব ব্যাপারে তিনি জড়িত তাতে তাঁর ত্রুটিও ঘটতে পারে, তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে - কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার করেছেন, তাঁর ভ্রান্তি হয়েছে; কালের

পরিবর্তনে তাঁকে মত বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এই যে অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে, এই যে অপরাজেয় সংকল্পশক্তি , এ তার সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মতো - এই শক্তি র প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ।'' কবি জাতীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে যথার্থ মূল্যায়ন করে বলেন, ''মহাত্মাজির জীবনের এই তেজ আজ সমগ্র দেশে সঞ্চারিত হয়েছে, আমাদের ম্লানতা মার্জনা করে দিচ্ছে। তাঁর এই তেজোদীপ্ত সাধকের মূর্তি মহাকালের আসনকে অধিকার করে আছেন। বাধাবিপত্তিকে তিনি মানেননি। নিজের ভ্রমে তাকে খর্ব করেননি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তার ঊর্ধ্বে তাঁর মন অপ্রমত্ত। এই বিপুল চরিত্রশক্তি র আধার যিনি, তাঁকেই আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা নমস্কার করি।...মহাত্মাজি ভারতবর্ষের বহু যুগ ব্যাপী অন্ধতা মূঢ় আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ একদিক থেকে জাগিয়ে তুলেছেন, আমাদের সাধনা হোক সকল দিক থেকেই তাকে প্রবল করে তোলা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, মূঢ় সংস্কারের আবর্তে যতদিন আমরা চালিত হতে থাকব, ততদিন কার সাধ্য আমাদের মুক্তি দেয়। মনে রাখা চাই, বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন বীর্যের দরকার হয় না, আপন অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা। আজ যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করছি, এই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন।'' (গান্ধীজি, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)

গান্ধীজি যখন পুনায় ইয়েরওয়াড়া জেলে ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ আমৃত্যু অনশনে রত হচ্ছেন, তার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে লেখেন, ''ভারতবর্ষের ঐক্য এবং সামাজিক পূর্ণতা রক্ষায় বহুমূল্য জীবনকে বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের ব্যথিত হৃদয় শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে আপনার মহান প্রায়শ্চিত্তের অনুগমন করবে।'' সমগ্র দেশবাসী গান্ধিজির আত্মাহুতির পদক্ষেপে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সারা দেশের মানুষ একদিনের প্রতীক উপবাসে তাঁর প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের 'চৌঠা আশ্বিন' শীর্ষক ভাষণে বলেন, ''সূর্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করছে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎ সান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেছে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে দেশকে যথার্থভাবে, গভীরভাবে আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।...দেশে সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার, তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরো একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, চরম আত্মোৎসর্গের পথে।...মহাত্মাজি যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করছেন, তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে...তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তার সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে, ঘোষণা করবে চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই

যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য হয়, তবে তা যথোচিত ভাবে করতে হবে। তপস্যা সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।"

তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্যা সম্পর্কে বলেন, "আমাদের রাষ্ট্রিক মুণ্ডি সাধনা কেবলই ব্যর্থ হচ্ছে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।...অসাম্যের ভারে সমাজব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয়, তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানে মানুষকে পীড়িত করবে, সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই; সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়। সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য, এই অসম্মানের দিকে মহাত্মাজি অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন।...সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি, তবেই আজকের দিন সার্থক হবে।"

কবি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আরো বলেন, "দেখতে পাচ্ছি, মহাত্মাজির এই চরম উপায় অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরেজ বুঝতে পারছেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে, মহাত্মাজির ভাষা তাদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজির এই প্রাণপণ প্রয়াস তাদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। একটা কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, আয়র্লণ্ড যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল, তখন কী বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রণ্ড পাত, কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলিটিক্সে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম মহাদেশের অভ্যস্ত।...অদ্ভুত মনে হচ্ছে মহাত্মাজির অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্ত মূর্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজির মমতা নেই, এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে, তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সংকটের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েছে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেছেন। একথা বুঝতে পারেননি, রাষ্টকি অস্ত্রাঘাতে হিন্দু সমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে যদি ইংলণ্ডে প্রটেস্টান্ট্ ও রোমান ক্যাথলিকদের এইভাবে সম্পূর্ণ বিভণ্ড করে দিত তাহলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দু সমাজে পরম সংকটের সময় মহাত্মাজির দ্বারা সেই বহু প্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেছে মাত্র।...রাষ্ট্র ব্যাপারে মহাত্মাজি যে অহিংস্র নীতি এতকাল প্রচার করেছেন, আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত। একথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করি নে।"

অপর একটি রচনায় মহাত্মাজির প্রতি তাঁর অনুরাগ ব্যণ্ড করে বলেছেন, "যে

মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।...যিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন, তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। সকলে বুঝেছে, 'তিনি আমার'। তাঁর ভালবাসায় উচ্চনীচের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমানভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেছেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেছেন, শুধু কথায় নয় বলেছেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয় সুখের জন্য নয়। স্বার্থের জন্য নয়, সকলের ভালর জন্য। এই যে এত মার খেয়েছেন, উল্টে কিছু বলেননি, কখনো, রাগ করেননি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে গেছে ধৈর্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে। তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু জোর জবরদস্তিতে নয়। ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে ঠেলবার জন্যে দেখা দিয়েছেন।"

শুধু গান্ধীজির সারা জীবনব্যাপী অসংখ্য আত্মত্যাগের ঘটনা এবং তার মহিমা ব্যণ্ড করে রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, সমসাময়িক ভারতবর্ষে তিনি কীভাবে মানুষের দৃষ্টিতে গৃহীত, তারও উল্লেখ করেন। "সবাই জানো, সমস্ত ভারতবর্ষ কীরকম করে তাঁকে ভণ্ডি দিয়েছে; একটি নাম দিয়েছে - মহাত্মা। আশ্চর্য, কেমন করে চিনলে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোন মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা।...মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন। সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা সেই প্রেমের ঐশ্বর্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তাকে আমরা মোটের উপর এই বলে বুঝেছি যে, তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালোবেসেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ যিশু খৃষ্টের মৃত্যুর উল্লেখ করেন। বলেন, তিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। তারই সঙ্গে তুলনা করে গান্ধীজি প্রসঙ্গে তাঁর বণ্ড ব্য, "তিনি আজ মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন ছোটো-বড়োকে এক করবার জন্য। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই শণ্ডি , আসুক আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের কাজে।" রবীন্দ্রনাথের মতে বিদেশীরা আমাদের যে শত্রুতা করছে তার চেয়ে বড়ো শত্রু আমাদের মজ্জার মধ্যে এবং সেটা হল ভীরুতা। তিনি বলেন, "সেই ভীরুতাকে জয় করার জন্য বিধাতা আমাদের শণ্ডি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে। তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয় হরণ

করতে এসেছেন। সেই তাঁর দান-সুদ্ধ তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব? এই কৌপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে ফিরেছেন, তিনি আমাদের সাবধান করেছেন, কোন্‌খানে আমাদের বিপদ। মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নত মস্তকের উপরে; তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দুর্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেছি; আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। এক ভাই আরেক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে, মহাত্মা সইতে পারেননি এই পাপ।"

রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী সর্বাত্মক অভিযানের কথা স্মরণ করেই একথাগুলি বলেন। উপলব্ধি করেন হিন্দু সমাজের গভীরে এর শিকড়। একে উৎপাটন করতে হলে নিরবচ্ছিন্ন, সর্বাত্মক অভিযান সংগঠিত করা প্রয়োজন। বস্তুত ১৯২০ থেকে গান্ধীজি সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই অভিযান পরিচালনা করেন, পরিক্রমা করেন সারা দেশ, তারই জন্যে চার বার মহৎ অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। কবি উদাত্ত কণ্ঠে জাতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, ''সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব করো, কী প্রচণ্ড তাঁর সংকল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেছেন, দিনের পর দিন অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেছি, পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছি দাসের মতো। পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেছে আমাদের। যদি তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তাহলে আজ এত দুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ।...যে সম্মান মহাত্মাজি সবাইকে দিতে চেয়েছেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারবে না দিতে, ধিক্ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ, ধিক্ সেই জীর্ণ সমাজকে। সবচেয়ে বড় ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায়, যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারি নে। সেই ভীরুতার ক্ষমা নেই। অভিশাপ অনেক দিন থেকে আছে দেশের উপর। সেইজন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছেন একজন।...বলো, আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলো, ভয় কীসের। তিনি সমস্ত ভয় হরণ করে বসে আছেন। মৃত্যু ভয়কে জয় করেছেন। কোনো ভয় যেন আজ থাকে না আমাদের। লোকভয়, রাজভয়, সমাজভয় কিছুতেই যেন সংকুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অনুবর্তী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেব না তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আজ তাকিয়ে আছে।... যদি তাঁর শক্তি র আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে; যদি সবাই বলতে পারি, 'জয় হোক তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক' এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পাড়

থেকে পৌঁছবে আরেক পারে; সকলে বলবে সত্যের বাণী অমোঘ। ধন্য হবে ভারতবর্ষ।" কবি আক্ষেপ করে বলেন, ''আমি কীই বা বলতে পারি। আমার ভাষার জোর কোথায়। তিনি যে ভাষায় বলেছেন সে কানে শোনবার নয়, প্রাণে শোনবার; মানুষের সেই চরম ভাষা নিশ্চয় তোমাদের অন্তরে পৌঁছেছে।"

রবীন্দ্রনাথ ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪০ ''গান্ধী মহারাজ" শীর্ষক কবিতাটিয় অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য উজার করে দেন।

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ-বা ধনী, কেউ-বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল --
গরীব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হইনে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয়না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুঁষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ-
চিরকালের হাতকড়ি যে,
ধূলায় খসে পড়ল নিজে
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।